দক্ষিণের বিল

দ্বিতীয় খণ্ড

অমরেন্দ্র ঘোষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

আশ্বিন—১৩৬২

চার টাকা

উৎসর্গ

মনীষী শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

করকমলেষু

এই লেখকের লেখা—

চর কাশেম
পদ্মা দিঘীর বেদেনী
দক্ষিণের বিল (১ম খণ্ড)
একটি সংগীতের জন্মকাহিনী
বেআইনি জনতা
ভাঙছে শুধু ভাঙছে
কনকপুরের কবি
জোটের মহল (যন্ত্রস্থ)
শুধু একটুখানি নুন ”
এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ (নাটক) ”

দক্ষিণের বিল

দ্বিতীয় খণ্ড

এক

মৃত্তিকা ও ফসলের জন্য সংগ্রাম

পিতা, পুত্র ও পৌত্রের জীবন-ইতিহাস

আজ সময় বদলে গেছে, তবু মনে হয়, এ যেন সেদিনের কথা, যে দিন এখনও প্রাচীন হয়নি শক্তিপদের স্মৃতি ফলকে। এখন অনেকে চোখ বুজলেই দেখতে পায়, বিপ্রপদ বিয়ে করে আনল কমলকামিনীকে। রূপ তার অতি সাধারণ—কিন্তু আলাপ যারা করল, তারা বুঝল, বুদ্ধি তার অসাধারণ।

সেই কমলকামিনীকেই একদিন বিমর্ষ দেখায়।

দুরন্ত ছেলে অমরেশ। কলকাতা চলে গেছে—তাঁর বুকের একটা বোঝা নেমে গেছে, কিন্তু তাঁকে যেন হালকা করে দিয়ে গেছে অনেকখানি।

অমরেশ বাড়ী নেই—হৈ হৈ রৈ-রৈ থেমে গেছে—ছেলে মেয়েগুলি কেবলই এসে আর নালিশ করে না। তারা নিশ্চিন্ত মনে খেলছে। পাড়া প্রতিবেশীর চীৎকার নেই, সব দিক্ শান্ত—এ-ও তাঁর ঠিক ভাল লাগে না। অভিভাবিকা কমলকামিনী নিশ্চিন্ত, কিন্তু মাতা কমলকামিনী অন্তরে অন্তরে ব্যথিতা। কিছু দিনের মধ্যে সে ব্যথা সহ্য হয়ে যায়। কিন্তু এর চেয়েও যে একটা গুরুতর দাহ তাঁর অন্তরে অহর্নিশ জ্বলছে, তাই আবার দাউ-দাউ করে ওঠে। নিতাই যে রূপসী রাঁধুনী না

পরিচারিকার কথা বলে গেছে, তার সম্বন্ধে ত বিপ্রপদ একেবারেই নীরব। তিনি জানেন, চৈত্রের শেষে জমিদারী সেরেস্তায় খুবই কাজের চাপ। তা থাকলেও উচিত ছিল তার মধ্যেই বিপ্রপদর একখানা পত্র লেখা। কাজ—কাজ—শুধু কাজ—কাজও যার, সংসারও তাঁর। একটা নিয়ে ডুবে থাকলে অপরটা যে ভেসে যায়! তিনি একখানা চিঠি লেখাও বাহুল্য বোধ করবেন অথচ কমলকামিনী এই বিরাট সংসার—নূতন একটা তালুক—সব-কিছুর দায়িত্ব নিয়ে বসে থাকবেন কেন? এমন কি দায় ঠেকেছেন তিনি? চিরদিন এমনি ধারা বিপ্রপদ আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠেছেন, একটুও মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখেননি কমলকামিনীর দিকে। যিনি তার সুদীর্ঘ জীবন খেটে-খেটে সারা করে দিলেন তার পুত্র কন্যা-পরিজনের জন্য, তিনি আজ কেউ নন? একটা ভ্রষ্টা চরিত্র মেয়েমানুষই হল সব। তিনি বোশেখ মাসের এই ক'টা দিন অপেক্ষা করে নিজেই যাবেন শিবচর। বিপ্রপদকে যা বলবার তা আগে বলবেন—তার পর ঝাড়ু মেরে তাড়াবেন ঘাড়ের পেত্নীটাকে। হারামজাদী, খানকি, বেশ্যাদিগের নেতা পেয়ে ঠেলে নিচ্ছে বন-বাদাড়ে। কমলকামিনী তার পিসীমার মুখে শুনেছেন, কামরূপ কামাখ্যায় নাকি কোন পুরুষমানুষ গেলে, ওখানের সব রূপসী মেয়েমানুষেরা তাকে ভেড়া বানিয়ে রাখে। মানুষ কি আর সত্যি সত্যি ভেড়া হতে পারে? তাদের বুদ্ধি হয় ভেড়ার মত। কমলকামিনীর মতে বিপ্রপদরও তাই হয়েছে। তার সত্য চিকিৎসা প্রয়োজন। সেই জন্য তিনি শিবচর যাওয়ার দিন স্থির করতে যান নিকটস্থ গুরু বাড়ী।

কমলকামিনীকে যেতে দেখে সেবা বলে, 'আমি যাব।' শিবপদর মেয়ে বলেঃ 'আমি যাঁবো।' আর ক'টি ছিল, তারা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি, আমি।'

কমলকামিনী বিরক্ত হয়ে বলেন, 'কোথায় যাব তোরা আমার সংগে মরতে?'

সে কথা কে শোনে। সকলে ধুপ-ধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দা থেকে রাস্তায় নামে। তার পর হিঃ-হিঃ হাঃ-হাঃ করতে করতে পংগপালের মত ছুটে চলে। এতগুলো আপদ নিয়ে কমলকামিনীর চলতে দেরী হয়—পদে পদে বাধা। এমন কঠিন শৃঙ্খলই তিনি পরেছেন পায়। ওরা যদি না থাকত, তবে তাঁর কি দায় ছিল?

'সেবা, তুই নিজে নিজে এগিয়ে আয় মা, রেবাটা এগিয়ে গেছে, আবার খালে পড়ে জলে ডুবে না মরে। আর এত কাজ ঠাকুরপোরা করে, এই সোঁতা খালটা বেঁধে ফেলতে পারে না। এবাড়ীর মজা এই যে, পুরুষমানুষগুলো সব উদাসীন।' যাকে লক্ষ্য করে এ-সব শর নিক্ষেপ, সেবা তা বুঝতে না পারলেও কমলকামিনীর জলুনীতে একটু প্রলেপ পড়ে।

পংগপাল যখন তাঁকে কিছুতেই ছাড়বে না, তখন তিনি একে-একে হাতধরে খালের চারটা পার করেন। সকলের শেষে সেবার পালা—সে জলের দিকে চেয়ে থাকে। কোথা থেকে যেন অজস্র ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ফুল ভেসে এসেছে। জল আর দেখা যায় না, এত ফুল। সেবা চারটা পার হওয়ার সময় তুলে নিতে চায় কয়েকটা।

'কি ফুল মা?' কমলকামিনী সেবার হাত ধরতেই সে জিজ্ঞাসা করে, 'কে ফেলল মা? কি ফুল মা?'

'আমার মাথার ফুল।' রাগের চেয়ে জোরটা প্রকাশ পায় বেশী।

'মার মাথার ফুল, দাদা ভাসিয়েছে জলে। আমি নেবো, নেবো লো।'

'নে।' বলে সাঁকোটা থেকে একটু নুইয়ে ধরেন সেবাকে কমলকামিনী।

সেবা আঁজল ভরে পিঠেকরার ফুল তুলে নেয়। ওর খেলা দেখে অমরেশের কথা চকিতে মনে পড়ে যায় কমলকামিনীর। দস্যুটা সেই

ভোর বেলা উঠে ফুল ফুল করে সারা বাগানময় ঘুরে বেড়াত! ফুল যে ওর কত প্রিয় ছিল! তারই বোন সেবা—সে কেন ভালবাসবে না ফুল!

এ দেশের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর চার পাশে এমনি খাল পরিখার মত ঘুরান। রোজই দু'বেলা জোয়ার-ভাটা খেলে। তাই ছোট-ছোট সাঁকোর আর অন্ত নেই।

সাঁকো পার হয়ে ওরা আবার করতালি দিয়ে চলতে থাকে। পথের দু'পাশে সুপারি-বাগান। কচি কচি সুপারি এখানে-ওখানে পড়ে আছে। ওরা তুলে-তুলে মুখে দেয়! চিবিয়ে লালা বের করে। কচি-মুখে কচি-সুপারি দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু অসুখ করতে পারে বলে কমলকামিনী ও-সব খেতে নিষেধ করেন। কে তার বারণ মানে! রেবা চিবাতে পারে না। হা-হা করে ওঠে। সেবা পাতলা সুকুমার জিভটি বের করে ধরে। জিভে তার কত সুপারি। রেবা এসে মুখ বাড়িয়ে তা নিয়ে পরমানন্দে খেতে থাকে। কি মিষ্টি গন্ধ! ওরা খল্ খল্ করে হাসে। আবার করতালি দিয়ে চলতে থাকে পথ।

অমরেশ চলে গেছে কলকাতায়। কিন্তু তার প্রিয় শিষ্য বিনুকে রেখে গেছে শক্তিগড়ে। সে তীরের মত ছুটে এসে মেশে এই দলে। সে-ও কুড়ায় কচি-সুপারি। সুপারি কুড়াতে কুড়াতে সে বাগানের মধ্যে একটা বড় নারকেল গাছের তলায় পায় একটা নারকেল। বীরপুরুষের মত সে মহা উৎসাহে ছুটে আসে বড় মাকে দেখাতে।

অনেক সময় কেটে যায় এই সামান্য পথটুকু আসতে। গুরুবাড়ী এসে কমলকামিনী জিজ্ঞাসা করেন—'মা, পাঁজিটা কই—আমি দিন দেখব।'

'কিসের দিন!'

'শিবচর যাওয়ার।'

'বসো মা, তুমি দেখি হাঁপিয়ে গেছ এতটুকু পথ আসতে। তর্করত্ন-গিন্নী একখানা আসন এনে দেন বসাতে। ছেলে-মেয়েগুলো বাড়ীর উঠানে কিল্‌বিল্‌ করতে থাকে।

অতি সাধারণ বাড়ী। এক দিকে হেলে-পড়া একখানা ছোনের লম্বা কাছারী—অবস্থা-বিশেষে টোল, এখন গরুর জন্য খড় রাখা হয়েছে। এক সময় এই ঘরখানা ভরা ছিল ছাত্র। এখন তা নেই—হয়ত সময়েতে দু' এক জন সংস্কৃত পড়তে আসে। তারা প্রায়ই মূর্খ। মেধাবী হলে অন্য পথে যেত। বাড়ী বসে যজমানি করতে যা নিতান্ত শেখা দরকার, তাই কোন প্রকারে শিখে পালায়। এখন আর সুর করে কেউ বেদ-ব্যাকরণ পড়ে না—তর্ক হয় না দর্শন বা সাহিত্য নিয়ে। ওব কদর চলে গেছে। তবু বাড়ীর শুচি এবং শুভ্রতা এখনও বজায় আছে। বজায় আছে নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা-পার্বণ, মানত, ব্রত। বাড়ীর মেয়েরা ভাঙা ঘরের দোয়ারগুলো, উঠানখানা, তুলসীতলা লেপেপুঁছে ঝকঝকে তকতকে করে রাখে। সকলে বলে: এ বাড়ীর উঠানে বর্ষাকালে সিঁদূর পড়লেও তুলে নেওয়া যায়।

বুড়ো রান্নাঘরখানার ওপর দিয়ে একটা নধর লাউলতা বেয়ে গেছে শোবার ঘরের গোলের চালের মটকায়। সেই গাছটার গোড়ায় গিয়ে ছেলে-মেয়েরা ভীড় করে। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন কমলকামিনী।

'আহা হা, তুমি বসো বসো, ওরা কিছু করবে না।' বলে তর্করত্ন-গিন্নী একটা জালি শশা কেটে ওদের হাতে দেন। ওরা নাচতে নাচতে খেতে থাকে।

কমলকামিনী বলেন, 'দেখছেন তো আমার অবস্থা—দিন-রাত এই লটবহর নিয়ে চলি। আমি না হাঁপালে হাঁপাবে কে? মেজবৌ তো বিয়িয়ে খালাস।'

'বড়র বোঝা চিরদিনই বড়—বিধাতার ব্যবস্থাই এই।'

'এ আর ভাল লাগে না—সুখ পেলাম না কিছুতেই।'

'তাই বুঝি শিবচর যেতে চাইছ?' একটু হেসে ঠাট্টা করে তর্করত্ন গিন্নী বলেন, 'এত ব্যস্ত কেন? শুনলাম, বিপ্রপদ নাকি হাল বোশেখে বাড়ী আসবে, তাহলে তুমি আর গিয়ে করবে কি? সেখানে তো সতীনের ভয় নেই তোমার।'

'কেমন যেন বিষাদ-মিশ্রিত স্বরে কমলকামিনী জবাব দেন 'তা ঠিক নেই মা। এ বয়সে কি আর সে ভয় করি। তবু যেতে হবে।'

'কেন?'

'বলতে পাবি নে।'

'কিন্তু আমি বলতে পারি।'

সবিস্ময়ে কমলকামিনী চোখ তুলে তর্করত্ন-গিন্নীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। ঐ ক'টি কথায় তাঁর অন্তরের এমন একটা স্থান স্পর্শ করে যে, সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে।

তাঁর অবস্থা দেখে তর্করত্ন গিন্নী বলেন, 'স্থির হও মা,—স্থির হও। ভিতরে এসো, বাইরে বসে অত কথা বলা যায় না—এই উঠানটারও কান আছে।'

দু'জনে ভিতরে এসে একটা মাদুর পেতে বসেন। ছেলেমেয়েগুলো বাইরে খেলতে থাকে। ওদের মাথার ওপর দিয়ে একজোড়া কাঠঠোকরা উড়ে যায়, তা দেখে ওরা আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে।

তর্করত্ন-গিন্নী বলেন, 'তোমাদের হিতেই আমাদের হিত, তোমাদের সুখেই চিরদিন আমাদের সুখ—তোমাদের সংগে আমাদের সম্পর্ক রক্ত-মাংসের। তাই বিমলা যাওয়ার সময় আমাকে সব বলে গেছে। তুমি মা অধীর হয়ো না। অপেক্ষা করে দেখ, কিসে কি হয়। তোমার জন্য বিধাতা যা বরাদ্দ করে রেখেছেন, তা কি কেউ নিতে পারবে? দেহের দহন যখন তোমাকে আর পাগল করতে পারে না, মায়ের

ধর্ম নিয়েই নিজেকে নিবেদন করে দাও সংসারের পায়। অন্তরের দাহ সংযত কর, শান্তি পাবে। তুমি সংসারের মা—এই কথাটাই সর্বদা মনে রেখো। থাক্ বিপ্রপদ দূরে—দেখি কত দিন তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারে। আমি জানি, তাকে এক দিন ফিরে আসতেই হবে। তার পর আমরা যা সন্দেহ করে বসে আছি, তা এখন পর্যন্ত সন্দেহ মাত্র —সত্য নাও হতে পারে।'

'এ কথাটা আমিও কতদিন ভেবেছি। কিন্তু যখন ভাবি, পরমুহূর্তে ভুলে যাই। রাগে হিংসায় প্রাণ জ্বলে যেতে চায়। মা, সরল মনে বলছি, আমাকে সব জানিয়ে শুনিয়ে করলে আমার অত রাগ হতো না। আমি সব সইতে পারি, বঞ্চনা সইতে পারি নে। তাই ভাবছি আমি একবার যাব, স্বচক্ষে দেখে আসব সব। আপনি অনুমতি দেন।'

'তবে যাও। আশীর্বাদ করি, বিজয়িনী হয়ে এসো।'

ভক্তিবস্ত্র শিরে র পায়ের ধুলো নিয়ে কমলকামিনী উঠে পড়েন।

দেবপদ এসে একদিন জিজ্ঞাসা করে, 'বৌঠান আপনি না কি এ মাসে শিবচর যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, তাই যাব ঠিক করেছি। কিন্তু তাতে তোমাদের কি?'

একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে দেবপদ জবাব দেয়, 'না না, আমাদের তো কিছু না।'

'তবে বাধা দিতে এসেছ কেন? সবাই মিলে মাথাটা আমার খাও আর কি।'

'এত রাগ কচ্ছেন কেন বৌঠান? আমরা তো কিছু বলিনি। আপনিই ভরসা দিয়েছিলেন, আবার আপনিই ভুলে যাচ্ছেন। মণির বরাতটা খারাপ। কথায় বলে: ছোটকালে যার মরে মা, তার দুঃখ ছাড়ে না। যাক, আপনি মা'র মত জা, যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ কি।' এই পর্যন্ত বলে দেবপদ চলে যায়। আর বেশী বলা ভাল দেখায় না, কারণ, হঠাৎ কেন জানি কমলকামিনী রুক্ষ হয়ে উঠেছেন।

দেবপদ চলে যেতেই কমলকামিনীর মনে পড়ে, বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে মণিমালার সন্তান হবে। প্রথম পোয়াতি। ওর বাপের বাড়ীও তেমন কেউ নেই যে তখন গিয়ে ক'মাস থেকে আসবে। আর তিনিই বা কেন দেবেন ওকে যেতে? মণিমালা ওর মেয়ের বয়সী। এ সব চিন্তা করেই উনি না ওকে বুঝিয়েছেন কত, ভরসা দিয়েছেন অজস্র। এখন আবার অসময়ে ফেলে যেতে চাইছেন। বয়স এবং অভিজ্ঞতায় তিনি নিঃসন্দেহে মণির মাতৃতুল্য। মা কি পারে এমন অসময়ে মেয়েকে ফেলে যেতে? দেবপদকে তিনি বৃথাই তিরস্কার করেছেন। ছেলের মত দেবর একটু মুখ তুলে প্রতিবাদ পর্যন্ত না করে চলে গেল। তাঁর অভাবে মণির যদি একটা গুরুতর কিছু হয়, তাহ'লে চিরদিনের জন্য একটা কথা থাকবে—এমন কি, একটা সংসার নষ্ট হওয়া আশ্চর্য নয়। মেয়েটা যেমন ভীতু—হয়ত বড়দিকে না দেখে ভয়েই মরে যাবে।

এক সময় একান্তে মণিকে ডেকে কমলকামিনী বলেন, 'আজ যে তোর চোখ দু'টো বড় ফুলো-ফুলো দেখাচ্ছে—মুখখানাও হাঁড়ীপানা, ঝগড়া-ঝাঁটি করেছিস না কি দেবুর সংগে?'

উত্তরে মণির চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল পড়ে, মুখ দিয়ে কিছু বার হয় না।

'আঁ্যা, আদিখ্যেতে দেখ—আর যেন কেউ বিয়োয় না—ওরই যেন প্রথম? একেবারে কেঁদে-কেটে অস্থির। আমি থাকব না। ধোপা-বৌকে ডেকে আনিস—মাগী দাই তো নয় ডাইনী।'

মণিমালা কমলকামিনীর কোলের ভিতর মাথা গুঁজে পড়ে থাকে।

কমলকামিনী আবার বলেন, 'তোমরাই আমার সব, তোমাদের সুখেই সুখ। আমি তোমাদের ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও সুখী হব না—শান্তিও পাব না।' তিনি মণিমালার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাতে থাকেন।

মণিমালা তবু মুখ তোলে না—সে চুপ করেই থাকে।

কমলকামিনী আবার তাঁর চিবুক ধরে সজল মুখখানা তুলে ধরে বলেন, 'এই যে মুখগুলো, এগুলোর মায়া বড় বিষম মায়া। তোরাই আমায় রাখবি জড়িয়ে। দেখি কত দিনে তোরা আমায় ছুটি দিস? ভয় নেই, ওঠ—তোর একটা ভাল-মন্দ না দেখে আমি যাব না কোথাও, এক পার নদীর ভাঙলেও অন্য পারে বসে আমার তা দেখতে হবে। সইতে হবে ভাঙনের বুক-ভাঙা কান্না।'

সব কথা হয়ত মণি বোঝে না -সে ধীরে ধীরে উঠে চলে যায়।

মণিমালা চলে যেতে-যেতেই আসে খোঁড়া শিবানীর মা একটা লাঠিতে ভর করে। 'বলি ও বড়বৌ, তুমি না কি যাচ্ছ শিবচর? এই চোথ মাসে কি করে যাবে? তোমরা যেতে পার, তোমরা বিদেশে থাক অত বিচার-আচার নেই, কিন্তু আমরা তা পারি নে। কই, পান আছে না কি চঞ্চলা? দে তো একটা মা,—সেই সকাল থেকেই মুখটা খালি, পেটটা মোচড়াচ্ছে, বমি বমি করছে গা—যত বদ-অভ্যেস করেছিলাম, তার ভোগ। দে তো মা একটা পান এনে। তুমি চেয়েছিলে বড়বৌ, এই নেও, পুরোন পালো আর আমার ভাণ্ডারে নেই—যা ছিল তা এই পর্যন্ত। গরীবের তহবিলে আর কত থাকে বলো?'

'ও তো কম নয়—প্রায় তিন সের হবে। কত দিতে হবে দাম?'

'বড়বৌ, আমি পয়সা নেব না এইটুকু পালো দিয়ে। ও তো আমার গা-খাটুনির জিনিষ—জংগলের শঠি, কচ্চির বলে দু'রাত্তির ঘষলেই হয়। ওর আবার দাম দিতে চাইছ, লজ্জা করে না। আমরা গরীব,

সময়ে কচু-কুমড়োটাও হাটে বেচি, তা বলে কি তোমার কাছেও বেচব এই চারটি পালো ?’

‘কেন, তাতে দোষ কি ?’

‘দোষ আছে বই কি ! বর্ষাকালে যখন উপোস করি তখন যে সেরে-সেরে চাল দাও, তার কি কোন দিন দাম দিতে চেয়েছি, না তুমি পীড়াপীড়ি করেছ নিতে ? তুমিও খেতে দাও, আমিও খেতে দিয়েছি তোমার মেয়েকে। তোমার জোটে চাল, আমার জুটেছে পালো—তার আর দাম দেবে কি ?’

‘কিন্তু আপনার তো এখন চলে না।’

‘কোন দিনই আমার চলবে না। আমরা এমন ভাগ্য নিয়ে আসিনি যে, সচল হয়ে কেউকে কিছু দেব। অচল অবস্থা ভেবে না দিলে, ও দেওয়াটা চিরদিনই বাকী থেকে যাবে। থাক ও-সব কথা—এখন যে জন্য এসেছি, তাই বলি। চোত মাস যায়-যায়, কুলো বার করবে না ? মা-শীতলার কুলো—ও কাজটা মোটেই বাকী রাখা ভাল দেখায় না। বড্ড ভয় করে, যে কাঁচা-খেকো দেবতা।’

‘আমার তো অনিচ্ছা নেই—আপনারা এলেই হয়।’

‘তবে কাল সকালেই, কি বলো, আর দেরী করে লাভ নেই।’

‘না না, মোটেই না। মা-ষষ্ঠীর কৃপি নিয়ে বাস করি সকলে।’

‘বাড়ী-বাড়ী তো বলে আসতে হয়।’

‘ক’খানা বা বাড়ী। আপনিই একটু বলাবেন কেউকে দিয়ে দয়া করে।’

‘আচ্ছা, তা পারব। কিন্তু পুরুত-ঠাকুরকে তুমি সংবাদ দেবে।’

‘বেশ, সে ভার আমার ওপর থাক্। হাট-বাজারের জন্যও আপনাদের ভাবতে হবে না—ও-সব আমিই করাতে পারব।’

শিবানীর মা আঁচল খুলে পালোগুলো ঢেলে দিয়ে আবার খোঁড়াতে

ঘোঁড়াতে চলে যায়। যাওয়ার সময় গোটা কতক পান মুখে দিতে তার ভুল হয় না।

'বিনু বিনু! একবার এদিকে আয় বাবা।'

'কি করতে হবে বড়-মা?' সৈনিকের মত হুকুম তামিল করতে বিনু এসে হাজির হয়। তার পক্ষে ভালই হয়েছে, আজ এ বেলা আর তাকে কেউ পড়তে বসতে বলতে পারবে না। ক'মিনিট খেটে সে সারা সকালের কৈফিয়ৎ এড়াবে।

'তুমি পুরুত-ঠাকুরকে ডেকে আনতে পার?'

সেই দাড়িওয়ালা, পাকা-পাকা দাড়ি—?'

'হ্যাঁ, তাকেই।'

'বড্ড বুড়ো, ঠুকুস ঠুকুস করে চলে কতক্ষণে আসবে বড়-মা! আমি কিন্তু বলেই চলে আসব।'

'তাই করো—চলে এসো। এখন যাও দেখি বাবা।'

বিনু সৈনিকের মত ছুটে যায়। কত দূর এগিয়ে গিয়ে কি যেন ভাবে। তার পর কুঁজো হয়—নুয়ে নুয়ে ঠুকুস ঠুকুস করে চলতে থাকে। বিনুর অপরিসীম কষ্ট দেখে দূরে বসে কমলকামিনী হাসি সম্বরণ করতে পারেন না।

পরের দিন ভোর বেলায় শীতলাতলায় মহা কলরব পড়ে যায়। পুরুত-ঠাকুর এখন পূজায় বসবেন। পূজা শেষ হলেই ছেলে-মেয়ের দল পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াবে কুলো নিয়ে, বয়স যাদের অল্প আনন্দও তাদেরই বেশী। আজ আর কোন শাসন নেই, বন্ধন নেই—তাই সকলের অন্তর উচ্ছল। কমলা, চপলা, চঞ্চলা ও-বাড়ীর নিভা ও বিভাকে টেনে এনেছে—ওরা আবার টেনে আনবে যুঁই আর শিউলিকে। এমনি করেই গাঁয়ের যুবতী কিশোরী কেউ বাদ যাবে না। বর্ষীয়সী

যাঁরা, তাঁরা তো আসবেনই। তাঁদের দল পৃথক্, এদেরও। যে যার রুচিমত সেজেছে আলতা টিপ কাজলে। সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল, তাই ঐ সামান্য প্রসাধনে ঝলমল করছে শ্রী। ওরা খোঁপায় পরেছে নানা রংয়ের নানা গন্ধের ফুল। ওরা হাসছে. খোঁপার ফুল নিয়ে টানাটানি হানাহানি করছে, আবার উচ্ছৃঙ্খল হাসিতে মুখর করে তুলছে চারদিক। এ গ্রাম্য মেয়েদের একান্ত নিজস্ব উৎসব—আনন্দ ও মিলনের নীতি নিয়েই বুঝি এর সূচনা এবং পরিসমাপ্তি। যতক্ষণ পূজা শেষ না হয়, ওরা লুকোচুরি খেলে, ছুটোপুটি করে শীতলাতলার ফুলের বাগান একেবারে মাতাল করে তোলে। পূজারী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, এখন পূজা শেষ করতে পারলেই তিনি যেন বাঁচেন, এত গণ্ডগোলে কি মাথা ঠিক রাখা যায়! গাঁয়ের শান্ত-শিষ্ট মেয়েগুলোও আজ যেন পাগল হয়েছে।

পূজা সামান্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপার এখন। ঘরে-ঘরে ভিখ মেগে যখন শেষ হবে সকলের সহানুভূতি কুড়িয়ে আনা, তখন হবে খুব ধূমধামে প্রকৃত পূজা। এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল দায়িত্ব কমলকামিনীর ওপর ন্যস্ত। যত চাল-পয়সা সকলই জমা হবে তাঁর কাছে। হাট-বাজার, পুরুত-বিদায়, দান-বিতরণ সকল বিষয়েই থাকবে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। পুরুষেরা যেমন বিপ্রপদকে সকল কাজের পুরোভাগে চায়, মেয়েরাও তেমনি চায় কমলকামিনী।

গাঁয়ের পথে মেয়েদের মিছিল চলেছে। বনের পুষ্পিত লতা-কুঞ্জের তলা দিয়ে, আম কাঁটাল বাঁশ বাবলা-ঝাড়ের পাশ দিয়ে—কখন সরল রেখায়, কখন বা বঙ্কিম রেখায় ঘুরে-ঘুরে পথ গিয়েছে পাড়ায়-পাড়ায়। সেই পথে আজ আনন্দের মিছিল চলেছে,—মেয়েদের মিছিল!

বাড়ী-বাড়ী পরিষ্কার উঠানের ওপর গিয়ে তারা সাপের মত এঁকে-বেঁকে থামে—গান গায়—ভিখ নিয়ে আবার চলতে থাকে। গৃহস্থ-

বধূরা চাল দেয়, পয়সা দেয়। সাধ্যে না কুলোলে অন্য কিছুও যে না দেয়, এমন নয়। এমনি ঘুরে-ঘুরেই দুপুর কাটে। ক্রমে বেলা শেষ হয়ে আসে। সূর্য হেলে পড়ে পশ্চিমে। কমলকামিনী তাড়াতাড়ি করতে থাকেন। অনেক দূরে ফিরে যেতে হবে। এতগুলো মেয়ে-লোক সন্ধ্যার পর যাবে কি করে। থাকতেও পারবে না মাঝপথে। কালীতলার জংলা দীঘির পার দিয়ে যেতে হলে একটু আলো থাকতেই যাওয়া ভাল। যে কেয়া-কাঁটার ঘন বন। বনের ভিতর কি আছে কে জানে।

এমন সময় মাধুরী একটা গানের তান ধরে। সে কমলকামিনীর গ্রামা সম্পর্কে নাতনী।

'এত গান গেয়েও আশ মিটল না বেহায়া মাগীর। এখন আবার মাঝপথে ধরেছে তান।' কমলকামিনী ক্রুদ্ধ স্বরে বলেন, 'সন্ধ্যা হয়ে এলো বলে, আমার করছে ভয় ভয়, আর ওর কি না ফুর্তি চাগিয়ে উঠল। চুপ কর এখন। চল্ চল্।'

সে সুর করে বলে, 'আমি থামব না, আমি থামব না, যাব শিবচর।'

'মর্ মর্, বেহায়া মাগী, মর্। ঐ দেখ্, কারা যেন এদিকে আসছে।' দূরে কতগুলি মূর্তি অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যায়। তাল গাছের পাশ দিয়েই তারা যেন এদিকে এগিয়ে আসছে। ভর-সন্ধ্যা-বেলায় এমন একটা সাংঘাতিক ভয়ের কিছু নেই, তবু সকলের গা ছম-ছম করতে থাকে। কমলকামিনী এবার আবার বলেন, 'মাধুরী, বড্ড যে থামলি এখন?'

মাধুরী জবাব দেয়, 'তোমরা গুরুজনের কথা অবহেলা করতে পার, আমরা তা পারি নে, বুঝলে ঠানদি?'

কমলকামিনী একটু স্মিত মুখে বলেন, 'এখন একটু পা চালিয়ে

চল। দীঘিটা পার হয়ে ছোট মাঠটা ছাড়ালেই তো আমাদের বাড়ী। ভয় নেই, ওরা হাটুরে—শিমুলতলার হাট থেকে ফিরছে বেসাতি নিয়ে। ডালা দেখছ না মাথায় ?'

এবার সকলে নির্ভয়ে চলতে থাকে।

গভীর রাত্রে কমলকামিনী শুয়ে শুয়ে ভাবেন: মাধুরীর মত অতটুকু একটা মেয়েই না জানি বিপ্রপদকে মুগ্ধ করে রেখেছে। মাধুরীও গান গায়, সে-ও না কি গান গায়। রান্না-বান্নার কাজেও না কি নিপুণ! তবে বয়সে একটু বেশীও হতে পারে। হ'ক তাতে তাঁর কি! তিনি তো ও-সব ত্যাগই করেছেন। কিন্তু ত্যাগ করার আগে তিনি একবার গিয়ে দেখে আসবেন। অমরেশের কথা জানিয়ে আসবেন। নামটা সে মেয়েটির কি, তা-ও তিনি এখন পর্যন্ত জানেন না। কি জাতি, কোত্থেকে এলো, কেন এলো···চোখ তন্দ্রায় জড়িয়ে আসে। কমলকামিনী ঘুমিয়ে পড়েন। মাঝে-মাঝে কাল্পনিক মালা এসে ঘুরে-ঘুরে যায়। কমলকামিনী কি যেন জিজ্ঞাসা করবেন, কি যেন বলবেন, তা বলা হয় না। তিনি মালাকে চান না, কারণ তাঁর কাছে মালার নামটা পযন্ত অজ্ঞাত। তিনি চান মালার সুদীর্ঘ ছায়ার অন্তরালে যিনি গুপ্ত আছেন, তাঁকে—প্রিয়তম বিপ্রপদকে !···

পরের দিন যথারীতি ধুমধামের সংগে পূজা হয়ে যায়। সন্ধ্যা-বেলা ওরা গান গেয়ে কুলোখানা নিয়ে খাল-পাড়ে যায়। উলুধ্বনি দিয়ে বরণ-কুলো বিসর্জন দেয় খালের জলে। কুলোখানা নিরুদ্দেশের পথে ভেসে যেতে থাকে। কুলোর বুকে জ্বলন্ত প্রদীপটা স্মৃতিচিহ্নের মত কেঁপে-কেঁপে ওঠে।

কমলকামিনী নির্নিমেষে চেয়ে থাকেন। ভাবেন—মানুষ আজ যাকে মহা আড়ম্বরে বরণ করে আনে, তাকে ঠেলে ফেলে এমনি অনায়াসে।

বড একটা কাজ হয়ে গেল—কমলকামিনী মনে মনে একটা গভীর শান্তি বোধ করেন বাড়ী ফিরে এসে।

এখন তার শিবচর যাওয়ার একমাত্র অন্তরায় শ্রীমতী মণিমালা। শুভ কুশলে তার একটি সুসন্তান হলেই তিনি বাঁচেন। দেবপদ যেমন ছেলেমানুষ, তেমনি হচ্ছে মণি। সেদিন অকারণে রুক্ষ হয়ে দেবপদকে যা বলেছেন, তার জন্য মনে-মনে গ্লানি বোধ করেন। শাশুড়ী মারা যাবার সময় দেবপদকে একটা পুতুলের মত দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কোলে ফেলে। তখন পর্যন্ত কমলকামিনীর সন্তানাদি হয়নি। দেবুটা কি উৎপাতই না করত দুধের জন্য। সারা রাত একটু চোখের পাতা বুজতে পারতেন না। বুকের কাছে কেবলই উস্‌খুস্‌ করত একটা জীবন্ত মাংসপিণ্ড। দিনের বেলা এ-বাড়ী ও বাড়ী থেকে এর তার দুধ খাইয়ে আনতেন। রাত্রে আবার সেই উৎপাত। তখনই তো তিনি একগাছা চুড়ি বেচে, কিনে আনলেন ধবলীর মাকে। রাত্রে ধবলীর মার ওলানের নীচে নিয়ে গিয়ে ধরতেন দেবুকে—যখনই দেবু কেঁদে উঠত দুধের জন্য। ও পাতলা ঠোঁট দিয়ে চুষে-চুষে দুধ খেত। সব সেই রাক্ষুসে দিনের কথা এখনও কমলকামিনী ভুলতে পারেননি।

সেই দেবুর হবে ছেলে। সে রাক্ষসটাও খাবে মণির দুধ। হয়ত ফিনকি দিয়ে ছুটে সে দুধে ভিজিয়ে দেবে বালিশ-বিছানা—মায় ঘরের আঙিনা পর্যন্ত। তা দেখে দেবু হাসবে বিস্ময়ে, মণি হাসবে গৌরবে। এ দৃশ্য তিনিই বা অন্তরাল থেকে না দেখে যাবেন কি করে! শিবচর তাঁকে টানছে, কিন্তু শক্তিগড় তাঁকে ছাড়ছে কই। একটা সুতোই যেন টানা-পোড়েনে জড়িয়ে গেছে।…

চঞ্চলা এসে বলে, 'মা, কাকীমা কাঁদছে।'

'কোন্ কাকীমা ? মেজো না ছোট ?'

'ছোট কাকীমা।'

কমলকামিনী রুষ্ট হয়ে বলেন, 'এই না সেদিন কত করে বুঝিয়ে বললাম, তোর একটা ভাল মন্দ না দেখে কোথাও যাব না—আজ আবার কান্না কিসের ? মাগীর ন্যাকামি দেখলে গা জলে যায়। যত সব ছিঁচ-কাঁদুনীর পাল্লায় পড়েছি আমি। আমার হাড় মাস এদের জন্য পুড়ে খাক হয়ে গেল। চল্ চল্, দেখে আসি ন্যাকামি।'

'তুমি রাগ হয়ো না মা, কাকীমা'র যেন কি হয়েছে ?'

'কি হয়েছে রে ? কেমন করছে ?' কমলকামিনীর কি যেন সন্দেহ হয়। তিনি স্বর বদলে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন করছে রে ?'

'একবার উঠছে, আবার বসছে। আবার ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'তাই না কি ? চল্ চল। মেজোকে সব জোগাড় করতে বল্ গে। যা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?' তিনি হাতের কাছে যে ক'টা ডালা-কুলো ছড়ান ছিল তা গুছিয়ে রেখে ত্বরায় চলে যান। শিবপদকে ডেকে বাইরের আঁতুড়-ঘরের কাজগুলো সারতে বলেন। তার পছন্দসই বেশ বড়-সড় ঘর হয়েছে। একটা বাঁশের ধারাল ছাল কেটে আনতে বলেন—বেশ ছুরির মত হয় যেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই আঁতুড়-ঘরের সব সংগ্রহ হয়।

অধিক রাত্রে একটা কাতরানীর সংগে শিশুর ক্রন্দন শোনা যায়। সংগে সংগে শোনা যায় সাত ঝাঁক উলুধ্বনি।

খানিক বাদে কমলকামিনী একটি ফুলের মত ঘুমন্ত ছেলে মণিমালার মুখের কাছে তুলে ধরে বলেন, 'কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পায় ? দেখ্ তো, কেমন সোনার চাঁদ ছেলে হয়েছে তোর।'

মণি হাসে, কমলকামিনীও হাসেন।

উপস্থিত বর্ষিয়সীরাও দু-একটা ঠাট্টা তামাসা করতে ছাড়ে না।

মণি নীরবে লজ্জারুণ হয়ে ওঠে।

মণির ছেলে হয়েছে—অন্তরায় ঘুচেছে কমলকামিনীর—এবার তিনি শিবচর যাবেন অনায়াসে।

দুই

কিন্তু শিবচর কমলকামিনীর যেতে হয় না। তিনি সংবাদ পেয়েছেন, বিপ্রপদ নাকি নিজেই আসছেন শক্তিগড়। তাঁকে আনতে লোক গেছে। তিনি যখন সহরে তামাদির আর্জি দিতে আসবেন তখনই তাঁকে ধরতে হবে।

বাড়ী আসছেন বিপ্রপদ। তিনি কি রূপসীটিকে সংগে করে নিয়ে আসবেন, না রেখে আসবেন কাছারী-বাড়ীতে? গলকম্বল তিনি ফেলে আসবেন কোথায়—কার হেফাজতে? সংগে সংগে নিয়ে বেড়ান একটা যে-সে মুস্কিল নয়! কেউ জিজ্ঞাসা করলে পরিচয়ই বা দেবেন কি? কমলকামিনী বিপ্রপদর দুরবস্থার কথা কল্পনা করে একটা তীব্র কৌতুক অনুভব করেন।

সন্ধ্যার সময় সারা দিনের উপবাস-খিন্ন পথশ্রান্ত বিপ্রপদ বাড়ী এসে ওঠেন।

'বড়বৌ, সংবাদ ভাল না। তাড়াতাড়ি চারটি খাবার জোগাড় করে দাও—আমাকে এক্ষুণি আবার বার হতে হবে নিতাইয়ের সংগে। ঘোষালেরা এবার বুঝেছে যে আমি কিছুতেই ছাড়ব না, আমার সংগে এঁটে উঠতে পারবে না কোন দিক দিয়েই—তাই এস্তেজাদ্দিকে দশ বছরের জন্য মেয়াদী পাট্টা রেজিষ্ট্রী করে দিয়েছে দক্ষিণের বিলটা। এস্তেজাদ্দি জন-বল ও অর্থ-বলে বলীয়ান। সে যাচ্ছে বিলে লোক-জন নিয়ে দখল করতে। যদি তারা দখল করতে পারে তবে আমাদের বেঁচে

থাকার চেয়ে মরাই ভাল। একবার দখল করে বসলে তাকে তাড়ান বড্ড মুস্কিল। তাই আমরা চাই তার আগে গিয়ে বিলে জুড়ে বসতে। আমাদের কবলা শুদ্ধ, জয় আমাদের নিশ্চিত। আমাকে তাড়াতাড়ি চারটি খেতে দাও।'

'তুমি এখন স্নান করবে না? চেহারা যে একেবারে কালি হয়ে গেছে! এবার আর চিঠি-পত্তর লেখারও ধার ধারোনি—কেমন আছ?' কমলকামিনী বলেন, 'স্নান করে সুস্থ হও, এর মধ্যে সব জোগাড় হয়ে যাবে।'

'তবে যাই এক্ষুণি স্নান করে আসি। বিমলা, বিমলা—এই যা ভুল হয়ে গেল। চঞ্চলা চপলা, কে আছিস মা, কাপড় গামছা দে। তোরা আছিস কেমন? বিমলা শ্যামলার চিঠি পেয়েছিস? অমরেশ কোথায়? এর মধ্যেই কি ঘুমিয়ে পড়েছে, না মাঠ থেকে ফেরেনি খেলে?' কমল-কামিনী কোন কথা বলেন না দেখে বিপ্রপদ একটু বিরক্ত ও বিস্মিত হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'অমরেশ কোথায়? কি, তোমরা সবাই চুপচাপ যে?'

চপলা ও চঞ্চলা মা'র মুখের দিকে তাকায়। বিপ্রপদও তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করেন।

কমলকামিনীর চোখে জল। তাঁর রুদ্ধ অভিমানের ধারা আজ যে এই পথে এমন সময় প্রকাশ পাবে, তা তিনিই বুঝতে পারেননি।

বিপ্রপদ ও মেয়েরা হতভম্ব হয়ে থাকে।

বিপ্রপদ ভাবেন: এর পিছনে নিশ্চয় কোন দুঃসংবাদ আছে। মেয়েরা সঠিক কিছু বুঝতেই পারে না। সকলেই নীরব।

মূল্যবান সময় বৃথা অতিবাহিত হয়—কমলকামিনী বলেন, 'চলো, স্নান করতে চলো। অমরেশ অনেক দিন হয় বিমলার সংগে কলকাতা গেছে।'

'সত্যি বলছ? কোন কিছু গোপন করছ না তো?'

'কোনও কিছু আমাদের নেই যে তা গোপন করব! এখন শীগ্‌গির স্নান করে এসো—আর দাঁড়িয়ে থেক না।'

কথার হুলটা যে কত দূর প্রসারিত তা বিপ্রপদ বুঝতে পারেন, কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে স্নান করতে চলে যান।

খেতে বসে বিপ্রপদ বলেন, 'অমরেশের জন্য বেশ সুবন্দোবস্তই করেছ বড়বৌ। আমি কিন্তু খেয়েই চলে যাব মুসলমান-পাড়ায়। লোক জন লাঠি-সড়কি যোগাড় করতে হবে। হালের বলদও যদি কিনতে পারি ভাল হয়। এ সব জোগাড় করে আজ রাত্রেই পাঠাতে হবে বিলে। কে যাবে না যাবে এখনও ঠিক হয়নি। এখন পর্যন্ত মাত্র দু'টি লোকই হাতে আছে—তারা হচ্ছে নিতাই ও ইমাম। আমি সদর থেকে না বলে চলে এসেছি, আবার সদরে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে পরশুই। চাকরীটাও তো বজায় রাখা চাই। আরও অনেক কথা ছিল—আজ আর বলি কখন—আমাকেও বোধ হয় বিলে যেতে হবে শিবচর ঘুরে। আমি না গেলে হঠাৎ একটা হ্যাংগামা হলে সামলাবে কে?'

'তুমি যাবে এ হ্যাংগামার মধ্যে? তোমার যাওয়ায় কাজ নেই—কাজ কি বিবাদী জমি-জায়গায়।'

'অত দুর্ব্বল হলে চলবে কেন? তুমি না তালুকদারের মেয়ে?'

'যাই বলো, স্ত্রীলোকের মন অল্পতেই অস্থির হয়ে পড়ে।'

'এখন আর পিছু হটার উপায় নেই—যা করেন বিধাতা।'

'একটু সাবধান মত চলা ফেরা করো, অহেতুক পাপের মধ্যে যেও না, খুন-খারাপি যত দূর এড়িয়ে চলতে পার ততই ভাল।'

'বড়বৌ লাভ এবং লোভ এক দিকে—আর পাপ-পুণ্য এক দিকে। তা না হলে কেনই বা যাবে ঘোষালেরা সুখীকে ঠকাতে, আর আমি বা যাব কেন তাকে উদ্ধার করতে?'

'আমি তো তোমার কোন দোষই দেখি নে এতে!'

'এখন পর্য্যন্ত দেখছ না, শেষ পর্যন্ত কি হয় বলা যায় কি!'

'কি আবার হবে?'

'ওই যার ভয় করো—ছু'-একটা খুন-টুন।'

'অ্যাঁ, বলো কি!'

'বলি ভাল, আমি অবশ্য করব না, কিন্তু নিতাই ইমামকে বিশ্বাস নেই।'

হঠাৎ কমলকামিনী নরম হয়ে পড়েন, 'না, না, তুমি যেতে পারবে না? যেতে পারবে না ওর মধ্যে। আমাদের কাজ নেই বিবাদী জমিতে।'

'আবার সেই দুর্ব্বলতা! এখন আর ফিরতে পারব না কিছুতেই। দশ বছর ফসল না পেলেও জমি দখল করতে হবে। এর সংগে আমার ভবিষ্যৎ, আমার ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ জড়িত। ছোট কাল থেকে দেখি রামায়ণ মহাভারত পড়ছে। কোন্ কোন্ রাজা বিনা রক্তপাতে রাজ্য জয় করতে পেরেছে?'

'তাদের সংগে তোমার-আমার তুলনা! কয়েক বিঘা ধানী জমির সংগে একটা রাজার রাজ্যের!'

'তারাও মানুষ ছিল, আমরাও মানুষ—তবে কেন তুলনা হবে না?'

'যা ভাল বোঝ তাই করো, কিন্তু সাবধান!'

যাওয়ার সময় বিপ্রপদ বলে যান যে, তিনি কেন বাড়ী এসেছিলেন এ কথা যেন গোপন থাকে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতে হবে যে, অনেক দিন সংবাদাদি না পাওয়ার দরুণ তামাদীর সময় একটু বাড়ীর খোঁজ-খবর নিয়ে গেলেন। নতুন তালুক কিনেছেন—কেমন আদায়-উসুল হলো একটু জানার আগ্রহ হয় বই কি? কেউ যেন দক্ষিণের বিলে যাওয়ার কথা ঘূণাক্ষরেও টের না পায়।

একটু পরেই নিতাই এসে বিপ্রপদকে নিয়ে যায়।

কমলকামিনীর চঞ্চলতায় কোন লাভ নেই। অস্থির হলেও চলবে না

তাকে। কত যুদ্ধ-বিগ্রহ করে তাঁর পিতা-পিতামহরা বিষয় সম্পত্তি করেছেন, এত দিন তাঁর সে সব কথা স্মরণ হয়নি। জমিজমাশূন্য প্রতিষ্ঠাহীন পরিবারে পড়ে তিনি নিরীহ হয়ে গেছেন—ভুলে গেছেন সবই। তাঁকে দৃঢ় হ'তে হবে। তিনিই এক দিন যে স্থাবর সম্পত্তি খরিদের প্রেরণা দিয়েছিলেন, অনুমোদন করেছিলেন—তা যখন কেনা হয়েছে, তখন তা রক্ষার অন্তরায় হবেন কি করে? অহেতুক যদি দু'একটা খুন জখম হয়, হক।

কিন্তু এমন অদৃষ্ট যে, যাঁর কাছে যাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল সেই বিপ্রপদই অপ্রত্যাশিত ভাবে বাড়ী এসে উঠলেন, নিয়ম মত স্নানাহার করে গেলেন, কুশল প্রশ্নও করলেন, কিন্তু বিশেষ কথাটা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো না। হয়ত বিপ্রপদ নিজেও বলতেন কিন্তু সে সব প্রসংগ নিয়ে আলাপ আলোচনা করার আর উপযুক্ত সময় হলো কোথায়? সুযোগ এলো—ধারণাতীত ভাবেই এলো, কিন্তু তা দুযোগের মেঘে ঘিরে কমলকামিনী রইল—কিছু বলতে পারলেন না কমলকামিনী। তিনি ভেবেই উঠ্‌তে পারেন না—এ হলো কেমন।

তিন

'চুপ করুন বাবু, চুপ—এটা এস্তেজদ্দির ঘাট।'

'ধীরে ধীরে ডোঙাটা বাও—যেন শব্দ না হয়। কান খাড়া করে আছে শত্তুরে।'

রাত্রির অন্ধকারে দু'জনে গা ঢাকা দিয়ে চলেছেন ইমামদের বাড়ী। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার তাতে আবার আকাশে দক্ষিণা মেঘ। হু-হু করে মরসুমী বায়ু চলছিল—এই মাত্র থেমে গেছে—তাই আকাশ-ভরা জলো মেঘ। থমথম করছে চার দিকের গাছ-পালা। আবার বাতাস না চললে এই মেঘে বৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

'কিছুই তো দেখছি নে নিতাই, জল আর পার একাকার। কূলের গাছগুলো তো চেনা যায় না!'

'ভয় নেই। আমি ঠিক ঘাটমত নিয়ে যাব। এমনি আঁধারেই তো চলাফেরা করা ভাল।'

কিছুক্ষণ বাদে বিপ্রপদ আবার বলেন, 'এত লোকজন কি এক রাত্রিতে জুটবে? এমনিতেই দক্ষিণের বিলের কথা শুনলে লোকে ভয় পায়।'

'জুটবে বাবু, সব জুটবে। আপনি কখনও অবিশ্বাসের কাজ করেননি—আশা করে এসে কোনও দিন আপনার দোর-গোড়া থেকে কেউ একেবারে নিরাশ হয়ে যায়নি, মা-ঠাকরুণও কেউকে কক্ষন অবেজ্ঞা করে মুখ-ছাট মারেননি—আপনার হবে লোকের অভাব! কিছুর অভাব হবে না বাবু।'

'কি জানি! তোমরা সর্বদা গ্রামে থাকো, তোমরাই বলতে পার সব।'

ইমামদের ছোট খালটায় এসে নৌকা থামে। নিতাই হাত ধরে বিপ্রপদকে পথ দেখায়। একটা আস্ত খেজুর গাছ জল থেকে পার পর্যন্ত এড়ো করে ফেলা রয়েছে। সেই গাছটা বেয়ে দু'জনে ওপরে ওঠেন—আগে নিতাই, পরে বিপ্রপদ, অনেকটা আন্দাজে অন্ধের মত।

ওপরে উঠে বিপ্রপদ বলেন, 'খালি হাতে কি এ সময় পথ চলা ভাল—চার দিকে তো এখন আর আমাদের মিত্তিরের অভাব নেই।'

'কেন খালি হাতে আসব? আমি কি এত বোকা! এই দেখুন।' বলে নিতাই একটা সুতীক্ষ্ণ ল্যাজা বের করে দেখায়। ফালটা তার মুঠম হাত লম্বা। অন্ধকারেও ঝকঝক করছে। নিতাই সগর্বে দাঁত বার করে হাসে।

বিপ্রপদ সন্তুষ্ট হন, 'এই তো চাই নিতাই, আমার ঘরের তেতলায়

প্রায় দু'শ বড় ফালের ল্যাজা আছে—রামদাও আছে ছোট-বড় পাঁচ-সাতখানা। লাঠিও প্রায় দু' তিন কুড়ি রয়েছে—সব পাকা বাঁশের। তোমার মা'ঠান সব জানেন, দরকার বোঝে চেয়ে এনো।'

'বলেন কি। কোথায় পাব এত লাঠি সোঠা অস্তর-পাতি এক পাড়িরে, তাই ভেবেই অস্থির আমরা। বিধাতা সহায় আমাদের—নইলে এ সব খোজ পাব কেন? যেখানে যাব জন্য হাত দি সেখানেই তাই যেন গুছিয়ে রেখেছেন।'

দু'জনে ইমামদের বাড়ীর উঠানে উঠতেই প্রশ্ন হয়, 'কে?'

বিরত কণ্ঠে নিতাই বলে, 'আমি এস্তেজদি। কেন, ভয় করছে না কি?'

দশ বার জন লোক একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ওঠে।

ইমাম বলে, 'সরদারের পো বংগো জানে। আদাব বাবু, আদাব—ক্যামন আছেন?'

'ভালই—তোমরা?'

'এই এক রকম।'

একটা জলচৌকি দু'-তিন বার ঝেড়ে পুঁছে বিপ্রপদকে বসতে দেওয়া হয়। তিনি আসন গ্রহণ করলে উপস্থিত লোক-জনেরা মাটিতে বিছান একটা হোগলায় বসে পড়ে। অন্ধকারে পান-তামাক হরদম চলতে থাকে। ইছমাইল মিঞা বিপ্রপদর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে এগিয়ে এসে হঠাৎ তাঁকে জড়িয়ে ধরে। 'জোগাড়-যন্ত্র বেবাক করইয়া দিলাম, জয় হইয়া আইও বাবু। হ্যাশের শয়তান দমন করা চাই। আমি বুড়া হইছি, নইলে যাইতাম তোমাগো সাথে বিলে।'

'তোমাদের দোয়া থাকলে সব পারব মিঞার পো। বসো, বসো আমার পাশে।'

রহিম এসেছে, আবদুল এসেছে—আর তিন জন যে কারা এসেছে,

তাদের বিপ্রপদ চিনতেই পারেন না। 'তার পর তোমরা সব কেমন আছ? রহিম, আবদুল?'

ইমাম জবাব দেয়, 'ভালই আছে সকলডি। আইজ আপনে না আইলে কেও কি ভাল থাকত? আমার গায় তো জরই আইত।' সে বড় খুশী। বাবু এসেছেন তাঁর বাড়ী এবং তার বাড়ী বসেই হচ্ছে এত বড় একটা গভীর বিষয়ের সংগঠন।

'ওরা কারা, ঠিক তো চিনতে পারলাম না?'

উত্তরে একত্রে তিনটি লোক মৃদু অথচ গভীর হাসি হেসে ওঠে।

'মিতা, একটা লম্ফ আনো জ্বালিয়ে। বাবু দেখুন, চেনে কি না ওদের।'

একটা জ্বলন্ত ল্যাম্প আনা হয়। বিপ্রপদ বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি, চিনেছি সকলকে। তোমরা কি করে এলে? তোমাদের না কালাপানি হয়েছিল?'

'না, তা হয়নি ওদের। ও-সব মিথ্যা কথা—হয়েছিল ক'বছর জেল।' নিতাই বলে, 'অনেক চক্রান্ত করে, ডাক্তারকে ঘুষ দিয়ে, ভীষণ অসুস্থ লিখিয়ে ওদের জান-খালাস করে বাইরে আনতে হয়েছে।'

ইছমাইল মিঞা বলে, 'তা কি পারত ওরা আইতে যদি না নিতাই ওগো সাহায্য করত টাকা-পয়সা দিয়া! টাকা অবশ্যি সে গাঁইট থিকা দেয় নাই—দেছে আপনার তালুকের আয় দিয়াই গোপনে, কিন্তু কামডা খুব ভাল হইছে। এমন পোক্ত লোক না হইলে কি বিল দখল করা যায়? আগে কথাডা নিতাই প্রেকাশ করে নাই, যদি ওরা খালাস না পায়! এখন সকলে জানল, জানুক—অথের তো সৎ ব্যয় হইছে।'

এতক্ষণে বিপ্রপদ বুঝতে পারলেন যে, কি জোরে নিতাই পথে পথে জন-বলের ভরসা দিয়েছে। এ সব কাজের পরামর্শদাতা যে

ইছমাইল মিঞা তাও তাঁর বুঝতে কষ্ট হয় না। এরাই বাস্তবিক হিতাকাংখী। তাঁর কি কি প্রয়োজন তা জানাব আগে, বোঝাব আগে —এমন কি ভাবার আগেই জোগাড় করে রেখেছে প্রিয়বন্ধুর মত। তিনি আনন্দ গোপন করে জিজ্ঞাসা করেন, 'এখন কি করতে হবে?'

ইছমাইল মিঞা বলে, 'এখন বাতিডা নিবান, কেডা আবার দেইখ্যা ফেলে, কওয়া তো যায় না।'

কথাটা সত্য। সকলে মাথা নাড়ে। জেল-খালাস তিন ভাই এক সংগে ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে ফেলে। তাদের মুখ তিনখানা দেখতে একটু স্বতন্ত্র। কিন্তু ভাই-ভাইতে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। চাপদাড়ি ও চোখের চাহনীতে একটা গভীরতার সন্ধান পাওয়া যায়। এরা যা ভাবে এবং বলে তা অতি কঠোর হলেও সরল অন্তঃকরণে করে যায়। এত মানুষ বিপ্রপদ দেখেছেন কিন্তু এমন মানুষ তাঁর নজরে পড়েছে খুব কমই। এরা তাই বুঝি শান্ত মনে হাসতে পারে—খুনও করতে পারে অকুণ্ঠ শোণিতে।

আরও এগিয়ে এসে সকলে বিপ্রপদকে ঘিরে বসে অর্দ্ধবৃত্তাকারে।

নিতাই বলে, 'বিলে পাঁচ-সাত ঘর স্থায়ী রাইওৎ না বসালে চলবে না। এরা সব যেতে চায় এবং মনে-প্রাণেই যাবে—কারণ সকলেই আপনার কাছে উপকৃত। এরা ঠিক ঈশ্বরের মত আপনাকে বিশ্বাস করে। তবু আপনার মুখ দিয়ে শুনতে চায়, কি স্বার্থে এরা বিলে যাবে এত বড় বিপদ মাথায় নিয়ে।'

'আমি কি দেব না-দেব তা আমার মুখ দিয়ে বলা ভাল নয়—এরা কি চায়? কি পেলে সন্তুষ্ট তাই আগে বলুক শুনি। আমি জমি পয়সা দিয়ে খরিদ করিনি—সুখীর দুঃখে এবং তোমাদের কথায় কিনেছি, এ কথা তোমরা সকলেই জান। এখন তোমরাই খেটে-খুটে উদ্ধার করবে, আমি চালাব খরচ-খরচা।'

'আপনি টাকা দিয়ে করেছেন, না বিনা পয়সায় করেছেন—তা কেউ জানতে চায় না। আসল জমির মালিক আপনি—আপনার মুখ দিয়ে এরা শুনতে চায় ভবিষ্যতে কি পাবে!'

'আমি তো নিতাই আগেই বলেছি, এখনও বলছি—জমি আমি পয়সা দিয়ে কিনিনি—তবে যা অদ্যাবধি ব্যয় করেছি তা বহায়ের তুলনায় সামান্যই। এর পর যা ব্যয় হবে তা তো আমি দিতেই প্রস্তুত। পয়সা আমার, খাটুনী তোমাদের—সে হিসাবে আমরা সকলেই এ জমির অংশীদার। দলিল আমার নামে হয়েছে তাতে কিছুই এসে-যায় না। আমি কেউকে নিরাশ করব না—সে ইচ্ছা আমার মনে কোন দিন নেইও। এখন সুখীর জন্য একটা ব্যবস্থা করে, বাকী সব তোমরা বণ্টন করে নেও, আমাকেও দাও। তোমরা সকলে মিলে-মিশে যা বন্দোবস্ত করবে তাতেই আমি রাজী—তাতেই আমি সুখী।'

'সাবাস সাবাস!' ইছমাইল মিঞা বলে, 'হাতী মরলেও লাখ টাকা, বাঁচলেও লাখ টাকা। যেমন বাবু তেমন তার ব্যবস্থা। ভাই সব, এত বড় কলিজা জন্মেও তোমরা দেখছ কোনও খানে? এখন আর কথা কইও না, রওনা দেও বিলের দিকে। যে ব্যবস্থা উনি করইয়া দ্যান তাই সই। শোনছ কখন, কবলার জমি কেও জান থাকতে ভাগ করইয়া দেয় অন্যেরে?'

নিতাই বলে, 'আমার কথা শুনে আমাকে যেন ভুল বোঝেন না বাবু। আমি আর আমার মিতা জমির লালসায় বিলে যাব না—যাব, যে ঘোষালেরা দিন দিন অত্যাচার করছে আমাদের ওপর, যে এন্তেজদ্দি নির্বিচারে অন্যায় করছে আমাদের ওপর—তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। ওরা সব কাল সাপ। ঐ বিল দখল করার অর্থ কাল সাপের বিষ-দাঁত ভেঙে দেওয়া। শুনলাম, ঘোষালেরা বুদ্ধিমানী করে এখনই না কি মেয়াদী পাট্টা দিয়েছে এন্তাকে দশ বছরের জন্য। এ বছরই ধান পাবেন

না, কত্তারা খাবেন কি? এই তো সবে সুরু হলো—রহিমের বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস লাগবে না—হাড়ে-হাড়ে লাগবে।'

রহিম ছিল দাঁড়িয়ে। সে যেন একটা বিগত বিস্মৃত কাহিনী শুনছে। শুনেই ধক্ করে তার বুকটা জ্বলে ওঠে, সে বলে, 'বাবু, আমিও যামু বিলে। যে বিলে আমার সোনার চাঁদ দুইডা পরাণ দেছে, সেই বিলে আমিও আজ জান কবুল করলাম। আমি ছেইলা-মাইয়া সব লইয়া যামু, বসত করুম গিয়া সোনার চাঁদের ছ্যাশে।'

ইমামও উত্তেজিত হয়ে বলে, 'আমি জায়গা দিয়া কি করুম? আমি চাই এস্তারে। যেদিন ওর ঘাড ভাইঙ্গা রক্ত খামু সেদিন পরাণডা আমার জুরাইবে। বুকটা আমার ফাইট্টা যায়।' বলে তার বুকের ওপর একটা বলিষ্ঠ করাঘাত করে।

জান-খালাস তিন ভাই কিছু না বলে পূর্বের মত একটু মৃদু গভীর হাসে।

ইছমাইল মিঞা বলে, 'ভাই সব, তোমরা একটু থামো, কাজের কথা একটু কইয়া লই। বাবু কইছেন জমির ভাগের কথাডা এখনি তোমাগো শুনাইয়া দিতে। আমি বুড়া মানুষ, আমার কথাডা যদি রাখো তয় আমি ব্যবস্থার কথা কইতে পারি।'

ইমাম বলে, 'তুমি খালের ও-পারের মেয়া চাচা, তোমার কথা শোনবে না এমন মাথাডা কার? আমরা দুই মিতায কিন্তু জমি চাই না। তোমার ব্যবস্থা চিরদিন মানইয়া আইছে সকলডি, আইজও মানবে তারা।'

নিতাই বলে, 'এখন বলে ফেলো, রাত অনেক হয়েছে। এখনও কত কাজ যে বাকী আছে তার ইয়ত্তা নেই।'

তবু ইছমাইল মিঞা ইতস্তত করতে থাকে।

হেতুটা নিতাইর বুঝতে কষ্ট হয় না। সে বলে, 'এই জান খালাস

তিন ভাইকে ভয় করছ মিঞার পো? ওদের যা বলবে, তাই ওরা শুনবে। আমি তার জন্য জাবিন রইলাম। ব'লে ফেল,—তাড়াতাড়ি বলে ফেল।'

সাহস পেয়ে ইছমাইল মিঞা বলে, 'উচিত জমির ভাগ হইবে নয় আনী, সাত আনী—বাবুর নয় আনী, তোমরা সাত আনী! বাকী অনাবাদি জমি তোমরা পাবা দশ আনী, বাবু পাবে ছ'য় আনী। কিন্তু মনিরা জমি আবাদ করইয়া দেবা তোমরা গায় খাটইয়া। কবলার মাপ ছাড়া যা বলন জমি হইবে, তা পাইবেন বাবু। সেদিকে তোমরা লোভ করতে পারবা না। কেমন, ঠিক তো? যদি জমি চিরদিন ভোগ করতে হয়, তয় এখনি গিয়া কায়েমী হইয়া বইতে হবে বিলে। নাম মাত্তর খাজনা দিয়া খাবা জমি, বাবু তোরাগো দিকে ফিরইয়াও চাইবে না। যে পারবা যাইও, যে না পারবা এখনি ফেরো। হাল-হালুটির জন্য দাদন লাগলে বাবু দেবেন। তোমরা আয়ামে ধান ওঠলে শোধ করইয়া দিও টাকায় যা পার ব্যাজ দিয়া। যার জমি-জায়গা নাই, সে এমন সুযোগ ছাড়ইও না। এমন সুযোগ আসে কালে-ভাদ্রে। এয়া যে ছাড়ে, সে এ্যাট্টা বলদ।'

জমি কবলা করে শুধু দখল করার জন্য এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে কেউ যে কখনও দান করে, এ কথা ওরা আজ নতুন শুনল। তাই সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। সকলে বিপ্রপদর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তিনি অংশ দিতে চেয়েছেন, তা বলে কি বিলিয়ে দেবেন ইছমাইল মিঞার কথায়।

বিপ্রপদ বলেন, 'আমি এতে সানন্দে রাজী হলাম। তোমরা?'

রহিম বলে, 'আমরা আর কি কমু, খোদার দোয়া।'

বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'সুখীর বন্দোবস্ত কি হবে, সে কথা তো বলা হলো না। যে আসল—'

'ও, ঠিক ঠিক। সে পাবে সকলের ফসলের ভাগে উপর দিয়া মন মন পঞ্চশ কাঠি ধান। ধান কম জন্মিলে কিছু কম পাবে, বেশী হইলে তো কথাই নাই।'

বিপ্রপদ বলেন, 'আমার এখানে একটু বক্তব্য আছে। আমি প্রজাদেব কাছে খাজনা চাই নে। তার বদলে ওরা বিঘা কয়েক জমি যদি চাষ-আবাদ করে সম্পূর্ণ ধানটা সুখীকে দিয়ে দেয়, তবে খুব ভাল হয়। আমিও খানিকটা জমি ছেড়ে দেব ওর জন্য।'

ইছমাইল মিঞা বলে, 'কায়েতের পোলা চোমৎকার বন্দেজ করছে। এর উপর কথা কওযা যায় না। বাবু, তুমি এতগুলো দেশী মানুষের ভাতের ব্যবস্থা করলা, আবার দোয়া করি তুমি জয়ী হইয়া আইও।'

সকলে মাথা নাড়ে, সায দেয়, চমৎকার বন্দোবস্ত বটে।

'এদিকেব কাজ তো হলো, ওদিকেব কি কি বাকী?'

নিতাই জবাব দেয়, 'আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, একটা বড কাজই বাকী আছে।'

'এমন কি বড কাজ নিতাই?'

'আপনি তো জানেন আবদুলের বৌ মারা গেছে অনেক দিন। এক বুড়ো মা ছাড়া সন্তানাদিও নেই যে, সময় মত ওকে রেঁধে দু'টো ভাত দেবে। ও বেচারা হাল ঠেলবে, না ভাত বাঁধবে? ও একটা বিয়ে কবতে চায়। সেই বৌ নিয়ে যাবে বিলে। মা থাকবে এখানে। বাড়ীতে যা আছে, তাতে তার একটা পেট চলে যাবে। ও নতুন সংসার নিয়ে যাবে আমাদের সাথেই, কিন্তু সমস্যা এই, বিয়ে করতে কমছে-কম পাঁচ টাকার দরকার। তা ওকে এখন কে ধার দেবে? টাকা পাঁচটা পেলে ও এখন খোস-মেজাজে বৌ নিয়ে যেতে পারে।'

'ওই ছাপান্ন বছরের বুড়োর জন্য কে মেয়ে রেখেছে সাজিয়ে যে, এক্ষুণি টাকা পাঁচটা পেলে নায়ে তুলে দেবে?'

'ও বুড়ো হলেও তো ওর ধানী জমি হলো। এখন আর ওকে মেয়ে দিতে ভয় কি। মরে গেলে বিধবার জন্য এতগুলো জমি থাকবে। যদি একা খায় ভালই, যদি নিকা বসে, সেও ভাল '

'মেয়েটার বাড়ী কোথায়? বাপের নাম? বয়স কত?'

'বাড়ী এখানেই। বাপ-মা নেই, দাদা-দিদি আছে। বয়স পনা-ষোল হবে।'

বিপ্রপদর মনটা কেমন যেন বিকৃত হয়ে ওঠে, বলেন, 'সম্বন্ধটা ভালই, খাসা মিল হবে।'

ইছমাইল মিঞা জবাব দেয়, 'এ তো আর বাবুগো বিয়া না—গরীব-গরবার বিয়া। ওরা বোঝে, যার ঘরে ভাত, তার ঘরে জাত। এ বিয়া তো মন্দ না। গরীবের মাইয়া—বাপ মা নাই—জমিজমা-ওয়ালা সোয়ামী পাইবে, বেশ প্যাট ভরাইয়া চারডি খাইবে, আর কাম করবে দিন ভরইয়া।'

'তুমিও কি মত দাও ইছমাইল মিঞা?'

'হুঁ, দিমু না ক্যান? উপাসইয়ার মাইয়া কি যাইবে বাদশার ঘরে?'

'তা হলে নিতাই, আমার তহবিল থেকে ওকে পাঁচটা টাকা দাও। পাঁচ টাকায় একটা বিয়ে, আশ্চয করলে তোমরা! একটা ভাল ছাগলও তো পাচ টাকায় পাওয়া যায় না।'

'গরীব-গরবার উপর শাপান্তর আছে বাবু।' রহিম বলে, 'শাপান্তর আছে। নইলে আমাগো ঘরের এট্টা সোমত্ত মাইয়ার একটা বকরীর তুল্য মূল্যও নাই ক্যান?'

'ক্ষেত্তর বিশেষে অমনি দাম থাকে না রহিম। নিতাই জবাব দেয়, 'সব সমান হলে আর দুনিয়া চলত না। যাক সে কথা। আজ সরা হবে, অর্থাৎ মেয়ের অভিভাবক স্বীকার করে যাবে, কাল আমরা টাকা পাঁচটা দিয়ে মেয়ে নৌকায় তুলে নিয়ে দক্ষিণে রওনা দেব।'

এতক্ষণ বাদে আবদুল বলে, 'আপনাব মত না থাকলে কাম নাই আমাব বিয়ায় বাবু। যে দুঃখে দিন কাটাই, বাকীডাও কাটামু সেই ভাবে। মরলেও কেও ডাইক্যা জিগ্গাবার জন নাই। মা তো আর শ্বউরের ভিড়া ছাড়াইয়া যাবে না বিদ্যাশে।'

'তুমি দুঃখ কবো না আবদুল। তোমার সমাজে কেউ নিষেধ না করলে আমি অমত করতে যাব কেন? টাকা চেয়েছ, টাকা দিচ্ছি—এখন যা ভাল বোঝ, তাই করো। আমাব কাছে তো আব বলার কিছু নেই। কি বলো তোমরা?

'দোয়া করবেন বাবু।'

বিপ্রপদ হাসিমুখে উত্তর দেন, 'নিশ্চয় করব—অন্তত টাকার মায়ায়ও করতে হবে বই কি। বছর বছর তোমার ছেলে মেয়ে হক, আমার বিল সরগরম করে রাখুক।'

'আমার কি সেই বরাত—বয়েস হইল ছ'পঞ্চাশ।' আবদুল ক্ষুণ্ণ মনে বলে, নছিবে নাই ছা'ওয়ালের মুখ দেখা। থাকলে, আইবুড়া কাটামু ক্যান জুয়ান কালডা?'

'তাতে হয়েছে কি? এখনও সময় আছে—তোমার আশা পূর্ণ হবে।'

'আদাব বাবু, তাই হয় জানি আপনাগো দোয়ায়।'

'নিতাই, রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো—এখন আর কি করতে হবে, বলো।'

'উঠিত জমিগুলো চাষ করতে হলে আপনার ভাগেই প্রায় দশখানা হালের দরকার। তার জন্য অন্তত বাইশ-তেইশটা জোয়ান বলদ চাই। কুড়িটা সব সময় খাটবে, বাকী দু'-তিনটা দেড়ি থাকবে—এক-আধটার অসুখ-বিসুখ হলে কাজ চালান চাই তো। ইছমাইল মিঞার গরুর কারবার আছে, তাকে আমি বলদ বেছে রাখতে বলেছি—হালি চালানের বলদ। জিজ্ঞাসা করুন, উনি তা ঠিক করে রেখেছেন, এখন

আপনার দেখে-শুনে পছন্দ হলে টাকা-পয়সা দিতে পারেন। তারপর দশ জন কৃষাণ, যারা চাষ-আবাদ করবে তাদের ভারও নিয়েছে মিঞার পো। তাদের সাথে মজুরী ধানের একটা চুক্তি হ'য়ে গেছে—কত দাদন দিতে হবে, সে কথাও বোধ হয় বাকী নেই। আপনি হুকুম দিলেই আমি সব একত্র করতে পারি। আজ রাত্রে আর রওনা দেওয়া যাবে না—কারণ এর পর কাঠ-কুটো—ঘর-দোর তোলার সাজ-সরঞ্জাম—একে একে কত কি যে জোগাড় করতে হবে, তার আদি-অন্ত নেই। শূন্য মাঠে গিয়ে সংসার ফেঁদে বসতে হবে, গরু-বাছুর নিয়ে করতে হবে চাষ-আবাদ—সংগে সংগে দরকার হলে আবার চালাতে হবে লাঠি-সড়কি, ধারাল ল্যাজা। এ কি যে সে উৎপাত বাবু!'

'হুকুম আমি দেব, না তুমি দেবে? আমি ও-সব বুঝি না কিছুই। আজ তুমিই বুদ্ধিদাতা, তুমিই হুকুম দেওয়ার মালিক। আমি শুধু শুনে যাব—পারলে প্রাণপণ তা করে যাব।'

'বাবু, এ কথা বলে আপনি আমাকে লজ্জা দেবেন না—আমি আপনার গোলাম বই তো না!'

'নিতাই, তুমি গোলাম, ইমাম গোলাম—এরা রাইওৎ প্রজা উপকৃতের দল, তবে আমার বন্ধু কে নিতাই? আমি আমার সমস্ত খোলস ছেড়ে মিশতে চাই তোমাদেব দলে, চলতে চাই তোমাদের সংগে সংগে—তোমরা একটা সম্মানের প্রাচীর তুলে যদি আমায় দূরে ঠেলে রাখো, ফেলে চলে যাও মাঝপথে, তবে আমি কোথায় দাঁড়াব আজ?' বিপ্রপদ আনন্দে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে যা বলেন, নিতাইর কাছে তার অর্থ সামান্যই বোধগম্য হয়—হয়ত একেবারেই হয় না।

সে মনে করে, বিপ্রপদ এত ঝামেলা দেখে অধীর হয়েছেন তাই সে সান্ত্বনার স্বরে বলে, 'বাবু, আপনার কোন চিন্তা নেই, ধৈর্য্য ধরুন, আমরাই সব করে-কুলিয়ে দেব।'

'তাই দাও, আমি এই নিশ্চিত মনে বসে রইলাম।'

'আপনি সুস্থ হয়ে দেখুন, আপনার নফর দু'টো কি করতে পারে।'

'তোমাদের দু'টি বন্ধুকে আমি টাকা দিয়ে খরিদ করিনি, এমন কোনও স্বার্থ দেইনি যে, প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ কায়েম হতে পারে। তোমরা আজ যত বারই গোলাম-নফর বলে ছোট হতে যাবে, তত বারই আমার লজ্জায় মাথা নীচু হবে, অন্তরেও পাব আঘাত। তোমরা আমাকে ভালবাস, বিনিময়ে আমিও চাই তোমাদের ভালবাসতে। বারংবার তোমরা আমাব কানে শুনিয়েছ, তোমরা কিছু প্রার্থনা কর না, যাচ্ঞাও কর না—কিন্তু আমি করি এবং হয়ত তা চিরদিনই করব, সে তোমাদের দু'টি ভাইয়ের ভালবাসা।' তার পর একটু থেমে বিপ্রপদ আবার বলেন, 'দক্ষিণের বিলের সমতল ক্ষেত্রে যে মহামিলনের সুযোগ দিয়েছেন বিধাতা, সে সুযোগ শুধু ধনের না, মানের না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়ার সুযোগ। তাই গৌরবের খোলস ত্যাগ করে হাতে হাত মিলিয়ে যেতে চাই সকলে। প্রভু বলে, মনিব বলে আজ আমাকে সে সুযোগ থেকে কেউ বঞ্চিত করো না।'

নিতাই বলে, 'বাবু, আপনি অত অধীর হবেন না।'

বিপ্রপদ মনে মনে বললে, 'আবার বাবু।' দুঃখিত হয়ে ভাবেন : এরা তাঁর অন্তরের কথা বুঝবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঠিকেও এদের ভুল নেই। এ কেমন ব্যাপার! বাবুও বলে, বন্ধুর চেয়ে হয়ত বেশীও ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। ভক্তি ও সম্মানের পথ দিয়ে যে ভালবাসা ও আত্ম-নিবেদন আসে, তারও যে মূল্য কম নয়, তা বিপ্রপদ বুঝতেই পারেন না।

ইমাম বলে, 'এখন গরুর টাকাডা দিলেই তো এদিকে কাম এক রকম শ্যাষ হয়।'

'কত টাকা দিতে হবে ইছমাইল মিঞা?'

'শ' পাঁচেক!'

'পাঁচ শ'—বলো কি?'

'আশ্চর্য্য হইলেন? তল হাতাইয়া দেখেন নাই এখনও। গড়ে এট্টার দাম পঁচিশ টাকারও কম পড়ে।'

'তা ঠিক!' তবু মনটা টন-টন করে ওঠে বিপ্রপদর। এতগুলো টাকায় শুধু গরুই কিনতে হবে! এর পর কৃষাণ খরচ, খোরাকী খরচ, মামলা খরচ—আরও কত ব্যয় আছে, তার তো অন্তই নেই। বিপ্রপদ নিতাই ও ইমামকে ডেকে একটু অন্তরালে নিয়ে গিযে বলেন, 'তোমরা মা-ঠাকরুণের কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে এনো কাল। যা যখন লাগবে, চাইলেই দেবেন তিনি—এ সব বন্দোবস্ত আমি পূর্বেই করে এসেছি। তোমাদের কোনও চিন্তা নাই, বুঝলে? কিন্তু একটু বুঝে-সুজে ব্যয় করো। যা যখন কিনবে, একটু দেখে-শুনে দর-দস্তুর করে কিনো। আমি তো চাষ-আবাদে অজ্ঞ—তোমাদের আর কি বোঝাব বলো।'

'আপনি যা বলতে চাইছেন, তা আমি বুঝেছি। কাল আমরা সব বলদগুলো নিজেরাই চষে মই দিয়ে পরখ করে নেব। তবে তো টাকা। পছন্দ না হলে টাকা কিসের? টাকা আর গাছের ফল না যে, নাড়া দিলেই পড়বে। আমরা মুখ্যু হতে পারি, কিন্তু আহাম্মক না।'

'তাই করো—দেখে-শুনে টাকা দিও।' তার পর বিপ্রপদ সজোরে বলতে বলতে আসেন, 'এখন আর বেশী রাত নেই—আমার রওনা হওয়ার ব্যবস্থা কি?'

'বাবু, তা হলে আমি গিয়ে জোগাড়-যন্ত্র করি। একখানা নাও কেরায়া করে আনতে হয়। রাতারাতি যদি আপনি গ্রাম ছাড়তে পারেন, তবে কেউ তেমন কিছু সন্দেহ করতে পারবে না। তবে আপনার একটু কষ্ট হবে, এই যা। তা কি করবেন বলুন! এমন তো কত কষ্টই মানুষের জীবনে করতে হয়!'

মুসলমানরাও একে একে সেলাম করে উঠে পড়ে। আজ রাত্রে বিলের দিকে আর রওনা হওয়া গেল না—আগামী কাল আর বাধা হবে না কিছুতেই।

'ইমাম, আউশ ধানের বীজের কি ব্যবস্থা করেছ।'

সে বলে যে, দশখানা ছোট ছোট ক্ষেত চাষ করে দুধের সরের মত নরম করে সাজিয়ে ক'খানায় যেন বীজের অংকুর ছড়ান হয়েছে—বাকী ক'খানায়ও বীজ বোনা হবে শীঘ্রই।

'বীজ ধরেছে কেমন?'

'ছাখবেন?' ইমাম উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে। 'ছাখবেন আউস ধানেব নতুন কোণ্ডা (অংকুর)?'

'চলো, দেখে আসি।'

তখন পূব দিক্ ফর্সা হয়ে গেছে। বিপ্রপদ উঠান ছাড়িয়ে কতটুকু এগিয়ে গিয়েই জমির পার্শ্বে দাঁড়ান। আউসের বীজ এমনি বাড়ীর সংলগ্ন নীচু জমিতেই ছড়ান হয়। তা না হলে গরু-বাছুরের মুখ থেকে রক্ষা করে রাখা যায় না।

প্রথম ভোরের আলোতে বিপ্রপদর সংগে প্রথম পরিচয় হয় নবীন আউশ ধান্যাংকুরের। সরস মৃত্তিকার স্নেহে তারা যেন রোমাঞ্চিত হয়ে রয়েছে। কি অপূর্ব! অনেকক্ষণ দেখে দেখেও বিপ্রপদর যেন আশা মেটে না। এমন বীজ তিনি কত দেখেছেন, কিন্তু আজ যেন তাঁর চোখে অভিনব বলে বোধ হয়। তিনি বুঝলেন: নববর্ষের প্রথম সপ্তাহে নতুন খাতে তাঁর জীবন গড়িয়ে চলল। এই তার সূচনা—সাথী ঐ ধান্যাংকুর। সুযোগ পেলে তিনি এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবেন তাঁর জীবনের খাতার পাতায়।

আজ তেশরা বৈশাখ।

'বাবু, নৌকা তৈরী। আর দেরী করলে সব মাটি হবে—কিছুই গোপন থাকবে না।'

'বিপ্রপদ দ্রুত গিয়ে নৌকায় ওঠেন। উঠে একেবারে ছইয়ের ভিতর গিয়ে বসে থাকেন। বাইরের দিকে চেয়েও দেখেন না, পাছে পরিচিত কারুর সংগে দেখা হয়ে যায়।

নৌকা এগিয়ে যেতে থাকে। ঘোলা জলও পাক খেয়ে খেয়ে এগিয়ে চলতে থাকে নৌকার সংগে পাল্লা দিয়ে। খাল-পারের একটা বড় কদম্ব গাছের মাথা থেকে মিষ্টি শিষ শোনা যাচ্ছিল হরিয়ালের। ঘুঘুরা উড়ে চলেছে জোড়ায় জোড়ায়।

'মাঝি, তোমার কেরায়া কত ?'

'কেরায়া ত ঠিক হয় নাই বাবু, আপনে যা ছ্যান।'

'আমি যদি চার আনা দেই।'

'দেবেন। আপনার মর্জ্জি, আপনার ধম্মো।'

'তাই দেবো। তুমি তাড়াতাড়ি বৈঠা বাইতে পার না। পান্তা খাওনি ?'

'পান্তা খামু! এই দুই রোজ যা কামাই, তাতে পোলাপানে দুইডা ওক্কো প্যাট ভরইয়া খাইতে পারে না—আমি বাপ হইয়া খামু পান্তা। মাইয়াডা তো মরে মরে, এট্টু অসুধের পানিও দিতে পারি না মুখে। ওডা তো মরইয়াই যাইবে, যাউক, করুম কি। কপালে টাক্ খাইয়া মরলেও তো আর পয়সার কাম সারবে না বাবু। সারা দিন হয়রান হইয়া, না খাইয়া যা কামাই করুম, তা দিয়া চাউল কিনুম, না বদ্যি-বাড়ী যাইয়া অসুধ আনুম ? কন দেখি, সুবুদ্ধি দেন দেখি। এরপর যদি কারো কলাডা লাউডা চুরি করি, দেবে মাইর, পাঠাইবে থানায়—সক্কলডি কবে, হালার পো হালা চোর।' মাঝি থামে, নৌকাটা একটা খালের বাঁক ঘোরে।

চার

'মা-ঠাকরুণ, পাঁচশ' টাকা আজই দিতে হবে।'

'আজ তো কিছুতেই পারব না—কাল সকাল নাগাত পেতে পার।'

'তাতে তো কাজ হবে না—সব নষ্ট হয়ে যাবে। বলদ কিনেছি, দাম দিতে হবে। বলদ এনে আজ রাত্রেই রওনা হয়ে যেতে হবে বিলে। সব জোগাড়, এখন নৌকায় চড়লেই হয়! কিন্তু রাত ছাড়া তা তো হবে না।'

'অত টাকা দিয়ে কি করবে? বাবু নিজে দিয়ে গেলেই পারতেন। আমাকে তো কিছু বলে যাননি কাল।'

'ভয় পেও না মা! যেমন আয়, তার তেমনি ব্যয়। আশীর্বাদ কর, বছরটা ঘুরুক একটি বার। কিন্তু বাবু বলে যাননি, তবে তিনি আমাদের ভরসা দিয়ে গেলেন কি করে?'

'কাল বলেননি, তবে আগে এক দিন কথায় কথায় বলেছেন: যখন যা জমির খরচের বাবদ ওরা চাইতে আসবে তা ওদের হাতে নিঃসন্দেহে দিও।'

'এখন কি করব? আমরা মরে গেলেও কি চালাতে পারি এত টাকার কাজ?'

'তা তো পার না।' কমলকামিনী বিশেষ চিন্তিত হয়ে জবাব দেন, 'কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে আমিই বা কি উপায় করি?'

'জানেনই তো, হাজারটা মানুষ হলেও কুড়িটা কেন একটা বলদের কাজও ঠিক-ঠাক মত করতে পারে না। হাল যাবে, লাঙল যাবে, কৃষাণ যাবে দশ জন—বলদ না হলে চাষ করবে কে? ভুঁই থাকবে খিল্—বাবু তো চলে গেলেন!'

'তুমি একটু বসো, আমি ঘুরে আসি নিতাই।'

'তাড়াতাড়ি আসবেন—আমার সময় বড় অল্প।'

কমলকামিনী একটু ভেবে বলেন, 'আচ্ছা, তুমিই যাও। শ্যামাচরণের চালানী নৌকা আছে না ঘাটে ?'

'হ্যাঁ, আছে বুঝি।'

'তবে তাকে আমার কথা বলে ডেকে নিয়ে এসো একটি বার।'

নিতাই শ্যামাচরণকে ডাকতে যায় এবং একটু পরেই তাকে নিয়ে ফিরে আসে।

'বড়মা, আমাকে ডেকেছেন কেন ?'

'কাল দেবো, আমাকে আজ এক দিনের জন্য পাঁচশ' টাকা ধার দিতে পার ?'

'আমরা নৌকা খুলব এক সপ্তাহ বাদে—নিতে পারেন টাকা—কাল কেন পাঁচ দিন বাদে দিলেও চলবে। ঘরে বসে তো আমার টাকায় ব্যাজ আসবে না! এক্ষুণি দিয়ে যাব ?'

'হ্যাঁ, এখন পেলেই ভাল হয়। আমি আবার একটা কাজের জন্য নিতাইকে টাকা দিয়ে এক দিকে পাঠাব।'

একটু পরেই শ্যামাচরণ গামছায় বেঁধে পাঁচশ' কাঁচা টাকা নিয়ে এসে নিতাইর সামনে থাকে থাকে গুণে রাখে। সংগে সংগে নিতাইও গুণে এবং বাজিয়ে নিয়ে টাকাগুলো নিজের গামছায় বাঁধে।

'এখন তা হলে যাই মা, ওদিকে বড্ড ঝামেলা রয়েছে।'

'শ্যামাচরণ চলে গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'শোন নিতাই, তোমাদের বাবুর একটু বুদ্ধি কম, কিন্তু স্ত্রীলোককে বিপদে ফেলতে মহা ওস্তাদ। এই শ্যামাচরণ না দিলে এখন কোথায় পেতাম আমি পাঁচ পাঁচশ' টাকা ? কথায় বলে : যত জল নৌকার মাঝখানে এসে জমে—জমুক। দেখি কিসে কি হয়! হ্যাঁ একটা কথা

বলি তোমায়—বাবু নাকি নিজেও বিলে যাবেন। রাঁধুনীটিকে নিয়ে গেলে আমাকে এসে একটু জানিও। মনে থাকবে তো সদ্দারের পো? আর একটা কথা: সব করো ঐ খুনোখুনীটা বাদ দিয়ে। আর তোমাদের বাবুকে একটু সামলে রেখো। ওঁর তো দিশে নেই কোনও দিনই—একেবারে লাগাম-ছাড়া মানুষ। দেখতেই হৃষ্টপুষ্ট, বুদ্ধি আমার মতই। বুঝলে, ওঁকে একটু সামলে রেখো।'

'সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমরা বেঁচে থাকতে ওঁর গায় একটু আঁচড়ও লাগতে দেবো না।'

'মাঝে-মাঝে একটা লোক পাঠিয়ে খবর না দিলে তোমাদের মা কিন্তু ভেবে ভেবে মরেই যাবে—এ জ্ঞান কিন্তু তোমাদের বাবুর মোটেই নেই। তোমরা একটু হুঁস রেখো দু'ভাই।'

'আচ্ছা মা, বলতে হবে না। রোজই মানুষ যাতায়াত করবে দেশে। প্রায় পেত্যহ খবর পাবে তুমি।'

'আশীর্বাদ করি, তোমরা সকলে সুনাম নিয়ে দেশে ফিরে এসো।'

খানিক দূরে গিয়েই নিতাই আবার ফিরে আসে। চাপা গলায় বলে, 'তেতলায় যে অস্তর-পাতি আছে তা তো নামিয়ে দিতে হবে।'

'এখন নেবে?'

'না। রাত্রে এসে ইমাম নিয়ে যাবে।'

'তুমিই এসো। নইলে ওগুলো নামাবে কে? আমার তো দেখলেই ভয় করে। আচ্ছা, ওগুলো না নিলে হয় না?'

'হবে কি করে? মা, মাটিতে রুধির চায়, না হলে কবলা শুদ্ধ হয় না—এ আমরা অনেক দেখেছি।'

'দেখেছ ভালই করেছ; তোমরা খুনো খুনী করো না।'

'আচ্ছা মা, আমি সামলে চলব, কিন্তু ইমাম কি করে বলতে পারি নে।'

'তুমি প্রধান—তোমার মুখে কি এ কথা সাজে ?'

নিতাই আর কোন উত্তর না দিয়ে চলে যেতে থাকে।

কমলকামিনী ভাবেন: ওরা একটা কিছু অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বে না।

সারাটা দিন ষ্টীমার-ষ্টেসনে কাটিয়ে বিপ্রপদ সন্ধ্যার সময় তর্জমা করে দেখেন, যদি তিনি আজ সকলকে বিলে রওনা করিয়ে দিয়ে সদরে যান তা হলে এমন কোনও ক্ষতি হবে না। বাবুদের কাছে একটা কৈফিয়ৎ তাঁকে দিতেই হবে—দু'দিনের জন্য যা, তিন দিনের জন্যও তাই! অতএব তিনি আবার ইমামদের বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য নৌকা ভাড়ার চেষ্টা করেন। যে নৌকায় যাবেন, সেই নৌকায়ই আবার ঘুরে আসবেন এখানে। ওরা যাত্রা করে গেলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে সদরের কাজ সেরে শিবচর যেতে পারেন। এবং শিবচরে ক'দিন দেরী করে বিলে গেলেও তেমন ক্ষতি হবে না। দেরী একটু হবেই। মালার জন্য তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এবারও কি মালা তাঁকে সহজে ছেড়েছে! ওর কাছে সত্য-মিথ্যা কত কথাই না বলে আর্জি দিতে সদরে আসতে হয়েছে। মালা বিপ্রপদকে মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে চায় না। এ তার ভালবাসাও না, ভক্তিও না—অমূলক আশংকা এবং হয়ত লাঞ্ছিত জীবনের ভীরুতা। বিপ্রপদ মালার জন্য একটা সমবেদনা অনুভব করেন।

মাঝিটার অদৃষ্ট ভাল। বহু দিন পূর্বের সেই মাঝি, যার বাড়ী বেলেরচর—যে বিল চাষের বিষয় অনেক ভরসাও দিয়েছিল, যেতেও চেয়েছিল নিজে লাঙল নিয়ে। সে শক্তিগড়ে যাবে বাবুর সংগে দেখা করতে। ওদিকে যাওয়ার এক জন যাত্রী পেলে ভাল হয়—উপযুক্ত যাত্রীই তার ভাগ্যে মেলে। বিপ্রপদ নৌকায় উঠতেই মাঝি আহ্লাদে

চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে। নিজের ভাগ্যকে তারিফ করে শত সহস্র বার। খোদাকে ধন্যবাদ জানায় অজস্র। বিপ্রপদও তাকে দেখা মাত্র চিনতে পারেন। বলেন, 'ভাবছিলাম কি করে সংবাদ দেই, কত দূরে তোমার বাড়ী, কে যাবে তোমার খোঁজে—হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, ভালই হলো। তুমিও আমাকে ভরসা দিয়েছিলে, কথাও দিয়েছিলাম আমি। এখন চলো, আমার লোকজনের সংগে আলাপ করিয়ে দেবো। তারা যাবে আজ রাত্রেই রওনা হয়ে বিলের দিকে।'

'আমি ছয় বিঘা জমি বর্গা পাইলেই তুষ্ট। দুইশো মানুষ একলাই দিমু লাঠি মারইয়া ফিরাইয়া।'

'পাবে, নিশ্চয় পাবে—ছ'বিঘা জমি বর্গা বই তো নয়।'

'হয় বাবু হয়। আমি কি চামু কায়েমী? এমন বাপে আমারে জন্ম দেয় নাই। আমাগো মুখেও যা কাজেও তা। আমরা নেমকহারাম না।'

'চলো, তোমার জন্য একটা ব্যবস্থা হবেই। যখন কথা দিয়েছি তখন একটা কিছু করতেই হবে আমাকে।'

তার পর মাঝি বলে—গত বারও সে নাকি তাঁদের খোঁজে বিলে গিয়েছিল, দেখে এসেছে জমি। দুপুর বেলা রদ্দুরে চকচক করছিল বিলের কালো জল, ধাঁ-ধাঁ ধু-ধু করে কাঁপছিল দূর দিগন্তে—তখন সে নায়ে চড়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখেছে। কত পাখী কাতারে কাতারে চোখ বুঁজে ভাসছে। সূর্যের আলোতে তাদের রঙ চিকমিকিয়ে জ্বলছে। কখনও বা একটার ডাকে হাজারটা চমকে ওঠে, কলরব করতে করতে উড়ে চলে সুন্দর বনের দিকে। তাদের পাখার শব্দের রেশ যেন এখনও তার মনে লেগে আছে—এমনি তার বলার ভংগি। সে জমি দেখেছে, জলা দেখেছে, জংগলও। অনুমান সে করতে পারে না, ক'শ বিঘা জমি সেবারটা মাপলে হবে! গত বার যারা চাষ করেছে, তারা কি জানে চাষের

মর্যাদা? এখানে-ওখানে ক'গুছি ধান রুয়ে বাবুদের ফাঁকি দিয়েছে, এমন সোনার ফসল-ফলা জমি একেবারে মাটি করেছে। দেখে-শুনে তার বড্ড দুঃখ হয়েছিল, রাগও হয়েছিল কৃষাণগুলোর ওপর। মজুরী নিয়ে এমন বেইমানীও করে!

বিপ্রপদর একবার ইচ্ছা হয় যে, বলেন: ওরা ঘোষালদের ভাড়াটে কৃষাণ, কিন্তু অহেতুক অনেকগুলো প্রশ্নের ভয়ে চুপ করে থাকেন। ও যা বলছে, বলে যাক—শুনতে বেশ লাগছে বিলের কথা।

কিন্তু মাঝি অন্য কথা পাড়ে—ফাঁকি দেবে না? নিজের কাজ নিজে না দেখলে অমনি বিগড়ে যায় সব। বিপ্রপদকে সে ঠিক উপদেশ দিতে সাহস করে না, তবু বলে যে, তিনি যেন নিজের কাজ নিজেই একটু তত্ত্বাবধান করেন। এতে লজ্জাও নেই, খাটো হওয়ার ভয়ও নেই—তা লোকে যাই কেন বলুক না! ধান-চালকে তুচ্ছ করলে দুঃখ এক দিন আসবেই, সেদিন পথে পথে কাঁদলেও একটি দানা মিলবে না। এমনি একা একাই মাঝি কত কথা যে বলে, কত বিষয় নিয়ে যে আলোচনা করে!

বিপ্রপদ শুয়ে-শুয়ে শোনেন এবং নিবিষ্ট মনে ভেবে দেখেন: এ একেবারে মূর্খের কথা নয়। এর মধ্যে অনেক দরদ, অনেক অভিজ্ঞতা আছে। এমন কি, উপদেশও রয়েছে যথেষ্ট। শিখলে একটা গেঁয়ো মাঝির কাছেও শিক্ষার বিষয় থাকে কত! এ শিক্ষা একেবারে পাকা শিক্ষা—হাতে-কলমে ঠেকে শেখা।

অন্ধকারে বিপ্রপদ চুপ করে আছেন—নৌকা জোয়ারের টানে বাড়ীর দিকে ছুটে চলেছে। অভিজ্ঞ মাঝি এই অন্ধকারেও খাল চিনতে ভুল করে না। নদী থেকে বড় খালে ঢুকেই সে বাবুকে সংবাদ জানায়। বিপ্রপদ প্রথমটা ছই থেকে বেরিয়ে কিছু চিনতেই পারেন না। আজ আকাশটা বেশ পরিষ্কার। তাই নক্ষত্রের আলোতে ইমামদের ঘাটের শাখা খালটা সহজেই অনুমান করতে পারেন। ঐ তো বেনে-বাড়ীর

মঠ তার পর ধোপাদের তালতলা—তার পাশ দিয়েই খালটা সোজা চলে গেছে পূব দিকে নারকেল সুপারি গাছ চিরে। মাঝিকে কথা বলতে বারণ করে ইসারায় পথ দেখাতে থাকেন বিপ্রপদ। চতুর মাঝি অল্পতেই সব বুঝে চলতে পারে।

এ কি, এই না ইমামদের ঘাট? এখানে এত ডোঙা-ডিঙি এলো কোত্থেকে? ও—ওরা রওনা দিয়ে যাবে আজ, তারই এত তোড়জোড়। বিপ্রপদ অবাক হয়ে ভাবেন, এতগুলো নৌকা লাগবে—এগুলা বোঝাই করবে কি দিয়ে?

মাঝি এবং বিপ্রপদ ইমামদের বাড়ী প্রবেশ করতেই গত রাত্রির মত সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন হয়, 'কেডা?'

বিপ্রপদ প্রলোভন এড়াতে পারেন না, একটু রহস্য-জড়িত কণ্ঠে বলেন, 'দীনু ঠাকুর।'

'বাবুরও রংগো করতে সাধ লয়!' ইমাম বলে, 'দীনু ঠাকুর হইলে..' কথাটা সে বিপ্রপদর সম্মানেই নেহাৎ উহ্য রাখে। কিন্তু হাত দিয়ে যে শাণিত রাম-দাটা দেখিয়ে হাসে, তাতে বড় বেশী বাকীও থাকে না। বিপ্রপদ একটু শিউরে ওঠেন।

'আদাব বাবু! আবার যে ফিরইয়া আইলেন?'

'উদ্যোগটা দেখে গেছি, আর একটা দিনের জন্য যাত্রা-পর্বটা দেখে যাব না? নিতাই কোথায়?'

'তার মা নাকি মরে, তবু কি সে যাইতে চায় বাড়ী। আমরা অনেক কওনে-বলনে গ্যাছে। এখনি আবার আইল বলইয়া। এই লেউয়া কয়ড়া বান্ধা হইলেই লইয়া ওঠ্‌তে পারি নায়ে।'

'লেউয়া কি? কোনদিন তো নাম পর্য্যন্ত শুনিনি জিনিষটার।'

'ওরে লেমডা একটু জ্বালা, বাবুরে ছাখা, লেউয়া কয়ড়ো ক্যামনে বানাও।'

মারাত্মক অস্ত্রই বটে। একটা লম্বা বাঁশের মাথায় এক আঁটি বেতের আঁকড়ি শক্ত করে বাঁধা হচ্ছে। সাপের দাঁতের মত বাঁকা ধারাল কাঁটাগুলো কচ-কচ করছে। দেখলে মনে হয় যেন মেয়েলোকের লম্বা এক গোছা কাঁটাওয়ালা চুল। বেতের আঁকড়িতে কাপড়-চোপড় হাত-পা বাধলে সহজে ছাড়ান যায় না, বঁড়শির মত টেনে ধরে। তাই এরা নাম দেখেছে বান্ধবীলতা।

'এ দিয়ে কি করে? ভিড়ের ভিতর মারামারির সময় কেমন করে ব্যবহার করে?'

ইছমাইল মিঞা বুঝিয়ে বলে যে, এ অস্ত্রের আবিষ্কারক ওরা— জান খালাস তিন ভাই। তিন জনে মিলে বাঁশটা তুলে ধরে শত্রুকে জড়িয়ে ফেলে কাঁটার বাঁধনে—হড়-হড় করে টেনে আনে কাছে। তখন ওদের পার্শ্বরক্ষীরা শত্রুকে বাগে পেয়ে মারে ল্যাজার কোপ। ব্যস, এক কোপেই সাবাড়।

ভয়ে-বিস্ময়ে বিপ্রপদ আবার শিউরে ওঠেন।

এতক্ষণ তিনি দেখতে পাননি। আবার বাতির আলোতে দেখেন: প্রায় দু'শ লোক রাশিকৃত অস্ত্র-শস্ত্র ঢাল সড়কি ল্যাজা লাঠি এনে সাজিয়ে রেখেছে উঠানে। এরা সকলেই অচেনা। ইছমাইল মিঞা এদের সংগ্রহ করে এনেছে কি-যেন কি-এক কুটুম্বিতার খাতিরে। বেশ স্ফূর্তিতেই আছে এরা। কেউ রাম-দা কারুর গলার ওপর ধরছে, কেউ সড়কির ধার আঙুলের ডগা দিয়ে পরখ করছে, কেউ আবার হাস্যচ্ছলে কারুর মাথায় মারছে লাঠির বাড়ি। এদের বিশ্রামের আলাপটা মন্দ না!

ইতিমধ্যে ইমামের সংগে মাঝি বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে, ভাতও খেয়ে এসেছে। ইমাম ওর কথা ভোলেনি। ওর সম্বন্ধে কি-করা না-করা তার ভার বিপ্রপদ ইমামের ওপরই দিয়ে দেন। ইমাম খুশী হয় এমনি একজন জানা-শুনো লোককে সামান্য স্বার্থ দিয়ে হাতে রাখতে।

ঠেকলে সে লোক-জন সাক্ষী-সাবুদ কত কি দিয়েই না সাহায্য করতে পারে!

বাত কম হয়নি। এখনও নিতাইকে ফিরতে না দেখে সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সে এলে তখন গিয়ে মাল-পত্তর বোঝাই হবে নায়ে। চাল-চুলো বাঁশ-বাঁখারি বলদেব খোরাকী। কোন নায়ে কি যাবে সে না হলে হিসাব রাখবে কে? তিন-চারশ' লোকের যাযাবর জীবন-যাত্রার ভার সামলান সহজ কথা নয়!

এমন সময় আবদুল এলো তার সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে—রহিম এলো ছেলে-মেয়ে নিয়ে। এরা বিলে গিয়ে এবারই স্থায়ী হয়ে বসবাস করবে। তার পর অন্যান্য যাবা তারা পুত্র-পরিবার নেবে ধীরে ধীরে।

'এখন এক জন লোক পাঠিয়ে খবর নেওয়া দরকার, কি বলো মিঞার পো?'

'না, তার দরকার হইবে না—সে অজ্ঞেয়ান না।'

'আবদুল, তোমার বৌ হলো কেমন? মনের মত হয়েছে তো?'

'বড় ছোট্ট হইছে। এ্যাট্টা বেশী বয়সের রাড়ি হইলেই হইত ভাল। ভুল করলাম না কি কে জানে। শ্বাবকালে ওডা বাইর হইয়া যায় না-কি বাবু তাই ভাবি।'

'না না, ভুল কর নাই দাদু।' ইমাম বলে, 'নানার সাথে নাতনির সাধি হইছে। হিন্দু হইলে টুলু দিতাম।'

সকলে হো-হো করে হেসে ওঠে।

বিপ্রপদ বলেন, 'এখন আর ও-সব বলে লাভ কি! বেচারী মনে মনে দুঃখ পাবে।'

ইছমাইল মিঞা টিপ্পনী কাটে, 'হয়, তা ঠিক। ভাইডির বয়েস হইল ছয়-পঞ্চাশ।'

আবার সকলে হাসতে থাকে।

এমন সময় নিতাই আসে। 'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি করো—রাত অনেক হয়েছে।'

'সংবাদ কি নিতাই?'

'মা মারা গেছে—সংকার চড়িয়ে এসেছি। আপনি এলেন কোত্থেকে? খবর ভাল তো বাবু?'

'আমার খবর তো ভালই, কিন্তু তোমার—'

'আমারটাই বা মন্দ কি? মরা মার মুখাগ্নি করে গেলাম। আজ না মরে, কাল মরলে তো আমার হাতের আগুনটুকুও পেত না।' নিতাই বলে, 'আগের কথা মত তোমরা একে একে নৌকায় জিনিষ-পত্তর বোঝাই করো। যেখানের যা তা হাত দিলে যেন পাই। সব দেখে-শুনে গুছিয়ে তুলো কিন্তু। ওখানে গিয়ে হাতড়ান যাবে না জেনো।'

সকলে একযোগে কাজ করতে থাকে, নিতাই মাঝে মাঝে দেখিয়ে-শুনিয়ে দেয়। দু'ঘণ্টার মধ্যে সব গোছ-গাছ হয়ে যায়। এখন নৌকা খুললেই হয়। শুধু কৃষাণেরা হেঁটে যাবে বলদগুলো নিয়ে নদী-নালা সাঁতার কেটে পার হয়ে। প্রথম কৃষাণরাই রওনা দিল—তার পর ছাড়তে লাগল এক একখানা করে নৌকা। নৌকা হলো পঁচিশখানা।

নিতাই পরে যাবে বিপ্রপদর সেই মাঝির সংগে। বিপ্রপদ উঠে থাকবেন ষ্টেশনে। তার পর ওরা দেবে সোজা দক্ষিণে ভাটা।

ফের নিতাই বাড়ীর পথ ধরে। বিপ্রপদ বলেন, 'আমিও যাব তোমার সংগে।'

'কোথায় যাবেন বাবু? এখানেই বসুন, আমি এলাম বলে।'

'তোমার সংগে যাব—শ্মশানে।'

বিপ্রপদর কণ্ঠস্বরে একটা দৃঢ়তা দেখে নিতাই তাঁকে আর নিষেধ করে না। মাঝি ইমামদের বাড়ী বসে থাকে।

অন্ধকারে দু'জন এগিয়ে চলেন।

দূরে হু-হু করে একটা চিতা জলছে। মাঝে মাঝে হরিধ্বনি শোনা যাচ্ছে এখান থেকেই। ওরা আগুন লক্ষ্য করে হেঁটে চলে।

'নিতাই, তুমি মাতৃশ্রাদ্ধ না সেরে কি করে বিলে যাবে?'

'আমায় বিলে যেতেই হবে বাবু। এখানে বসে মরা মা'র শ্রাদ্ধ না হয় করলাম, কিন্তু বিলে বসে যে জ্যান্ত শত্রুর শ্রাদ্ধ করতে হবে। উভয়টারই তো অধিকারী আমি।'

বিপ্রপদ নীরবে পিছু-পিছু চলতে থাকেন।

একটা মরা আম-গাছের গুঁড়ি পড়ে রয়েছে শ্মশানের এক পাশে। যতক্ষণ দাহ শেষ না হয় ততক্ষণ তিনি ওর ওপর বসে অপেক্ষা করেন।

ভাবেন, এই যে অশিক্ষিত নিতাই, এ কি?

পাঁচ

অমরেশ চিঠি লিখেছে:

কমলকামিনীর পড়ে পড়ে ফুরায় না। একখানা চিঠি তিনি যে কত বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়েন। অমরেশ গান্ধীজীকে দেখেছে, রবি ঠাকুরকে দেখেছে, আর দেখেছে হাওড়ার পোল—ইডেন গার্ডেন, মনুমেণ্ট, কী সুন্দর হগ সাহেবের বাজার। একেবারে ঝলমল করছে সারাক্ষণ। আরও অনেক কিছু দেখছে সে। পড়া-শুনা করছে, ভালই আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মাকে দেখতে ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে ভাই-বোন, বাবা ও বিনুকে দেখতে। সে ছুটি পেলেই আসবে বাড়ীতে আম-দুধ খেতে। মা তার যেন প্রণাম নেয়, আর বাড়ীর সব গুরু-জনেরা। পুনঃ দিয়ে সে লিখেছে: এক দিন না কি সে গান্ধীজীর মোটরের সামনেই পড়ে গিয়েছিল। শেষের লাইন ক'টি পড়ে কমলকামিনীর বুকটা কেঁপে ওঠে। এ লাইনটি ছিল চিঠির ভাঁজে মাঝের পাতায়। এতক্ষণ কমলকামিনীর এ লাইনটি লক্ষ্যেই পড়েনি।

চিঠি পড়ে তিনি সব কথা বুঝতেই পারেন না। গান্ধীজীর কথা তিনি শুনেছেন। কিন্তু রবি ঠাকুরটি কে? হাওড়ার পোলের কথা তিনি ভাইদের মুখে শুনেছেন, আরও একটা কিসের কথা তারা যেন বলেছে। বাকীগুলি তো তিনি চেনেনই না। অমরেশ সব চিনেছে, সব দেখেছে। ছেলে তাঁর মানুষ হচ্ছে! গর্বে এবং আহ্লাদে তাঁর মন ফেটে পড়তে চায়। তাই তিনি সকলকে ডেকে ডেকে চিঠি পড়িয়ে শোনান। অনেকেই কিছু বোঝে না—তাতে তাঁর আরও গৌরব বোধ হয়। এতটুকু ছেলে এমন সব দেখেছে জেনেছে যে, পাড়াগাঁয়ের বুড়োরাও তা দেখেনি বা জানে না। ভাগ্যে তিনি ছেলেকে পাঠিয়েছেন কলকাতা! একবার আসুন বিপ্রপদ বাড়ী। দেখুন, তিনি মেয়েমানুষ হয়ে কি করেছেন ছেলেকে! পড়ে-শুনে সে দিন-দিন মানুষ হচ্ছে।

'হ্যাঁ রে মণি, তোরা আজকালকার মেয়ে—বলতে পারিস রবি ঠাকুরটি কে? চিঠিখানা তো তুইও পড়েছিস।

'তিনি এক জন কবি—বাঙলা দেশের গৌরব।'

কমলকামিনী ভাবেন, তাঁর ছেলে অমরেশও তো শক্তিগড়ের গৌরব।

'দিদি তুমিও চেন তাঁকে। নাম শুনেছ, ফটো দেখেছ তাঁর। অমন সুপুরুষ হয় না। দেখবে আবার? আমি এনে দেখাচ্ছি ফটো।'

মণি একখানা ছবির বই নিয়ে আসে। তার মধ্যে একখানা রবীন্দ্রনাথের ছোট ফটো সযত্নে রক্ষিত।

'ও, এই না কি? তাই বল, চিনব না কেন আমি! কিন্তু কবে দেখেছি এ ফটো তা কি এখন আর মনে আছে?'

'তা ঠিক দিদি—ফটোখানা তো আজ আনিনি আমি।'

'কিন্তু মণি, এমন একখানা চিঠি, এমন সব খবর, অনেকেই বুঝল না।'

'বুঝবে কি দিদি, এ মূর্খের দেশ—এখানে যারা পড়ে, তাদের কপালই নেহাৎ মন্দ!'

'তা আমি স্বীকার করি নে বোন। এখানে একটু লেখা-পড়ার চর্চা থাকলেই সব মানিয়ে যেত। একটা ইস্কুল আর একটা পোষ্ট আপিস— ব্যস।'

'তা হলেই রাতারাতি সব শিক্ষিত হয়ে যেত—এ তোমার নিছক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু না দিদি।'

'রাতারাতি না হক ধীরে ধীরে হতো। তা থাকলে অমরেশকে কি আমি অত দূরে পাঠাতাম? যে দুরন্ত ছেলে, গান্ধীজীর মোটরের সামনেই নাকি গিয়ে পড়েছিল? সর্বদা মনে মনে ভয় ভয় করে, কখন বাছার কি হয়।' আজ কমলকামিনী কেন জানি জেনেশুনেও স্নেহের আতিশয্যে অমরেশকে দূরে পাঠাবার আসল কারণটা অস্বীকার করেন।

'কিছু ভয় নেই দিদি, অমরেশ পাকা ছেলে হবে। তার কাছে শহর ও গ্রাম দুটোরই গুণাগুণ ধরা পড়বে। তোমার ছেলে—'

হঠাৎ কমলকামিনী বাধা দেন মণিকে। 'ওঠ, ওঠ, মণি— এখান থেকে যা। ঐ দেখ, তোর ভাসুর আর দীনু ঠাকুর ঝগড়া করতে করতে এদিকে আসছে। আবার কি হলো, কে জানে! একটু সুস্থ হয়েছি কি আবার একটা নতুন ঝামেলা এসে হাজির।'

'দেখো বৌঠান, আমাদের আর দীনুদা ছাড়বে না কিছুতেই।' বলতে বলতে শিবপদ উপস্থিত হয়, পিছনে পিছনে আসে দীনু।

একটু ঘোমটা টেনে কমলকামিনী জিজ্ঞাসা করেন, 'কি হয়েছে?'

'উনি আমাদের সীমানা দখলের চেষ্টায় আছেন।'

'না বড়বৌ, আমি তোমাদের সীমানা দখল করব কেন?'

শিবপদ উত্তেজিত হয়ে জবাব দেয়, 'আপনি বামুনের ছেলে হয়ে এই কথাটা বললেন? বৌঠানের কাছে এসে একেবারে দুধের ছেলে সাজলেন! যেন কিছুই জানেন না। দাদা আপনাকে চেনেন না,

বৌঠানও তাই, কিন্তু আমি আপনাকে হাড়ে-হাড়ে চিনি। আপনি সেবার দৈ নিয়ে ঘোষালদের সংগে আমাদের কি শত্রুতাটাই না বাধিয়ে দিলেন। এখন আবার এসেছেন বলতে যে, আমি তোমাদের সীমানা দখল করব কেন?'

'বড়বৌ, তুমি ত দৈর ব্যাপারটা জানো সব। দুঃখ আমার, যাদের জন্য করলাম চুরি, তারাই বুঝল না—তোমরাই বলছ চোর। তুমিই ভেবে দেখ, ঘোষালদের দৈ ক'মণ ফাঁকি দিয়ে না রাখলে কি অত-বড় নেমন্তন্নের সত্যটায় যাচাই করে দৈ খাওয়ান যেত? শিবে জানবে কি, তুমি ত সব জান।'

শিবপদ বলে, 'আমি ও-সব মিষ্টি কথায় ভুলছি নে। আর একটা গাছও পুঁতলে আমি আপনার নামে ১০৭ ধারা করে দেবো। আপনি আমাকে চেনেন না, আমার নাম শিবপদ।'

'বসুন দীনুদা এই মোড়াটায়। ঠাকুরপো সুস্থ হও, মিছামিছি ঝগড়া করো না। তোমার দাদা কিন্তু বাড়ী নেই।'

'মিছামিছি কি? এক জন গায় পড়ে ঝগড়া বাধালে ছেড়ে দেব নাকি? বিশেষতঃ বসত-বাড়ীর সীমানা নিয়ে। এক আঙুল জায়গার নাম লাখ টাকা দাম। তুমি তো জান না, হয়ত বললেও বিশ্বাস করবে না—উনি আমাদের সীমানা ঘেঁসে জিল গাছ লাগাচ্ছেন, আবার আমাদের দিকে হেলিয়ে। একটা বছর যেতে না যেতেই জটা এবং শিকড় মেলে আমাদের সীমানা লোপ করে আমাদের জমিতে এগিয়ে আসবে। তখন উনি বলবেন যে, গাছ যত দূর, আমি ভাগেও পাব তত দূর। শালিসেরাও বলবে তাই। মাঝখান থেকে বিচারে যাব ঠকে, জায়গা তো গেল ফাউ। ঐ জিল গাছ না লাগিয়ে অন্য গাছ করলে কোন্ শালা আপত্তি করত বলো? ওগুলো বড় নচ্ছার গাছ। একটা বর্ষা যেতে না যেতেই ঝাড়-জংগল মেলে আমাদের সীমান[illegible]ঠবে

এসে। বৌঠান, দীনুদাকে তোমাদের নিষেধ করো, নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি কিন্তু।'

দীনু বুদ্ধিমান এবং ঘাগী লোক। সে কথাটাকে ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করে। বলে, তুচ্ছ জিল গাছ, যা রান্নার কাজে ছাড়া অন্য কোনও কাজে লাগে না, তা নিয়ে কি আমাদের মধ্যে ঝগড়া সাজে? তুমি বলছ, আচ্ছা, আমি আর না-ই বা লাগালাম গাছ। কিন্তু ভেবে-ছিলাম, আমার সীমানায় শ'খানেক চারা পুঁতে রাখি, বড় হলে তোমরাও নিতে, আমরাও নিতাম। দিন-দিন দুনিয়ার যে হাল হচ্ছে, তুচ্ছ জ্বালানি কাঠের জন্যও আমাদের ছেলে-পিলের কষ্ট হতে পারে। ছেলে-পিলের কথা বলছি, আমাদেরই সে ভোগ ভুগে যেতে হয় না কি, কে জানে! তোমাদের মত বড় একটা সংসারে বছরে কত মণ কাঠ লাগে, তুমি তো বোঝ না, তোমার এই বৌঠানটি বোঝেন। কত ধানে কত চাল, যে জানে সে জানে—তুমি আমি তার বুঝি কি? দিব্যি দাদার ওপর বসে বসে খাচ্ছ, শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছ। বাইরের ঝক্কি দাদার, ঘরের ঝক্কি দিদির। তোমার কি ভাই গায় লাগে কোনও বাতাস? তুমি মাঝখানে একেবারে নিরাপদ।'

দীনুর কথার ঝালে শিবপদ একেবারে অগ্নিগর্ভ হয় ওঠে, কিন্তু অতিরিক্ত কিছু প্রকাশ করতে সাহস পায় না। কারণ, যা বলবার তা তো কমলকামিনী বলবেন।

দীনু পরিস্থিতিটা ভাল করেই হৃদয়ংগম করতে পারে। সে ফের বলতে থাকে, 'শোনো শিবপদ, যদি সব বুঝতে, তাহলে আজ আর আমাকে নিষেধ করতে না—কারণ আমার পরিশ্রমের ফল ভবিষ্যতে তোমরাই ভোগ করতে। আমার পেটে ভাই জিলেপীর প্যাঁচ নেই। থাকলে, আমি কি যেতাম অত খেটে-খুটে জিলের চারা জোগাড় করতে! সারা দিনের পরিশ্রমে আমার দুঃখ ছিল না—যদি

তোমরা ভাই নিজের হিত নিজে বুঝতে! থাক গে, আমার একটা দিন মাটি করলে বই তো না!'

'আহা হা, আপনার একটা দিন মাটি করে ঠাকুরপো কেন নেবে বামুনের অভিশাপ? ও মেজো, একটু এদিকে আয়।'

'কি দিদি?'

'দু' সের চাল মেপে দে দীনুদাকে।'

'আমি এলাম ঝগড়া করতে, তুমি দিচ্ছ চাল! এ ঝগড়ার দক্ষিণা না কি বড়বৌ? ব্যবস্থাটা তো সময়োচিত করেছ! আমার ঘরে যে কাল থেকে হুঁ-হুঁ, তা তুমি জানলে কি করে?' তার পর শিবপদর দিকে লক্ষ্য করে বলে, দশানন যেমন বৈরী ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের সংগে কাটিয়ে গেছে এক পুরুষ, আমিও তেমনি শত্রু ভাবে তোমাদের সংগে কাটিয়ে যেতে যাই এ-জীবনটা। মূলে কিন্তু আমরা এক। তা তোমার বুঝতে ঢের দেরী!' বলে সে হাসতে হাসতে চাল নিয়ে রওনা দেয়।

'বৌঠান, তোমার অবশ্যি দোষ ধরা আমার সাজে না, এ তোমার কাণ্ডখানা কি বলো তো? যে আমাদের দিন রাত ক্ষতির চিন্তায় ব্যস্ত, তাকে সাহায্য করলে রসদ জুগিয়ে?'

'ঠাকুরপো, আমাদের মাথার ওপর একটা শমন—সেটার কূল-কিনারা হতে না হতে আমাদের কি উচিত আর একটা ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়া? একটা-একটা করে শেষ করা ভাল।'

'তুমি যা-ই কেন বলো না, বাগে পেলে ও বামুনের ছেলে হক আর যেই হক না কেন, আমি ছাড়ছি নে।'

'ঠাকুরপো, তুমি চিরদিনই একটু বদরাগী—নিজেদের ভাল-মন্দও বুঝতে চাও না। এখন নিতাই, ইমাম, তোমার দাদা কেউ বাড়ী নেই, এ সময় একটা হট্টগোল বাধান, বিশেষতঃ ঐ বুড়ো শয়তানের সংগে,

মোটেই আমি ভাল মনে করি নে। এখন তো তুমি আর ছেলেমানুষ না. বুঝে-সুজে যা হয় করো।'

পরের দিন সকাল বেলা।

শিবপদ ছুটে এসে বলে, 'যা ভেবেছি তাই। দেখে যাও বৌঠান, দেখে যাও। ওর কি চার চোখে লজ্জা আছে? সেই চারা গাছগুলো সাবি দিয়ে আমাদেব দিকে হেলিয়ে রুয়েছে। তুমি একটি বার দেখে যাও নিজে এসে। ভাবছ শিবপদ বদরাগী, কিন্তু এ সব দেখলে, কি মরা-মানুষেব শরীরেও রাগ না হয়ে পারে?'

'যা করার তা করেছে, তুমি কোনও বাদানুবাদ করতে যেও না লক্ষ্মী ভাই। তোমার দাদা আগে বাড়ী আসুন—দু'-এক মাসেই গাছ আর বড় হবে না, তিনি বুঝে যা হক ব্যবস্থা করবেন। মাথার ওপর যখন এক জন বয়েছে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।'

'তোমাব বুদ্ধি তো খুব! শিকড় জন্মালে ওগুলো কি আর তোলা যাবে? এমনিতেই আমবা পারি বড় ওর সংগে।'

কমলকামিনী একটু ঝাঁঝ-মিশ্রিত স্বরে জবাব দেন, 'না পেরে পেরেই আমরা এত বড় হলাম, এত দিন কাটিয়েও দিলাম। তুমি যদি এখন পারো, যা মনে হয়, তাই করো—আমার কাজ আছে, আমি যাই।'

'যাও যাও—স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে আমি চলি নে জেনো।'

'বেশ, নিজের বুদ্ধিতেই চলো, তোমাকে বারণ করে কে?' বলে কমলকামিনী আঁচলে একটা ঝাড়া দিয়ে চলে যান।

শিবপদ আর দেরী না করে থানার দিকে তখনই রওনা হয়।

কমলকামিনীর এমন ভাগ্য, দু'দণ্ড সুস্থ থাকতে পারবেন না। মেজ দেবরটি বদরাগী এবং মূর্খ। গুরু-লঘু জ্ঞান থাকে না একটু রাগ হলেই। যা ইচ্ছা তা মুখের ওপর বলে দিতে পারে। সর্বদা তাকে এড়িয়ে চলতে হয়। ছোটটি এত দিন ছোটই ছিল—ইদানীং বাবু হয়েছে। টেরি

কেটে গান গেয়ে বেড়ায়। তবু সেটি এখনও রায়ের মধ্যে আছে। কিন্তু তাঁর স্বামীটি—যাঁকে মেরুদণ্ড করে ঝড় ঝঞ্ঝাট সয়ে চলছেন, মূর্খ না হলেও বেয়াড়া তো বটেই। তেমন সেয়ানাও না। একটু সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলে তার দুঃখে অমনি হাঁস-ফাঁস করতে থাকেন। এত দুঃখেও কমলকামিনীর হাসি পায়। তিনি যদি অমনি একটি সুন্দর যুবককে দেখে অস্থির হয়ে পড়েন, তাহলে কেমন হয়? দূর দূর। তিনি নিষ্ঠাবতী হিন্দু নারী। তাঁর কি রহস্যের ছলেও এ কথা ভাবা উচিত? মনে মনে তিনি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁর তো সংসারে সুখ নেই। সুখ কোনও দিন হবেও না। কারণ এরা তিনটির একটিও মানুষ না।

ঐ যে দূরে ঊষার আলোতে কি দেখা যায়?

সুখ, সুখই হবে হয় তো ·

এদিকেই যেন আসছে। বার বছরের একটি ছেলে তাকে আনছে পথ দেখিয়ে। হয় তো তিনি সুখের মুখ দেখতে পাবেন। দেওরদের দিয়ে না, স্বামীকে দিয়েও না—তার অমরেশকে দিয়ে।

পিছনে ওর কে? বিনু না?

কিন্তু কত দিনে ওরা এসে পৌছবে? তত দিন কি তিনি বাঁচবেন?

সময়মত ঘটনাস্থলে একটি এ, এস, আই এসে উদয় হয়। সে ছাপরা জেলার লোক, কিন্তু 'বঙলা' জানে। সংগে তার চৌকিদার, দফাদার এবং এক জন খৈনিভোজী কনেষ্টবল। তারা বড় আশা করে এসেছে বিপ্রপদ বাবুর বাড়ীর কথা শুনে। তিনি এক জন বর্দ্ধিষ্ণু লোক—পয়সাওয়ালা তালুকদার। তার সপক্ষে তদন্ত করে একটা রিপোর্ট দিতে পারলে, এক দিনে হয় তো সারা বছরের খৈনির খরচটা পাওয়া যাবে। এ, এস, আই ও কনেষ্টবল দু'জনেই খৈনি খায়, চৌকিদার দফাদারে তার ভাগ পাবে না, কারণ তারা বাঙালী—মাথা ঘুরে যাওয়ার আশংকা

আছে। অতএব প্রথম দল যখন ভাগ করে নেবে, দ্বিতীয় দল তখন শুধু চেয়ে থাকবে। ওটা তাদের অস্পৃশ্য।

ঘটনাস্থলটি দেখে যে উৎসাহে তারা এসেছিল, সে উৎসাহ দমে যায়। এ, এস, আইটি বলে, 'পণ্ডিতজী বড চালাহাঁক লোক। এ তো পুলিস-কেস নেই। এখন কি হোবে শিবপদ বাবু? উঁকে তো ধোয়তে পারি না। ও ওর সীমানামে রোপণ করেছে, কোনও হ্যাংগামা করেনি, ওকে তো ধোবতে পারি না হামি। পণ্ডিতজী বড চালহাঁক লোক।'

দীর্ঘ ফোঁটা তিলক কেটে দীনু তার সীমানায় দাড়িয়ে হাত জোড করে কাঁদ-কাঁদ স্বরে সবিনয়ে বলে, 'দেখুন পুলিশ সাহেব, কি অবিচার। আমি আমার বাড়ীতে পারব না দু'টো গাছ পযন্ত লাগাতে? এ দেশে থাকব কি করে হুজুর? আপনি একটু বিচার করুন, আপনি যেই হন না কেন, আজ আমার কাছে জেলার জজ, পুলিশ সাহেব, এই ইংরেজ রাজত্বের মালিক।'

পশ্চিমা এ, এস, আই, বিশেষতঃ 'বাংলা' জানে, তাকে জেলার জজ, পুলিস সাহেব প্রভৃতি আখ্যা দেওয়ায় সে জল হয়ে যায়। আর দীনু ঠাকুরের বক্তৃতা কি যে-সে বক্তৃতা।

শিবপদ একেবারে বোকা বনে যায়। সে চুপ করে থাকে। ভগ্নোৎসাহ পুলিসের দল ফিরে চলে যায়। দীনু হাসতে হাসতে শিবপদর কাছে এসে তার পিঠ চাপডে বলে, 'ভায়ার রক্ত বেজায় গরম। বুড়ো বামুনটাকে একেবারে জেলে দেবার ফন্দি করেছিল। এখন আর মনে মনে দুঃখ করো না। এ পরিশ্রমের ফল তোমরাই ভোগ করবে, আমরা তো সব মরে যাব।'

সে একটা হাত দিয়ে শিবপদর কাঁধ ধরে।

শিবপদ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে বাড়ীর দিকে

ফেরে। পথে কমলকামিনীর সংগে দেখা—তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতে পারে না সে।

কমলকামিনী ভাবেন : শিবপদ অপদস্থ হয়েছে, এটা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার—কিন্তু দীনু ঠাকুরের প্রতিহিংসা আবার যে কোন্ দিক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, তা তো অবহেলার নয়।

ছয়

কথা হচ্ছে সদরে বড়বাবুর খাস কামরায় বসে।

তখন সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। এক জন চাকর এসে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। বড়বাবু ও বিপ্রপদ দু'জনের মুখেই একটা অপ্রীতিকর ভাব ফুটে উঠেছে। এইমাত্র কিছু অপ্রিয় আলোচনাও হয়ে গেছে।

বড়বাবু একটা দামী চুরুট টানছেন। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ছায়া পড়ছে গিয়ে দেয়ালের গায়। ঘরখানা খুব সাজান না হলেও দশাচল গোছ-গাছ করা।

'বিপ্রপদ বাবু, পরের চাকরী করলে এটুকু জ্ঞান ও দায়িত্ব বোধ থাকা চাই যে, তাঁদের না বলে-কয়ে অন্যত্র যাওয়া উচিত নয়। হিসেব-নিকেসের সময় আপনি উপস্থিত না থাকলে কি একজন মুহুরী পারে কাগজ বুঝিয়ে দিতে? তাহলে তাদের মাইনেই বা কেন এত কম, আপনারই বা কেন এত বেশী?'

কথাগুলি নিতান্ত কটু। তবু পরের চাকরী করলে না শুনে উপায় কি। বিপ্রপদ নীরবে বসে থাকেন।

'আপনি কেন বাড়ী গিয়েছিলেন, তা আমি সব শুনেছি। বাল্যবন্ধু রমণীই আমাকে সব বলেছে। আপনি কোথায় কেন কি জন্য গিয়েছিলেন, সে অনুমানে ঠিকই ধরেছে—এখন আপনিও আমার জেরার মুখে নিজেই

স্বীকার করলেন। যাক্, যা করেছেন, ভাল বুঝেই করেছেন। মানুষের মরণ কালে বুদ্ধি হয় বিপরীতগামী। আপনি আমার বাল্যবন্ধু রমণীদের সর্বনাশ করছেন আমারই টাকার জোরে, এখন আমার আর সর্বনাশ করবেন না, এইটুকুই আমার শেষ অনুরোধ। আর একটা কথা আপনাকে বলতে আমারও লজ্জা করে,'…বড়বাবু থেমে চুরুটটা ধীরে ধীরে টানতে থাকেন। 'হ্যা, যা বলছিলাম,'…এমন সময় রমণী ঘোষাল এসে উপস্থিত হয়। 'এসো, এসো রমণী, তুমি জ্যোতিষ জান নিশ্চয়। বসো ঐ চেয়ারটায়, বসো ভাই, বসো। মানুষ আজকাল একেবারে অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছে, কি বলো ?'

'আমি বলব কি!' মেজ ঘোষাল চেয়ারে বসতে বসতে জবাব দেয়, 'তোমরা ভাই বড়লোক, লোককে দিয়ে-থুয়ে এসেছ চিরদিন—তোমাদের কাছে তো নজিরের অভাব নেই।'

'সে কথা একশ' বার।'

'নমস্কার বিপ্রপদ বাবু, কেমন আছেন ?'

'ভালই আছি।'

'তার পর শীগ্গিরই বিলে যাওয়ার জন্য বুঝি তোড়জোড় করছেন ? দেখুন, পরের মুখের অন্ন জোর করে কেড়ে নিলে বিধাতা তার মুখের অন্নও কেড়ে নেন। আমরা আজকাল একটু বেকায়দায় পড়েছি ব'লে কি আমাদের প্রতিবেশী তালুকদার হয়ে আপনার উচিত আমাদের আঁতে ঘা দেওয়া ?'

বড়বাবু বলেন, 'মানুষ নির্মম হলে সব পারে রমণী।'

চিরদিনই বড়বাবু পুরোন কর্মচারীদের ওপর চটা। তারা সরে পড়লে কম মাহিনায় নতুন লোক পাওয়া যায়। তারা দক্ষ না হলেও মোসাহেবীতে ওস্তাদ। এক শ্রেণীর বড়লোক চায়ও তাই, বড়বাবু সেই শ্রেণীরই লোক। এ ছাড়া তাঁর একটা প্রধান দোষ, কান-কথা

শুনে বিনা বিচারে ডিগ্রী দিয়ে বসেন। যার বিরুদ্ধে রায় দেন, তাকে আপীল করারও অবসর দেন না। তার পূর্বের সব গুণাগুণ সহজে ভুলে যান। বিপ্রপদর বিরুদ্ধে রমণী ঘোষাল যা তাঁর কানে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তা তিনি অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছেন। এখন তা খণ্ডন করতে যাওয়া পাগলামী।

বিপ্রপদর মনে বড় দুঃখ হয়—

দুঃখ হয় চাকরী গেল বলে নয়—বড়বাবুর হৃদয়হীন ব্যবহারে। তাঁর বাবা কখনও কর্মচারীদের সংগে এমন ব্যবহার করেননি। হয়ত সেই সত্যের জোরে আজো এ সংসার টিঁকে আছে। কিন্তু এমনি ধারা তাঁর মত দু'-একটা ভিত্তির পাথর যদি খসতে থাকে, তাহলে যত বড় ইমারতই হক না কেন, তা ধসে পড়তে কতক্ষণ। তার হৃদয় ফেটে যেতে চায় এঁদের ভবিষ্যৎ ভেবে। যে-ই বেসাতি করুক, এ হাট জমাতে তাঁর বুকের রক্তও কম ক্ষয় হয়নি। তিনি এ সংসারের অনেক নুণ খেয়েছেন—সে নুণের গুণও চিরদিন মনে-প্রাণে মেনেছেন। তিনি আর যা-ই হন, অকৃতজ্ঞ নন।

কিন্তু পরিণামে কি ব্যবহারটাই পেলেন। চাকরী তিনি বহু দিনই ছাড়বেন ভাবছেন, কিন্তু এমন করে যে খেটে-খুটে পারিশ্রমিক হিসাবে নির্মম অপমানের বোঝা কাঁধে নিয়ে শেষ কালে রওনা দিতে হবে, তা তিনি কোনও দিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। তাই তিনি নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে নীরবেই বসে থাকেন শেষ দৃশ্য দেখার জন্য।

'কি বিপ্রপদ বাবু, ভাবছেন কি? নিজের ভবিষ্যৎ? তা নিজের পায় নিজে কুড়োল মারলে রাখে কে বলুন?'

'আমি কিছুই ভাবছি নে, ভাবছি শেষ জবাবটা দেবেন কতক্ষণে?'

রমণী ঘোষাল প্রসাদলোভী নির্লজ্জের মত বলে, 'শেষ তো বন্ধু কালই করেছ, আজ আর সবিশেষ বাকী কি?'

বড়বাবু উত্তর দেন, 'একটু বাকী আছে।·· আপনি না কি একটা বেশ্যাকে নিয়ে একবার কয়েক মাস ঢলা ঢলি করেছেন আমাদের কাছারি-বাড়ীতে। সেটা পালিয়ে যাওয়ায় আর একটাকে আমদানী করেছেন হালে? এ সব সত্যি না কি?'

ধরণী দ্বিধা হও। এত-বড় অপমান বিপ্রপদকে জীবনে কেউ কোনও দিন করেনি। তিনি এমন মিথ্যা অভিযোগের জবাব দেবেন কি। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকেন। অবশেষে এইটুকুই বলতে পারেন, 'আমি যাই, বার ঘণ্টার মধ্যে আমি কাছারি-বাড়ী খালাস করে দেবো।'

'একটু থামুন, হিসেব-নিকেস দিয়ে যাবেন না?'

'আমাকেই যখন হিসেবে আনলেন না, তখন আমিই বা হিসেব দেবো কি?' বলে তিনি কতগুলি হিসাবের খাতা ছিঁড়ে টেবিলের ওপর রেখে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে যান।

দু'টি বন্ধুতে হাঁ হাঁ করে ওঠেন, কিন্তু বাঘের থাবার কাছে এগুতে কারুর ভরসা হয় না।

'তুমি রমণী দাঁড়িয়ে সব দেখলে, একটু বাধা দিলে না। তুমি কেমন মানুষ?'

'আমার ওপর রাগ করছ ভাই মিছেমিছি—তুমিও তো হুকুম দিলে না কিছুই। দিলে কি পারত এমন সব জরুরী কাগজগুলো ছিঁড়তে? আমি কি ভয় করি না কি বিপ্রপদকে সকে?'

'যা ই বলো না কেন, তুমি পারবে না শিবচর কাছারীর ম্যানেজারী করতে। নতুন লোক দেখতে হলো আমাকে। হুকুমের আশায় বসে থাকলে কি আর জমিদারী রক্ষা হয়?'

'অ্যাঁ, বলো কি?'

'বলি ভাল। আমার মুখ চিরদিনই এমনি পরিষ্কার—তাই আমাকে

দেখতে পাবে না কেউ। তুমি বন্ধু, বন্ধুর মতই থাকা ভাল—বুঝলে রমণী? আমি উপদেশ দেই, ওকালতিই তুমি আবার আরম্ভ করো। কোনও ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট নেই।'

ষ্টীমার চলেছে। এঁকে-বেঁকে জলে সাঁতার কেটে চলেছে। কখনও দ্রুত কখনও মন্থর তার গতি। গঞ্জে এসে ভিড়ছে কখনও, কখনও রিক্ত মাঠের ধারে, কখনও বা বালির চরের পাশে কাশ-বনের সন্নিকটে। উজান-ভাটার বিচার নেই—অফুরন্ত গতিবেগ নিয়ে দিবারাত্রি ডানা পিটিয়ে ছুটে চলেছে এই জলযান। এমনি ভাবেই বিপ্রপদকে চলতে হচ্ছে ডানা পিটিয়ে। উজান-ভাটা, রিক্ততা কিম্বা অজস্রতা কখন কি ভাগ্যে জুটবে সেদিকে ফিরে চাইলে চলবে না। গতির আবেগে তিনি এগিয়ে যাবেনই। আজ যে তাঁর জীবনে সাময়িক একটা রিক্ততা এলো, আসুক না, তাতে হয়েছে কি। আবার তিনি গঞ্জের সন্ধান পাবেন। সহস্র দীপমালা-শোভিত বিপণি তাঁকে লক্ষ্য করে খুলে রাখবে পসরা, জেগে থাকবে ভ্রাম্যমান যাত্রীর দল। তাঁকে বরণ করবে সানন্দে। দুঃখে তিনি থামবেন না, সুখের আশায় এগিয়ে যাবেন সুমুখের দিকে। এ দিন তাঁর ফিরবে, আবার ফিরে পাবেন নতুন জীবনের মধুচক্রের স্বাদ। গোলামীর রঙমশাল তাঁর নিভে গেল, যদি নিভেই থাকে, ভালই হল—ঐ স্বাধীনতার আলো জ্বলছে, একটু বাঁক ঘুরলেই দেখা যাবে সে আলো।...

আজ হক কাল হক চাকরী তিনি ছাড়তেন তবে কর্তৃপক্ষ যে ছাড়িয়ে দিলেন এইটাই শাপে বর হল। তা না হলে তাঁকে কৃতজ্ঞতার লজ্জায় ঠেকিয়ে রাখত অনেক দিন। সংসারে তার অভাব, সে অভাব তাঁর থাকবে না। লক্ষ্মী এক দিক দিয়ে তাঁকে দয়া করবেনই। কিন্তু একটা আঘাত তিনি এখনও সম্যক্ সামলাতে পারেননি। সেটা

হচ্ছে মর্মান্তিক অপমানের আঘাত। কত দিনে তা পারবেন বলা কঠিন। রমণী ঘোষালই এর জন্য দায়ী। এক পক্ষে বড়বাবু সোজা লোক—দু'-চার বোঝেন কম। যে যেমন বোঝায় তিনি তেমনি বোঝেন। রমণী ঘোষালের উচিত কি এমন জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা রং-পরেন দিয়ে তাঁর কানে তোলা। অনুচিতই বা কি? সে শত্রু—ছলে বলে-কৌশলে তাঁকে আঘাত হানছে। এখন বিপ্রপদর উচিত মুহ্যমান না হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ান।

আসমানতারা বেশ্যা, মালাও না কি তাই। কি হেয় জঘন্য উক্তি। এর প্রতিবাদ করতেও তাঁর ঘৃণাবোধ হয়। সমাজে এদের কোনও স্থান নেই, না আছে কোনও প্রতিষ্ঠা। তবু এদের পৃথক্ একটা মূল্য আছে এবং সম্মান আছে তা ওরা জানবে কি করে? যদি তা জানত এবং একটু বুঝত তবে এরা সমস্যা হয়ে দুনিয়াময় ঘুরে বেড়াত না। সমাজের শ্রেষ্ঠিরা এদের একটা মূল্য দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিত।

যাক, তিনি অধীর হবেন না। তিনি এ সব হেসে উড়িয়ে দেবেন। হাল্কা মন নিয়ে স্বাধীন বিহংগের মত উড়ে যাবেন যে দিকে দু'চোখ যায়। এখন তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

বিপ্রপদ মাত্র একটি দিনের কথা বলে মালার কাছ থেকে এসেছেন সদরে। কিন্তু আজ চার পাঁচ দিন গত হয়ে গেছে নানা ঝঞ্ঝাটে। তিনি যে ইচ্ছা করে দেরী করেননি, তা তিনিই শুধু জানেন। সে ভাবছে কি? সে যে মেয়ে একটা অঘটন কিছু ঘটিয়ে ফেলাও বিচিত্র নয়। কাছারীতে ক'জন দারোয়ান ছাড়া আর কেউ নেই—শূন্য বাসায় মালা একা। তাঁর মনে একটা ত্রাস হয়—আশংকাও হয় ভয়ানক। তিনি নিজের বর্তমান অবস্থার কথা ভুলেই যান—ভুলে যান অসম্মান ও অপমানের আঘাত। একমাত্র মালার চিন্তায় তাঁকে অভিভূত করে রাখে। মালার শুভ কুশলের চিন্তা। আজ বিপ্রপদ বুঝতে পারেন,

ও তাঁকে কতখানি আকর্ষণ করছে। রমণী ঘোষাল ও বড়বাবু মিলে যে কলংকের শেল নেপথ্যে হানল মালাকে, তা তাকে এতটুকুও স্পর্শ করেনি, কিন্তু বিপ্রপদর বুকে বিঁধল নিদারুণ হয়ে। কেন বাজল? বিপ্রপদ নিজেকে নিজে বার বার প্রশ্ন করেন কেন পরের জন্য তাঁর বুকে এ ব্যথা বাজে? তিনি বিশ্লেষণ করে দেখেন, যে মালা দু'দিন আগেও পর ছিল সে মালা কেমন করে যেন আপন হয়ে গেছে। সে একটা বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে আলো করে বসেছে স্বকীয় স্বাধীনতায়। তাকে আর স্থানচ্যুত করা যাবে না কিছুতেই। আশ্চর্য বটে! পথের ধূলায় কুড়িয়ে পাওয়া মালা আজ দাবী করে বসেছে অসামান্য মূল্য। বিপ্রপদ তা না দিয়ে যাবেন কোথায়?…

আকাশে গাঢ় মেঘ দেখা দেয় বিকালের দিকে।…

ষ্টীমার থেকে নেমে বিপ্রপদর বড চিন্তা হয়। গয়নার নৌকা খোলা মাত্র আবার ঝড় ছুটবে না কি—আগের বারের মত? এতক্ষণ দক্ষিণা বাতাস প্রবল ছিল, মেঘ এসেছে, জমতে পারেনি, কেটে উড়ে গেছে। এখন বাতাস বন্ধ। আকাশের কালো ছায়া পড়েছে দিগন্তবিস্তৃত নদীর জলে। সেদিকে চাইলে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। জল মাঝে মাঝে স্রোতের তোড়ে কল-কল করছে। ঘূর্ণিগুলো দুর্নিবার বেগে ঘুরে ঘুরে এগিয়ে চলেছে। সময় সময় যেন জল হাসছে। কিন্তু এ হাসি পলকে নিষ্ঠুর হতে পারে, পলকে একাকার করে দিতে পারে সৃষ্টি। ঢলকে ঢলকে আবার উঠতে পারে জল নায়ের কোল বেয়ে।

কে যেন কূলে বসে মাঝিদের দিকে চেয়ে বলল, 'একবার সে অনেক দিনের কথা—হ্যাঁ, অনেক দিনই হলো—তখন এ লাইনে গয়না চলত না। ষ্টীমার থেকে নেমে আমরা ভাবছি কি করে যাই শিবচর। একখানা বড় নৌকা ভাড়া পাওয়া যায় কি না? এমন সময় ঝড় এলো, সে কি ঝড়! স্পষ্ট আমার মনে আছে, আমাকে নিয়ে উড়িয়ে ফেলল

ঐ মাঠের ভিতর, ঐ সোঁতা খালাটার পারে। সেখানে ছিল বড একটা জিল গাছ, প্রায কাঠা দুই জোডা তার শিকড-বাকড অনেকটা বড বট গাছের মত। আমি কোমর থেকে কাপড খুলে বাঁধলাম নিজেকে ঐ গাছের একটা জটার সংগে।

ঝড চলছে ..

বৃষ্টি পড়ছে ..

বাতাস আসছে গর্জে—

'আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলাম।'

বিপ্রপদ কোন সময় যেন ওখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর কি হল?'

'আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলাম।'

যারা ভীড করে শুনছিল, তারা বিরক্ত হয়ে গেল। কে এক জন যেন বলে উঠল, 'উনি অত্যন্ত প্রাচীন এবং তখন সংজ্ঞাহীন—পরের ঘটনাটা সত্যই জানেন না। আমার বয়স অল্প, আমি জানি তারপর কি হলো।'

জিজ্ঞাসু ভীড লোকটির দিকে ফিরে তাকায়।

'উনি অজ্ঞান অবস্থায় মারা গেলেন।'

সকলে হোঃ-হোঃ করে হেসে ওঠে—দম সামলাতে না পেরে কেউ কেউ কেশে ফেলে। বিপ্রপদ এক পাশ থেকে মন্তব্য করেন, 'বাচাল—ফাজিল কোথাকার!'

'মরলে তো বাবা বাঁচতাম।' প্রাচীন বলে, 'আজ আবার তোমার মুখ দর্শন করে এ বিপদে পড়তে হতো না। ভাইটির পরিচয়, নাম?'

যুবক নাম বলতে চায় না।

সকলে চেপে ধরে, 'কি, বলো না হে নামটা।'

'তোমার বাড়ী কোথায়?'

'বাড়ী তো ও-পাড়—বিন্যাপাড়া।'

'নাম ?'

লোকটা চুপ করে থাকে। জনতার ঔৎসুক্য চরমে ওঠে। ব্যাটা চোর না কি ? তবে নাম বলে না কেন ? সকলে ঘিরে ধরে ওকে লক্ষ প্রশ্নে একেবারে নাজেহাল করে ফেলে।

অবশেষে ও বলে, 'আমার নাম বটুকচন্দ্র রজক দাস।'

এবার যা হাসির পালা আরম্ভ হয় তা আধ ঘণ্টা ধরে চলে। কেউ কেউ গড়িয়ে পড়তে চায় জলে।

প্রাচীন গর্ব করতে থাকে, 'আমি ওর মুখ দেখেই ধোপা বলে ঠাহর করেছি। ওঝোন কাছে মামদোবাজী।'

বিপ্রপদর এ সব ভাল লাগে না। তিনি যত দূর সম্ভব নির্লিপ্ত থাকেন।

হাসির চোটটা সকলেই সামলে নিয়েছে। কে এক জন আবার প্রশ্ন করে, 'তারপর কি হল বুড়ো মশাই, কই, বললেন না তো ?'

'তারপর, তারপর কি হলো জানো—সেবারের ঝড়ে ষ্টীমার-ঘাটের এই ঘর-দোর দোকান-পসারের চিহ্নই রইল না—একেবারে পরিষ্কার। একটা প্রকাণ্ড মাল-টানা মহাজনী নৌকা ছিল পাট আর ধান বোঝাই। ধান আর পাট যে কোথায় গেল তার খোঁজ পাওয়াই গেল না, নৌকাখানাকে কে জানি দু'হাত দিয়ে তুলে রেখে গেল ঐ গাছের মাথায়। ঐ সে বড় নেড়া গাছটা এখনও সাক্ষী আছে।'

কে এক জন মন্তব্য করে, 'এ ঝড় তো না দৈত্য-দানার কারবার।'

বিপ্রপদ বলেন, 'হুঁ।'

আর এক জন বাধা দেয়, 'নিছক মিথ্যে ··গাছের মাথায় নৌকা চড়তে পারে কখনও ? একেবারে আজগুবি।'

অপর এক ব্যক্তি বলে, 'আপনি জানেন কি ? পারে না ? দৈত্য-

দানা ভূত-প্রেত নেই তবে? আপনি দেখছি নাস্তিক। বলুন আগে ঈশ্বর আছেন কি না?'

বিপ্রপদ ভাবেন: এ কি জ্বালা! কোথায় ঝড়, আর কোথায় ঈশ্বর। ওরা আবার হাতাহাতি না করে।

'আমি তো নাস্তিকই। ভূত-প্রেত কিচ্ছু নেই।'

ভীড়টা একটু গরম হয়ে ওঠে।

কোলাহলের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন হয়, 'কি বলছেন?' ঈশ্বরও নেই না কি?'

নাস্তিক বেচারী প্রশ্নটা ঠিক শুনতে পায় না, কারণ সে বাঁ-কানটায় একটু শোনে কম। সে ভাবে অপদেবতার কথাই হচ্ছে বুঝি—ধাঁ করে জবাব দেয়, 'না, ও-সব নেই কিচ্ছু।'

আর যায় কোথায়! ভক্ত এবং বিশ্বাসীর দল চীৎকার করে ওঠে, 'তবে রে শালা, ভগবান নেই? মার, মার শালাকে।'

ঈশ্বরের দয়া অসীম—তিনি না কি বিপন্নের বন্ধু। তাই এমন সময় নামে মুসলধারে বৃষ্টি, বাতাসও আসে—ঝাপটা বাতাস। মারটা মুখে মুখেই থেকে যায়। জনতা ছত্রভংগ হয়ে আশ্রয় নেয় দু'টো টিনের সেডে।

অতি সহজেই দু'টো বিবাদমান সম্প্রদায় খাড়া হয়ে যায়—নাস্তিক ও আস্তিকবাদীর পক্ষে। তারা পাশাপাশি টিনের সেডে আশ্রয় নিয়েছে। জল-ঝড়ও বন্ধ হয় না, তাদের তর্জন-গর্জন আস্ফালনও থামে না।

এরাও মানুষ, বড়বাবু, রমণী ঘোষালও মানুষ—মানুষ নিতাই ইমাম মালা। বিপ্রপ্রদর কাছে এ দুনিয়াটা বিচিত্র বলে বোধ হয়। তার চেয়েও বিচিত্র মানুষের মন। কাল তাঁর নিজের মনের অবস্থা কি ছিল, আজ আবার কত পরিবর্তন হয়েছে। এর পর আরও কত হতে পারে এবং হবে হয়ত। এমনি চাকা না ঘুরলে বুঝি সব অচল

হয়ে যেত। এ চাকা ঘুরাবার মালিক কে? তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করে। বিপ্রপদর মন আকৃষ্ট হয় তাঁর প্রতি।

গয়নার নৌকা যখন ছাড়ে তখন আকাশ পরিষ্কার হয়নি মোটেই। কিন্তু ঝড়ের আশংকা তখন আব নেই। মাঝিরা তা বুঝতে পারে। তাই সামান্য বৃষ্টি মাথায় করে দক্ষিণা বাতাসে পাল তুলে নৌকা অনুকূল স্রোতে পাড়ি জমায়।

মাঝে মাঝে এসে আকাশে গাঢ় মেঘ জমে। তখন বাইরের দিকে চাইলে কিছুই দেখা যায় না। সন্ধ্যাও প্রায় উৎরে যাওয়ার জোগাড়। কি লক্ষ্য করে যে মাঝি হাল ধরে বসে থাকে কি আশায় শুধু সেই জানে। উপরে কালি, জলে কালি, কালিময় বিশ্ব-সংসার' যেন ছ্যাদহীন, রন্ধ্রহীন নিরবচ্ছিন্ন গভীর কালো যবনিকা। সেই যবনিকা ভেদ করে চলে এই যাত্রিবাহী নৌকাখানা। কোথায় যাবে, কেন যাবে, তাও বুঝি ভুলে গেছে আরোহীরা। ভুলে গিয়েও যেন পাথরের পুতুলের মত মাঝির অনুগ্রহে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকে। তারা যেন মৃত। শুধু নৌকাখানাই জীবিত। তাই আরোহীদের গতি নেই, গতির প্রতীক একমাত্র চলন্ত নৌকাখানা।

শিবচর এসে নৌকা থামে অনেক রাত্রে। কিন্তু বৃষ্টি তখনও থামেনি। নিয়ম মত বিপ্রপদর জন্য এক জন লোক এসে অপেক্ষা করছে। হাতে তার একটা লণ্ঠন, মাথায় ছাতি। লণ্ঠনের ফিতাটা কানাচে হয়ে জ্বলছে। তাই ধোঁয়া উঠছিল খুব।

নৌকায় বসেই বিপ্রপদ ডাকেন, 'মহেশ্বর।'

'জো হুকুম হুজুর।'

'এদিকে এসো।'

মহেশ্বর নিকটে আসে, কিন্তু এখন কি জিজ্ঞাসা করবেন? কার কথা? মালার কথা? কি সম্পর্ক উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন করবেন

এই সামান্য ভৃত্যের কাছে? তিনি কিছু ঠিক করতে না পেরে একটু থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কাছারি-বাড়ীর সব ভালো তো?'

'সব ভাল হুজুর। লেকেন—'

'অর্থাৎ?'

'মাইজী বহুৎ গানা গাওতা।' মহেশ্বরের ধারণা মালা পাগলী। এ কদিন একটু সুস্থ ছিল, হালে আবার মাথা গরম হয়েছে।

'আমার হাতে লণ্ঠনটা দিয়ে বাক্স-বিছানা নাও। না, না, আগে ছাতিটাই দাও।'

মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করে যে, আজ জল-কাদার মধ্যে এই বাক্স-বিছানা না নিলে হয় না? পথ-ঘাট নিতান্ত পিছল।

'না মহেশ্বর। ওর ভিতর বহুৎ জরুরী জিনিষ আছে।'

'তব চলিয়ে। লেকেন একদম পিছল—এতনা কাদা!'

তা হলেই বা বিপ্রপদ কি করবেন! ঐ বাক্সের ভিতর এমন সব জিনিষ-পত্র আছে যা আজ রাত্রেই তাঁর প্রয়োজন। এত জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি মালার জন্য কাপড়-চোপড় এনেছেন। আবার কবে সহরে যাওয়া পড়ে কে জানে। তাই কয়েকখানা ভাল-মন্দ কাপড় এনেছেন। সেমিজ-সায়া ইত্যাদি যা যা দোকানদার বলেছে তাও তিনি কিনে এসেছেন। স্ত্রীলোকের দেহ ঢাকতে কি কি বস্ত্রের প্রয়োজন তা তিনি সম্যক্ অবগত নন। অনেক দিন এ সব কেনা-কাটা করেনও না, ও-সব বাড়ীর মেয়েরা তাদের পছন্দ মত লোক দিয়েই করায়। তাই তিনি যা-ও জানতেন তা-ও ভুলে গেছেন। তা ছাড়া তাঁর পছন্দও না কি একটু সাবেকী—সেই জন্যেই এবার দোকানদারের মর্জি মত সব কিনে এনেছেন—টাকার দিকে চাননি। এক ছড়া সোনার হারও এনেছেন। মালার গলাটা একেবারে খালি। এখন এ সব দিয়ে

তাকে ভোলাতে পারলে হয়। এড়াতে পারলে হয় তার সহস্র প্রশ্ন। তাই বাক্সটা একান্ত প্রয়োজন।

পিছল পথে চলতে চলতে বিপ্রপদ এক এক বার পড়ে যাচ্ছিলেন। হড়কে যাচ্ছে পা। আবার টাল সামলে নিয়ে চলতে থাকেন কোনও রকমে। এর ওপর আবার বৃষ্টি এলো বেশ চেপে। এখন না ভিজে আর উপায় নেই। তিনি যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেন কিন্তু যাওয়া কি যায়। টাল সামলাতেই প্রাণান্ত। কাদা ছিটে উঠে কাপড়-চোপড় একাকার করে দিতে লাগল। দু'ধারে জংগল, তার ভিতর দিয়ে গ্রাম্য পথ—তা আবার মেরামত করার জন্য ফেলা হয়েছে নতুন মাটি। জলে-মাটিতে মিশে কাদা যা হয়েছে, তা আর বলার নয়! পূর্ব-বাঙলার বর্ষায় এঁটেল মাটির এ পথে যে না চলেছে, তাকে এর মর্ম বোঝান দায়। ঝিঁঝিঁ ডাকছে, পোকা-মাকড় উড়ে এসে পড়ছে লণ্ঠনটার গায়। সেটা প্রায় অন্ধকার হয়ে এলো।

অতি কষ্টে দু'জনে এসে কাছারি-বাড়ীতে প্রবেশ করেন। বারান্দায় পা দেওয়া মাত্র বিপ্রপদ হড়কে গিয়ে টাল সামলাতে সামলাতে লণ্ঠনটা নিভে যায়। চারদিক অন্ধকার। তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন, 'আর এক জন লোক নিতে পারনি সংগে? যাও, আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বাক্স-বিছানাটা নামিয়ে রেখে যাও। নিজেই আমি আলো জ্বালিয়ে নিতে পারব'খন।'

মোট নামিয়ে দিয়ে তবু মহেশ্বর দাঁড়িয়ে থাকে।

'যাও বলছি। আর হাঁ করে থাকতে হবে না—নিজের হাত-পা ধোও গে।'

মহেশ্বর চলে যায়।

বিপ্রপদ ডাকেন, 'মালা মালা!'

কোনও সাড়া শব্দ নেই। হয়ত মালা ঘুমিয়েছে। বিপ্রপদ কপাট

ধরে ঠেলা দিতেই খুলে যায়। বাইরের এক ঝল্‌কা হাওয়া ঢুকে প্রদীপটা নিভিয়ে দেয়। আজ আর অন্ধকার তাঁকে ছাড়বে না। বাইরেও যেমনি ঘরেও তেমনি। তিনি একটু উগ্র কণ্ঠে ডাকেন, 'মালা মালা।'

এবারও কোনও জবাব নেই। কোথায় গেল মালা?

বাড়ীর ভিতরের উঠান থেকে একটা গানের ধ্বনি ভেসে আসছে। মনে ভিজে ভিজে কে গান গাইছে? মালা না? মালাই তো। মালারই তো কণ্ঠস্বর। সেই তো গাইছে একটা বিরহ সংগীত। কি মিষ্ট কণ্ঠ, কি সুমধুর রাগিণী। বিপ্রপদ অল্প একটু শুনেই যেন তন্ময় হয়ে যান। তিনি মালাকে ডাকার কথা ভুলে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যেতে থাকেন বাইরের প্রাংগনের দিকে। হিন্দি গানের সব কলির অর্থ তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি ভাবাবেগ বিভোর হয়ে যান। সমস্ত জড়িমা কাটিয়ে যৌবন তাঁর উদগ্র হয়ে ওঠে। হৃদয়ে আনে শ্রাবণের দুর্বার প্লাবন।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। মাটির পৃথিবীতে মালা নেচে নেচে গান গায়। কি ছন্দে মালা নাচে তা বিপ্রপদ বোঝেন না, কি সুরে সে গান গায় তাও হয়ত তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না—গানের অর্থ তো তার ভাষার বাইরে, তবু ভাবে তিনি গ'লে যান। ডুবে যান অফুরন্ত রসধারায়।

খাড়া ঝিলকি ঝলকায়···

দেখা যায়: মালার পরনে একখানা শাড়ী। সেই শাড়ীর আঁচল দুলিয়ে দুলিয়ে সে গান গায়—নাচে, আর কাঁদে। অঝোরে জল ঝরছে আকাশ থেকে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। মালা কেঁদে কেঁদে বিরহ জানায়।

বিপ্রপদ দেখে দেখে আর দেখতে পারেন না। সইতে পারেন না মালার এ আকুতি। তিনি এগিয়ে গিয়ে ডান হাতে মালাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করেন, 'মালা, তোমার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব?'

সহসা মালা কিছু বলতে পারে না। গান থেমে যায়। সে বিপ্রপদর দেহের ওপর এলিয়ে পড়ে জলে ভিজা পুষ্পিতা লতার মত।

তিনি ওর লঘু দেহটুকু অনায়াসে তুলে নিয়ে ঘরে চলে আসেন। মালা অনেকক্ষণ নেতিয়ে পড়ে থাকে বিপ্রপদর দেহ আশ্রয় করে। তিনি বুঝতে পারেন মালা এখনও কাঁদছে। তাই তিনি কিছু না বলে স্নিগ্ধ মনে বসে থাকেন। কিন্তু মালার দেহের উত্তাপে তাঁর বুকের স্পন্দন দ্রুততর হতে থাকে। আবার এ কি পরিবর্তন হতে চলেছে। তিনি জোর করেই মালাকে ত্যাগ করে ভিজা কাপড় বদলাতে যান। মালাও উঠে বসে। এখন সে অনেকটা স্থির হয়েছে।

'মালা, একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে বাইরে দাও তো। অনেকক্ষণ তুমিও ভিজা কাপড়ে থেকো না। কাল আমাদের এখান থেকে ভোরেই রওনা হয়ে যেতে হবে। অনেক দূরে যাবো, তুমিও সংগে যাবে।'

বিপ্রপদর কথায় মালার মনের গতি অন্য দিকে ঘোরে। অল্প সময় বাদেই একটা বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে আসে। এসে, স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেসা করে, 'কোথায় যেতে হবে ?'

'অনেক দূরে দক্ষিণের বিলে। তুমি যাবে না ?'

'এখনও পরীক্ষা ?'

'পরীক্ষা একটা না—অনেকটা দিতে হয় এক জীবনেই।'

'অনেক—ক'টা ?'

'তার তো কোনও মাপ-জোক নেই।'

'না থাক। নাম তো আছে ভিন্ন-ভিন্ন।'

'আছে বই কি। তুমি ক'টারই বা নাম জানো—এম-এ, বি-এ—আরও কত বড় বড় পরীক্ষা আছে।' বিপ্রপদ একটু ব্যংগ মিশ্রিত স্বরে বলেন, 'পড়ো শিশু-শিক্ষা, তোমার দরকার কি ওতে ?'

'আমার এখন কোনটা বাকী, এম-এ, না বি-এ ? কোনটা

দিতে হবে?' মালা চটুল কটাক্ষ নিক্ষেপ করে জিজ্ঞাসা করে, 'কোনটা?'

বিব্রত হয়ে বিপ্রপদ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন, 'কি জানি। তুমি ঐ বাক্সটা খুলে আমাকে একখানা কাপড় দিতে পার। আমি আর ভিজে কাপড়ে থাকতে পারি নে।'

'পারব না কেন? একটু দেরী করুন—আমি এনে দিচ্ছি।'

বাক্স খুলে সে বিপ্রপদর প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে ফের প্রশ্ন করে, 'এত শাড়ী-সায়া ব্লাউজ কার জন্য? বাঃ, এই যে এক ছড়া সোনার হারও দেখছি। কার জন্য এ ছড়া এনেছেন বাবুজী? বাড়ী বুঝি নিয়ে যাবেন? কে পরবে এ হার? বড় সুন্দর তাকে দেখাবে।...আপনার ছেলে-মেয়ে ক'টি তা তো বলেননি কোনও দিন। সত্যি কথা, আপনার স্ত্রী দেখতে কেমন, কিছুই তো জানি নে আমি। আমার কাছে আজ বলতে হবে সব। সকলের কথা না জানলে আমি কি করে তাদের সংগে মিশব? থাকব কি করে তাদের সেখানে? বাবুজী, বলুন না আপনার ক'টি ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী দেখতে কেমন?'

'সে সব পরে ধীরে ধীরে শুনো। এখন যাব দক্ষিণের বিলে। সেখানে আমার বাড়ী না—জমি-জায়গা আছে। অনেক কৃষাণ-মজুর লোক-জন খাটে। তার ভিতর তুমি যাবে, অনেক দিন হয়ত থাকতেও হতে পারে সেখানে—তাই এ সব এনেছি তোমার জন্য, বুঝলে এখন। তুমি হার ছড়া গলায় দাও, দেখি কেমন মানায় তোমাকে। আন্দাজে এনেছি বলে যে বেমানান হবে তা আমার মনে হয় না। দেখি দাও তো, পরো তো গলায়।'

মালা আনন্দে পরতে যায় হার। সে টিপ-কলটা খুলতে পারে না 'এ কি আমি তো খুলতে পারছি নে, কেমন করে খোলে এটা?'

'জোর-জবরদস্তি না করো—আমার কাছে নিয়ে এসো।' বিপ্রপদ

টিপ-কলটা খুলে হার ছড়া মালার গলায় পরিয়ে দিয়ে আবার বন্ধ করে দেন কলটা।

নতুন একখানা রঙিন শাড়ী নিয়ে মালা দ্রুত চলে যায় কাপড় বদলাতে। তাড়াতাড়িই সে ফিরে আসে। শাড়ীখানায় ওর তনুখানি নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছে। ভিজা চুলগুলি সর্পিল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে। সেমিজ পরেনি, সায়া পরেনি, শুধু শাড়ী। যেন মেঘডম্বরু সাপ গ্রাস করেছে উলংগিনী এক ভুবনমোহিনী নারী-দেহ।

মালা বিপ্রপদকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে।

'আ-হা-হা এ কি, এ সব করো কি।' খানিকটা পিছিয়ে যান বিপ্রপদ।

'আপনি আমাকে তুচ্ছ করছেন?'

'না, না, তুচ্ছ করব কেন?—তুচ্ছ করব কেন?'

'তবে যে পিছিয়ে গেলেন।'

'এর তো দরকার নেই এখন।'

'আছে কি না তা আমি জানি। মা নতুন কাপড় পরলেই বাবাকে প্রণাম করতেন। নতুন কাপড় পরে গুরুজনদের আশীর্বাদ নিতে হয় প্রণাম করে। আমি সে সব হাল-চাল জানি বাবুজী—মা আমাকে সব শিখিয়েছে।'

'তবে করো প্রণাম।'

'কি আশীর্বাদ করলেন বাবুজী?'

'তুমি, তুমি, সুখী হও মালা।' এ ছাড়া আর কি আশীর্বাদই বা ওকে করা যায়।

'এখন বলুন আপনার বাড়ীর কথা।'

'তা বলার এবং শোনার ঢের সময় আছে—এখন খেয়ে-দেয়ে সব গুছিয়ে ফেল। কাল সকালেই চলে যাব আমরা রওনা দিয়ে।'

'এত তাড়াতাড়ি কেন ?'

'আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি। চাকরী আর ভাল লাগে না—ওতে লাভ নেই কিছুই।'

'চাকরী ছেড়েছেন, এখন করবেন কি ? খাবেন কি করে ?'

'চাষ-আবাদ করে। আমার খুব ভাল জমি আছে। সেখানেই কো বাসা তোমাকে নিয়ে। তুমি যাবে না ? কেমন সুন্দর ধানের ক্ষেত।'

'ভালই তো। আমি আবার যাব না। আমিও খাটব সংগে সংগে।'

'তুমি পারবে ? রোদে-বাতাসে জলে কাদায় পারবে আমার সংগে দিন-রাত খাটতে ? তোমার কষ্ট হবে না ?'

'না বাবুজী, কিছুতেই কষ্ট হবে না। মেয়েমানুষ সব পারে যদি তার মন বসে। সব দুঃখই সে সইতে পারে মিল-মিশ থাকলে পুরুষের সংগে।'

মালার সে বাঞ্ছিত পুরুষটি কে ? স্বয়ং বিপ্রপদ ? ক্ষণিকের জন্য তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সুন্দরী রমণীর সান্নিধ্য পাগল করে তোলে তাকে। তিনি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না বুঝি। গভীর নিশুতি রাত্রি—তাতে অঝোরে ঝরছে জল। প্লাবন এসেছে বাইরে, বিপ্রপদর মনেও আবার আসে বন্যা। এ বেগ তিনি কেমন করে সম্বরণ করবেন ?

এমন সময় মালা উঠে যায় খাবার আনতে।

বিপ্রপদ জানালা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেন। ভাবতে চেষ্টা করেন অন্য কথা, কিন্তু কিছু মনে আসে না। শুধু মালা—মালার চিন্তায় ভরে থাকে তাঁর হৃদি-দিগন্ত। সে ছাড়া এ জগতে তাঁর যেন কিছু নেই, কেউ নেই। মালা—শুধু মালা !

'কিছু খাবেন না? দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি? আসুন, কিছু খেয়ে নিন।'

'কি খাবো?'

'যা জোগাড় আছে। আমি তো রোজই কিছু-না-কিছু জোগাড় করে রেঁধে রেখেছি। কিন্তু আপনি আসেননি। এক দিনের কথা বলে এত দিন যে দেরী করবেন তা বুঝলে আমি কি রাজী হতাম একা একা থাকতে? উঁহু, কিছুতেই না।'

'তা আমি জানি। তাই তোমাকে ভুলিয়ে রেখে গেছি। তবে আমার যে এত দেরী হবে তাও আমি বুঝতে পারিনি।'

'এত দেরী হলো কেন, দেশে গিয়েছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

মালা কেন জানি একটুখানি ম্লান হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে, সবাই ভাল আছেন তো? আমাকে নিয়ে গেলেন না কেন? আমি জানলে আমাকে কিছুতেই ফেলে যেতে পারতেন না।'

'একদিন যাবেই তো—ব্যস্ত কি?'

'কোথায় দক্ষিণের বিল, কোথায় আপনার দেশ—আমার সব দেখতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে আপনার সংগে বেড়াতে। আমি জোয়ার-ভুট্টার ক্ষেত দেখেছি, কিন্তু এ দেশের ধানের ক্ষেত দেখিনি। এ দেশের নদী জল হাওয়া ফসল-ভরা মাঠ, নারকেল সুপারির বাগান আমার চোখে বড় ভাল লাগে। ইচ্ছা করে ঘুরে বেড়াতে বাগানে বাগানে। এদের সংগে আমার যেন মিতালি—এরা আমায় ভালবাসে, আমি ভালবাসি এদের।'

'জানলে কি করে এরা তোমায় ভালবাসে? তোমার তো ভুলও হতে পারে।'

'ভুল, ভুল, না, না, আমি ভুল করিনি কখনও।'

'না যদি করে থাক ভালই। তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাকো। এখন চলো খেতে দেবে।'

'চলুন।' মালা লজ্জিতা হয়ে বলে, 'এই দেখুন, আপনাকে খেতে ডাকতে এসে কথায় কথায় ভুলে গেছি সে কথা। কেমন ভুলো মন যে আমার!'

'এই না একটু আগে বললে—তুমি ভুল করো না কিছু?'

মালা চলতে চলতে জবাব দেয়, 'সে-কথায় আর এ-কথায় ঢের তফাৎ।'

বিপ্রপদ খেয়ে-দেয়ে সামান্য একটা শয্যা টেনে এনে শুয়ে পড়েন। বাকীগুলি গুছিয়ে বাঁধতে হবে। তা মালাই করতে পারবে। অন্যান্ত জিনিষ-পত্তর এমন বেশী কিছু না, তা-ও সে সামলাতে পারবে—বাঁধতে পারবে একা। সে বেদিয়ার মত বিদেশে চলেছে, তাকে কিছুই শেখাতে-বোঝাতে হবে না।...

প্রথম দিন বিপ্রপদ মালাকে নিয়ে যেমন বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন আজও তেমনি। কিন্তু সেদিন আর এদিনে কত পার্থক্য! এ পার্থক্যের কারণ কি? মালার যৌবন, তার গান, তার সারল্য? কোনটা? সব ক'টা মিলেই তাকে মুগ্ধ করেছে বুঝি। ভিতরে ভিতরে মালাও অভিভূত হয়েছে। হয়ত তাঁর চেয়ে অনেক বেশী। হয়ত কেন, নিশ্চয়।

তিনি তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন? না, উচিত হয়নি মালাকে ইন্ধন জোগান। তিনি কতগুলি সন্তানের পিতা। একনিষ্ঠ রমণীর স্বামী। তাঁর পক্ষে এ একটা গুরুতর অভিযোগ, কলংকের কথাও বটে।

তিনি মালাকে ফেরাবেন, নিজেও ফিরবেন সংগে সংগে। তাকে আজ তাঁর সংসারের সব কথা খুলে বলবেন। বুঝিয়ে দেবেন তিনি অক্ষম এবং অনুপযুক্ত। মালার উচিত তাঁকে ত্যাগ করা। তিনি যদি

কিছু দোষ-ত্রুটি করে থাকেন, তার জন্য নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইবেন মালার কাছে। ·

মালাকে তিনি বিয়ে দেবেন। তাতেই মালার সুখ, বিপ্রপদর শান্তি।

'তুমি খেয়েছ মালা?'

'খাওয়া আমার অনেকক্ষণ হয়েছে, জিনিষ-পত্রও প্রায় সব গুছিয়ে ফেলেছি। আপনি যে এখনও ঘুমাননি? অমন বিছানায় শুয়ে কি আপনার ঘুম আসতে চায়। তা আমি আগেই জানি, কিন্তু বলিনি— ভেবেছি, হয়ত ক্লান্ত শরীর—ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখন উঠুন, ভাল বিছানাটা পেতে দেই। আজ আবার কেমন রাত দেখছেন—জল মোটেই থামছে না, হাওয়া চলছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এ আমার বড় ভাল লাগে—এমনি রাতেই রাধিকা গিয়েছিল অভিসারে। শুনবেন সে গানটা?'

'না, এখন থাক। বরঞ্চ তুমি যা শুনতে চেয়েছিলে তাই শোনো। আমার বাড়ীর কথা বলি।'

'বলুন, তাই শুনবো—এখন আর গান না-ই বা গাইলাম। কত দিন মনে হয়েছে কিন্তু আর জিজ্ঞাসা করা হয়নি, আপনিও কিছু বলেননি। আচ্ছা, আমার কাছে এত দিন গোপন করেছেন কেন?'

'আমার স্ত্রী আছে—তোমার মা'র বয়সী।'

'বেশ, ভালই তো। ভাগ্যবানের স্ত্রী থাকে, ভাগ্যবতীর স্বামী। ছেলে-মেয়ে ক'টি?'

'আমার ন'টি সন্তান। আটটাই মেয়ে, একটি মাত্র ছেলে—ছেলের নাম অমরেশ, বয়স তার বার-চৌদ্দ।'

'আপনার ন'টি ছেলে-মেয়ে। ওদের মা'র বয়স কত?'

'তা তো ঠিক জানিনে। তবে চল্লিশের কোঠা ছাড়িয়েছে নিশ্চয়। ছোট কালেই বিয়ে হয়েছিল কি না।'

'আপনার এখন বয়স কত ?'

'পঞ্চাশ—কিছু বেশীও হতে পারে। আমি তো প্রাচীন।'

'বাবুজী, প্রাচীনরাই ভাল। ওঁদের বুদ্ধি স্থির।' মালা বলে, 'আপনি নিজেকে যত বুড়ো ভাবছেন তত বুড়োও হননি। এখনও আপনাকে দেখতে দিব্যি জোয়ান দেখায়। ঐ বয়সে বাবাও বিয়ে করেন মাকে। আপনি এখন ক্ষেত-খামারে চাষ-বাস করতে যাবেন, নিজেকে অত বুড়ো ভাবলে চলবে কেন? চাকরী ছেড়েছেন ভালই হয়েছে—মনটাকে তাজা করুন।'

মালা সরল হলেও যে বোকা নয় তা বিপ্রপদ জানতেন—কিন্তু এতটা তীক্ষ্ণ গাঢ় বুদ্ধিও যে তার আছে, তা তিনি ধারণাই করতে পারেননি। কিছুক্ষণ তিনি অবাক হয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'একটা কথা শুনবে মালা? যদি রাখো তবে বলি।'

'বলুন, কেন রাখব না ?'

এমন সময় একটা দমকা হাওয়া এসে ঘরে ঢোকে—জানালা দু'টো খুলে যায়। জলও আসে খানিকটা। জানালা বন্ধ করতে মালা উঠে যায়।

'তুমি বিয়ে করবে ?'

'কাকে ?' মালা বিস্মিত মুখে প্রশ্ন করে, 'কাকে বাবুজী ?'

'আমি যার সংগে ঠিক করে দেই তাকে।'

'ওঃ!' মালা একটা যেন ধাক্কা খেয়ে নিজেকে অনেকক্ষণ বসে সামলে নেয়। নিয়ে বলে, 'সমাজে আমার স্থান নেই। এমন একটা কিছু ভাল বিয়েও হবে না—হলেও কেউ একটা উঁচু স্থান দেবে না। তা যদি হতো তবে আমি এত দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতাম না সামান্য একটু আশ্রয়ের আশায়! আমার মানুষ চিনতে বাকী নেই বাবুজী। ভালবাসা আমার ভাগ্যে নেই, এ আশ্রয়টুকুও বুঝি খসবে, তাই আপনি তুললেন নতুন কথা।'

বিপ্রপদ নিরুত্তর হয়ে থাকেন।

কি যেন হাতে করে মালা বাইরে চলে যায়। বিপ্রপদ সেদিকে লক্ষ্য না করে আকাশ-পাতাল কত কি যে ভাবতে থাকেন। ঘরের লণ্ঠনটা জলতে জলতে নিভে আসে—তেল ফুরিয়েছে। সমস্ত আবার অন্ধকার হয়ে যায়। বিপ্রপদর মনে আঁধার, মালার মনেও—আঁধার বাইরে—আঁধার চারদিকে।

কিছুক্ষণ পরে বিপ্রপদ হঠাৎ শয্যা ছেড়ে উঠে পড়েন। তার মনে আশংকা জেগেছে। মালা কোথায় গেল? অভিমানিনী মালা গেল কোথায়?

খাড়া ঝিলকির ঝলকানিতে তিনি চেয়ে দেখেন—বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালা কাঁদছে। তিনি আর থাকতে পারেন না। এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি, প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, এ দুর্যোগে কোথায় যাবে তুমি? তোমার সুখেই আমার সুখ। এসো মালা, ঘরে এসো—আর ভিজো না।'

মালা বলল, 'না, না, আমি ঘরে যাব না। বাইরের মালা বাইরে চলে যাব, অন্ধকারে। আপনি না বুঝে আশ্রয় দিয়েছেন, তা বলে আমি অবুঝ হবো কেন? এ সংসারে আমার কোনও মূল্যই নেই—আমি জঞ্জাল, তাই সকলে কুড়িয়ে ফেলতে চায় বাইরে। আমাকে ঘরে মানায় না, আমি ঘরে গিয়ে করব কি?'

এতক্ষণ বিপ্রপদ যা লক্ষ্য করতে পারেননি, আবার বিদ্যুৎ চমকালে তা নজরে পড়ে। তিনি বিস্মিত হন। মালা শাড়ী ছেড়ে ঘাগরা পরেছে—গায় দিয়েছে সেই ছিন্ন ওড়নাটা। সে তাঁর কিছু চায় না, কিছুই নেবে না। দাবীর অধিকারে যখন বঞ্চিতা, তখন জোর সে খাটাবে না।

গলাটাও তার খালি। তাঁর বুকের মধ্যে কে যেন একটা ঘা মারে। বিপ্রপদর দেওয়া সকল ঐশ্বর্য সে তুচ্ছ করেছে। যে দারিদ্র্য নিয়ে সে এসেছিল এখন তাই নিয়েই সে বিদায় হবে—বিদায় হবে অকূলে।

বিপ্রপদ মালার হাত দু'খানা ধরে অনুনয় করে বলে, 'তুমি যেও না, মালা, যেও না। আমি আর তুমি এমন দেশে চলে যাব যেখানে এ সমাজ নেই, সংসার নেই, ভয় নেই, না আছে কোনও ভাবনা। তুমি আর আমি—আর আমাদের সুমুখে অসীম মুক্ত মাঠ—আমার স্বপ্নে-ভরা দক্ষিণের বিল। সেখানে আমরা চাষ-আবাদ করব। তুমি হবে চাষার ঘরের চাষার কাজের সহচরী। তাই বলি, আজ তুমি ফের মালা—আর জলে ভিজো না।'

মালা ফিরে এসে আবার শাড়ী পরে, ঘাগরা-ওড়না খুলে রাখে।

সাত

শিবচর কাছারীর ম্যানেজার সামান্য একখানা এক বৈঠার ডিঙি ভাড়া করে কাছারী ছেড়ে চলেছেন। মাঝি-মাল্লা কোষনৌকা গোলামীর সব জাঁক-জমক পিছনে পড়ে রইল। পড়ে রইল পেয়াদা পাইক—ঔদ্ধত্য ও আড়ম্বর। এ সবটার জন্য বিপ্রপদর আজ আর দুঃখ নেই। শুধু দুঃখ হয় ডামিল-বাগটার দিকে চাইতে—যেখানে আসমানতারা পালিয়ে গিয়েও ফেলে গেছে একটা মর্মান্তিক স্মৃতি। এখন আবার সংগে চলল মালা। পরিণামের কথা না ভেবে তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলেই মালা আজ তাঁর সহগামিনী। সুখীকেও তিনি এড়াতে পারেননি বলেই দক্ষিণের বিলে ধানী-জমির সৃষ্টি। বিধাতা যেন জোর করেই তাঁর বরাতে এ সব ঠেলে দিয়েছেন। চাকরীটা গেল, সঙ্গ একটা জলের মত পয়সা খরচেরও সময় এলো। তা খরচ করতে না পারলে বিলে গিয়ে দৈহিক পরিশ্রম করা বৃথা—এ সব গুরুতর সমস্যারও এক সময়েই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন বিধাতা। হয়ত ভালর জন্যই। তাই তিনি যতটা সম্ভব মনস্থির রেখে চলতে চান।

নিজের মনে যে উদ্বেগ দেখা দেয়, তা বাইরে প্রকাশ করে হবে কি। হয়ত কেউ শুনলে সান্ত্বনা দেবে। সান্ত্বনায় প্রলেপ পড়ে কিন্তু আঘাতের জ্বালা ঠিকই থেকে যায়। বিপ্রপদ বেশ বুঝতে পারেন: আজ তাঁর জীবনে সব দিক দিয়ে একটা আমূল পরিবর্তন এলো।...

মাঝি জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় যেতে হবে হুজুর?'

বিপ্রপদর চমক ভাঙে। তাই তো কোথায় যেতে হবে। তিনি মালার দিকে চেয়ে দেখেন যে, সে তার অসামান্য রূপের পসরা নিয়ে ছইয়ের বাইরে অনির্দিষ্টের দিকে চেয়ে আছে। সে একটু মুখ ফেরায়। তার চোখে জল। এখন তিনি মাঝির কথার জবাব দেবেন, না মালার কি হলো তাই আগে জিজ্ঞাসা করবেন। মাঝিটাই বা কি বোকা। এত সময় নৌকা চালিয়ে এগিয়ে এসে এখন জিজ্ঞাসা করছে, যেতে হবে কোথায়? মাঝির তো দোষ নেই। এ তো শিবচর কাছারীর ম্যানেজারেরই দোষ। তাঁর প্রতাপে কি কোনও মাঝি মাল্লার জিজ্ঞাসা করার সাধ্য আছে ভাড়া কত, কিম্বা যেতে হবে কোথায়। বৈষয়িক প্রয়োজনে কোথায় কখন যেতে হবে, তা কি আগে জানান যায় মাল্লা-মাঝিদের। তাই শিবচরের রীতি হয়ে গেছে কাছারীর নাম শুনলে আর প্রশ্ন কি দ্বিরুক্তি না করে সোয়ারী নিয়ে নৌকা বাওয়া। এত দিন যে সুবিধাটা তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন, অথবা তাঁর পেয়াদা-বরকন্দাজেরা করেছে, তার অসুবিধাটা যে কোথায়, এখন তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন।

দক্ষিণের বিল—এই পর্যন্ত তিনি জানেন। দক্ষিণে তো কত বিল আছে। কত হেউলী-হোগলার জলো জমি রয়েছে। কত রয়েছে খাজনা-করা জেলে-নমশূদ্রের জলচর। নক্সা-পরচাটাও কাছে নেই যে, তা দিয়ে একটা কিছু ঠিক-ঠাক ঠাহর করে নেবেন। এমন ভুলও তাঁর মত লোকের হয়? ঐ বিলের কাছে কি কি গ্রাম, কোথায় তার

থানা, তিনি কিছুই জানেন না। একেবারে যে না জানতেন, তাও নয়। দলিল রেজিষ্ট্রীর সময় সকলই উল্লেখ হয়েছে, দলিলে লেখাও হয়েছে, কিন্তু সে সব খুঁটিনাটি কথা এখন আর স্মরণ নেই। দলিলখানাও আবার নিয়ে গেছে নিতাই। বেশ বুদ্ধিমান লোক তিনি—বেশ বুদ্ধিমান লোক! মালা অনির্দিষ্টের দিকে চেয়ে আছে, তিনিও বড় নির্দিষ্টের দিকে যাত্রা করেছেন।

মাঝি আবার প্রশ্ন করে, 'অনেক দূর তো এলাম—এখন আন্দাজে কোথায় যাব হুজুর? একটা খাল গেছে ডাইনে আর একটা বাঁয়ে, কোন্‌টা নিয়ে বাইব?'

মালার চোখের জলের কথা আপাতত ভুলতে হয়—বিপ্রপদ ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে নিজের মনে-মনে অস্ফুট স্বরে বলেন, 'তাই তো, কোথায় যেতে হবে আমিই তো জানি নে। তাই তো!'

ভোর হওয়ার সংগে-সংগে বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ যেটুকু অপরিচ্ছন্ন ছিল, তা সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হয়েছে। খালের দু'পাড়ে কৃষকরা নতুন জল পেয়ে মনের আনন্দে ঠেলছে লাঙল। কেউ সুবিধা বুঝে মই জুড়ল। কেউ তামাক টানছে জমির আলে বসে। হাতে-পায়ে কাদা মেখে একটা যোয়ান ছেলে পাচন নিয়ে একটা রাঙা বলদের পিছু-পিছু ছুটছে এক-হাঁটু জলে-কাদায় ঝপ ঝপিয়ে। ছেলেটাও যেমন বলদটাও তেমনি—কেউ কম যায় না।

এক জন কৃষক জিজ্ঞাসা করল, 'যাইবেন কোন স্থানে?'

বিপ্রপদর ভরসা হলো, বলেন, 'দক্ষিণের বিল।'

'কোন্ বিলে? বিল তো কতই আছে দক্ষিণে—হাতীসুরা, মৈরুণ্ডী, বিল আল্‌গি, বিল আবাদ।—কোন বিলে?'

'তা তো ঠিক জানি নে।'

'বেশ রসিক লোক তো আপনে! কোথায় যাইবেন, তাই জানেন না, অথচ যাইয়া মানুষ সংগে।'

'ঠাট্টা করার কিছু নেই—বাস্তবিকই আমি জানি নে।'

কৃষক মইর ওপর চড়ে বলদ চারটাকে 'ডাইনে ডাইনে বাঁয়ে বাঁয়ে' চলতে নির্দেশে দিয়ে সংগীদের ডেকে বিদ্‌ঘুটে হাসি হেসে বিপ্রপদর দুরবস্থার কথাটা জানায়। এমনি ভাবে কথাটা পাঁচ-সাত জনের কানে যায়। যে যার কাজ বন্ধ রেখে মহা কৌতূহলে নৌকার কাছে ছুটে আসে। কারুব পরনে ছোট গামছা কারুর পরনে খাটো ধুতি—তেমন লজ্জার বালাই নেই। এই নমশূদ্র কৃষকবা এ দেশে যেমন দুর্দান্ত, তেমনি ডাংকাবাজ—হঠাৎ দাবাগ্নির মত জ্বলে উঠতে পারে।

তবু এদের ওপরই গন্তব্য স্থানের পথের মীমাংসার ভারটা ন্যস্ত করেন বিপ্রপদ। অনেক কথাবার্ত্তার পর স্থির হয়, এরা ঠিক চেনে না। তবে প্রায় এক ভাটা দক্ষিণের দিকে নৌকা বাইলে একটা গ্রাম পাওয়া যাবে, তাব নাম নিমতলা। সেখানে খালের দু'পাড়ে নমশূদ্র ও মুসলমান বহু কৃষকের বাস। তারা সদা-সর্বদা বিলে যায়। তারা একটা কাতার-কিনার করে দিতে পারবেই। আর সন্ধ্যার সময় সেখানে নৌকা লাগান ভাল। নিমতলা ভাল গ্রাম—কোনও ভয়-ভীত নেই। সকাল বেলা আবার নৌকা খুললেই হবে তাদের নির্দেশে। এখন বাঁ দিকের খালটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে করতে না যাওয়া যায় কোথায়? দক্ষিণের বিল তো ছার—দিল্লী, বোম্বাই, বিলেত পর্যন্তও যাওয়া সম্ভব। বিপ্রপদ নৌকা খুলতে হুকুম দিয়ে ছইয়েব মধ্যে যান।

'মালা, সারা রাত তুমি চোখের পাতা বোঁজনি—এখন একটু ঘুমোলে পারতে!'

'আপনি? আপনিও তো সারা রাত ঘুমোননি—এখন একটু বিশ্রাম করুন।'

'এই তো আমি শুয়েছি, তুমিও শুয়ে পড়ো। আমার মনে নানা চিন্তা, বিলে পৌঁছোতে দেরী হলে ওরা আবার কিসে কি ঘটায়—এক দল গোঁয়ার গেছে সেখানে—এদিকে এখন পথের হদিস করতে পারলাম না, তুমি এক জন মেয়ে লোক রয়েছ সংগে—আমার কি ঘুম আসতে পারে চোখে ?'

মালা বিপ্রপদর শিয়রের দিকে একটা বোঁচকা টেনে এড়ো হয়ে শোয়। শুয়ে তাঁর চুলের ভিতর আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে টানতে থাকে। 'দেখুন এখন একটু চোখ বুঁজতে পারেন কি না!'

বিপ্রপদ ঘুমাবেন কি! তাঁর সর্ব শরীর শিউরে উঠতে থাকে অথচ তিনি নিষেধ করতে পারেন না মালাকে। সে ভাববে কি।

'একটু আগে তুমি কাঁদছিলে কেন ?'

'ভাবছিলাম : কত দিন আর শিবচর সংসারী করলাম। ওই তো আমার হাতেখড়ি। প্রথম সংসার। তাই শিবচর ছেড়ে আসতে বড় দুঃখ হলো। মেয়েলোকের পক্ষে এ খুবই স্বাভাবিক।'

'আর পুরুষের পক্ষে ?'

'কি ?'

'প্রথম সংসার ছাড়া। মোটেই দুঃখের নয়, না মালা ?' সহসা কমলকামিনীর কথা মনে পড়ে বিপ্রপদকে অস্থির করে তোলে। এক দিন এই নারী তাঁর প্রাণে প্রথম রোমাঞ্চ এনেছিলেন—প্রথম যৌবনে। তিনিই তো তাঁকে উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছিলেন কত রূপ ওই নারী-দেহে, কত স্বপ্ন ওই কালো চোখে—কত শিহরণ প্রথম মিলনে। আজ তিনি বিগত-যৌবনা। তাঁরই সংসারে প্রাণপাত করে খেটে তাঁর জীবনের বসন্ত কাল চলে গেছে। তবু তিনি স্থির বিশ্বাসে, বিপ্রপদর জন্য, তাঁরই পরিজনের জন্য মায়ের মত সেবা দাক্ষিণ্য ও স্নেহ নিয়ে বসে

আছেন। তাঁকে ছাড়া যে কত দুঃখের, তা কি মালা বুঝবে? বিপ্রপদ উঠে বসেন। ভাল লাগে না মালার পরিচর্যা।

'হঠাৎ কি হলো?'

'না, কিছু হয়নি!' বলে তিনি ফের শুয়ে পড়েন—আবার উঠে বসেন, 'মাথাটা যেন কেমন করছে নৌকার ঝাঁকুনিতে।'

'মাথাটা একটু ধুইয়ে দি, দেখবেন বেশ আরাম লাগবে'খন।'

'না, দরকার নেই।' কিছু সময় পরে বিপ্রপদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রথম সংসার ছাড়া পুরুষের পক্ষে মোটেই দুঃখের নয়, কেমন মালা?'

'আমি তো তা বলিনি। আমি কেউকে কিছু ছাড়তে বলি নে। একটা বট গাছের তলায় দশ জন আশ্রয় নিয়ে নিশ্চিত রয়েছে, তাদের পাশে আমি একটু স্থান চাই, এই তো!'

'তবে আমি একটা বট গাছ ধৈর্যের প্রতীক।' বিপ্রপদ না হেসে থাকতে পারেন না। 'তোমরা আশ্রিত, তোমাদের জন্য দাব-দাহ ঝড়-তাড়না সইতে হবে সারা দিন, উপমাটা মন্দ না। মালা, তুমি এত অল্প বয়সে এত পাকা কথা শিখলে কার কাছে? তুমি আশ্চর্য করলে আমাকে?'

মাঝি বলে যে বেলা প্রায় দুপুর হলো, রান্না-বান্নার হবে কি? একটা গাছের তলায় নৌকা ভিড়িয়ে যা-হক ব্যবস্থা করতে হয়। তারা গতর-খাটা মানুষ, না খেয়ে আর কতক্ষণ থাকতে পারবে।

মালার হুঁস হয়। সে সবই করে নিতে পারবে যদি একটু জোগাড় করে দেওয়া হয়। মাঝি একটা কদম গাছের তলে নৌকা বাঁধে। লোহার শিকলের আংটাটা কেমন অনায়াসে বাঁধিয়ে দিল শিকড়ে। মালা দেখল চেয়ে। জলের তোড়ে শিকড়গুলো ছত্রাকার হয়ে বেরিয়ে পড়েছে নানা দিকে। গাছ এখন এক দিন এই খালের মধ্যেই পড়ে

যাবে। কদম গাছটার পাশেই কি যেন একটা অন্য গাছ—বেশ উঁচু পাতাবহুল। ফুলগুলো তার রেশমের মত—অনবরত ঝরে পড়ছে জলে। মালা চাল ধুতে-ধুতে সেগুলি জলের সংগে ভেসে আসে তার গামলায়। সে বিরক্ত হয়। আবার ভালও লাগে সেগুলো নেড়ে-চেড়ে সরিয়ে দিতে। কি নরম সুন্দর ফুল। কোনও রাজবাড়ীর বাগানে জন্মালে আদর হতো কত! আর সে কিনা দিচ্ছে ঠেলে ভাসিয়ে।

জোগাড়-যন্ত্র করতে যা সময় লাগে, রাঁধতে আর কি—খেতে লাগে তার চেয়েও কম সময়।

মালা জিজ্ঞাসা করে, 'এখন জোয়ার না ভাটা?'

'তুমিই বলো না!'

মাঝিটা প্রশ্ন শুনে মুখ নীচু করে টিপে-টিপে হাসতে থাকে।

'আমি বুঝি না। ভাবি, আপনারা বোঝেন কি করে অত সহজে।'

'তুমিও বুঝবে মালা—তুমিও বুঝবে। আমাদের দেশ জোয়ার-ভাটার দেশ। এখানে একবার ফেঁপে-ফুলে ওঠে জল, আবার ক'মে যায়, শুকিয়ে যায় ভাটায়, এমনি দিনে-রাত্রে চার বার। একবার খাল-বিল লক্ষ্য করে দেখো, ভরে ওঠে কানায় কানায়—ফের শুকিয়ে নীচে নেবে যায় জল। দক্ষিণে সমুদ্র—বেশী দূর না, দু'-চার ভাটার পথ। 'কামান ডাকের' কথা শুনেছ? না, বোধ হয় শোননি। বোশেখ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সমুদ্রের জলে মাঝে মাঝে কামান দাগার মত আওয়াজ হয়। কেন যে এ-শব্দ হয় তার হদিস এখনও কেউ করতে পারেনি। কান পেতে একটু চুপ করে থেকো, শুনতে পাবে সে শব্দ।'

'বলেন কি!' মালার মন ভয়ে বিস্ময়ে ভরে ওঠে। তার কল্পনায় জেগে আসে উদ্দাম সমুদ্র-তরংগ। সে ভীত স্বরে বলে, 'যদি আমরা ভুল-পথে অকূল সমুদ্রে গিয়ে পড়ি! যে ছোট নাও, পথও চিনি নে।'

'দূর, আমি রয়েছি তোমার ভয় কি? পথের খোঁজ পাবই, দক্ষিণের বিল আর কত দূরই বা হবে। সমুদ্র কি এখানে? কাছে বললেই কাছে হলো! এমন ভুল আমার হবে কেন?'

'আমার ভয় করে, কিন্তু ভালও লাগে এ সব শুনতে।'

'দক্ষিণের বিলে যাচ্ছ, আরও কত কি শুনবে কত কি দেখবে। আমি সে দেশ দেখিনি, কিন্তু শুনেছি সে দেশের অনেক গল্প লোকের মুখে। তুমিও শুনবে, দেখবে কত?'

সন্ধ্যার সময় নিমতলা এসে নৌকা থামে। নিমতলাই বটে। প্রায় শ'খানেক নিম গাছ আছে গ্রামের মনসা তলায় খালের পারে।

মধু সর্দারের ঘাটে এক জন ভদ্রলোক এসেছেন মেয়েলোক সংগে নিয়ে—সংবাদ শুনতে পেয়ে সে হাঁস-ফাঁস করতে করতে ছুটে আসে। লোকটা যেমন মোটা তেমনি কালো—যেন একটা মোষ। সন্ধ্যার সময় চেনাই দায় হত তার পাকা চুল ও সাদা দাড়ি না দেখলে। গলায় এক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা সোনা দিয়ে বাঁধান।

মধুর সংগে সহজেই পরিচয় হয় বিপ্রপদর। আলাপ-আলোচনাও হয় পথের সম্বন্ধে। সব শুনে সে একটা আশ্বাস দেয়। কিন্তু এ সব পরের কথা। এখন বিপ্রপদকে মেয়ে ছেলে নিয়ে ওপরে উঠতে হবে এবং রান্না করে খেতে হবে গরীবের বাড়ীতে। সারা দিন কত না কষ্ট হয়েছে জলপথে। বিশেষ করে বিপ্রপদর চেয়েও মালার হয়েছে খুবই অসুবিধা। তা বৃদ্ধ মধু বুঝতে পেরেছে ঠাকরুণের ভাবভংগিতে।...

বিপ্রপদ ও মালা অনুরোধ এড়াতে পারে না। ওপরে উঠতে হয়। প্রকাণ্ড একটা দেশী দালান মধুর। কতগুলি হোগলার মাদুরের ওপর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে শীতলপাটি। বেশ নরম হয়েছে তোষকের মত। ওরা গিয়ে বসল দু'-তিনখানা পাখা চলতে থাকে অনবরত। মধু

আজ সম্মানিত অতিথিদের জন্য তার সযত্নে রক্ষিত ডে-লাইটটাও জ্বালিয়ে দেয়। সে যে একেবারে চাষা-ভূষা লোক নয়, তা জানাতে চায় সগর্বে। কোঠাটার এক পাশে অজস্র লাঙল-জোয়াল, অন্য দিকে ডালায় ডালায় থরে-থরে ধান। আজ হাটে দাম কম, তাই বিক্রয় করেনি মধু। মধুর অবস্থা দেখে হিংসা হয় বিপ্রপদর। যার এতগুলো লাঙল-জোয়াল, তার না জানি ক'খানা হাল চলে। কতগুলো বলদ-মোষ খাটে!

মালা ওপরে বসে রান্না করতে চায় না। জলযোগের ব্যবস্থা হলেই ভাল হয়। অসংখ্য মেয়েলোক কপাট-জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। রান্নার সময় তারা যে কি করবে তা ভাবতেই পারে না মালা। একবার তার অভিজ্ঞতা জন্মেছে রুদ্রসেন কবিরাজের বাড়ী।

সব শুনে মধু যেন রেগে ওঠে। কি, তার বাড়ী বসে এ সব কী কথা। অভুক্ত থাকবেন অতিথি? কে আছিস, নিয়ে আয় এক জন বামুন ধরে, রাঁধতে হবে তাকে—তা সে আজ যে পয়সাই নিক এক বেলার জন্য। সারা দিন কষ্টভোগের পর আবার কি ঠেলতে ইচ্ছা করে হাঁড়ি! তারই তো আগে বোঝা উচিত ছিল এ সাদা কথাটা।

মালা বাঁচে—কিন্তু আবার দুর্যোগ ঘনায় মধুর প্রশ্নে। সদুত্তর না দিতে পারলে আজ কিসে কি হয়, বলা যায় না। এরা যেমন সরল, তেমনি নির্মম।

মালার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়। সে কি বলবে, কি উত্তর দেবে?

বিপ্রপদ গম্ভীর স্বরে উত্তর দেন, 'সর্দার, উনি ব্রাহ্মণ-কুমারী।'

'সধবা?'

উত্তরের প্রয়োজন হয় না। মেয়ে-মহল থেকে একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি ভেসে আসে। নিজের ভুল বুঝে মধু বোকা বনে যায়।

'উনি ব্রহ্মচারিণী, আমাদের স্বমতের লোক।'

'বসন?'

'ওঁরা তা মানেন না এবং তাই কখনও কেউ গেরুয়া ধারণ করেন না। আমিষ আহার করেন। গৃহে থেকে আত্মসমর্পণই ওঁদের মত।'

মতবাদটা অদ্ভুত বলেই হয়ত মধুর খুব ভাল লাগে। পাখা একটু বন্ধ হয়েছিল, নিজে উঠেই মধু হাওয়া করতে যায়। মেয়েদের এসে প্রণাম করতে বলে এবং তাদের সগর্বে বুঝিয়ে দেয়, এমন না হলে ভক্তি— ঈশ্বরকে পাওয়া কি এত সহজ। সকলের এ উদাহরণ দেখে রাখা উচিত। খুব সৌভাগ্য না থাকলে এঁদের দেখা পাওয়া এক রকম অসম্ভব।

মধু ভক্তিভরে জিজ্ঞাসা করে, 'তানার কি কেত্তন জানা আছে, কেত্তন?'

বিপ্রপদ হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। বলেন, 'জানা আছে বই কি।'

'আমরা কি শুনতি পাই তানার সম্প্রদায়ের দু'-একটা গান?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয় পাবে সর্দার। মালা, গাও তো এদের মনের মত একখানা গান।'

মালাও সোয়াস্তি বোধ করে। সে একটা ভক্তিমূলক গান ধরে দেয়। গান একটু হতে না হতেই বুড়ো কাঁদতে আরম্ভ করে অঝোরে।

বিপ্রপদর মনে দুঃখ হয় বৃদ্ধের দশা দেখে; এমন সরল লোককেও করতে হলো প্রবঞ্চনা!

খাওয়া-দাওয়ার পর মধু বলে যে, এই খালের দু'বাঁক জল ভাঁটিয়ে গেলে দেখা যাবে একখানা বড় নৌকা। একটি মুসলমান সপরিবারে বিলে যাচ্ছে। সে এমনি ধারা প্রতি বছর যায়। চাষ-আবাদ করে ফিরে আসে। মধু এই একটু পূর্বেই নিজে গিয়েছিল এবং তার কাছে জিজ্ঞাসা করে সব জেনে এসেছে। সব সে চেনে-জানে। তার জমি নাকি ঘোষাল বাবুদের জমির পাশেই। নাম তার মোবারক।

মোবারক! এই কি সেই মোবারক? বিপ্রপদ বৃদ্ধের কাছে জিজ্ঞাসা করে বিশেষ কিছু জানতে পারেন না। কারণ মোবারকের বাড়ী এ দেশে নয়। এটা তার মামা-বাড়ী। প্রতি বছর লোকটা এমনি সময় হাল-বলদ, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এখানে আসে। একরাত্রি মামা-বাড়ী বিশ্রাম করে নৌকা খুলে বিলে যায়। বিপ্রপদ ভাবেন: এ দেশেও কত মোবারকই রয়েছে! তিনি মিছামিছি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

'তা হলে আমরা কি করব, এখনি নৌকা খুলে যাব না কি?'

'না, না, তা যাতি হবে না—সকাল নাগাত যাইবেন।'

মাঝিও কথাটা অনুমোদন করে। সে প্রচুর আহার করেছে, এখন তার পূর্ণাংগ বিশ্রাম চাই, নইলে হজম হবে কেন দামী মালগুলো।

শোবার ব্যবস্থাটা মাঝিই করে। নৌকা ছোট—সে থাকবে ওপরে, গরমে একটু গা-হাত-পা ছড়িয়ে শোবে, কর্তারা থাকবেন নায়ে।

মধু বলে, 'তাই ভাল। ওনাদের শেষ রাত্তিরে ওঠা-ওঠি করা বড় অসুবিধে। মা-ঠাকরুণ কি বলেন?'

মালা আর কি বলবে? মধুর যে প্রতাপ, তাতে তার কথাই স্বীকার করা ভাল।

যাওয়ার সময় মধু বলে যে, যদি এ পথ দিয়ে ফেরা হয় তবে যেন পায়ের ধুলো দিয়ে যেতে ভুল না হয়। আর যদি বাস্তবিকই বিপ্রপদর সম্প্রদায়ের মহামিলন হয় বিলে এবং মহোৎসব হয় এই পূর্ণিমায়, সে যেন একটু সংবাদ পায়। হাজারখানা শ্রীখোল নিয়ে যাবে কীর্ত্তন করতে। মালার গান তার বড় ভাল লেগেছে, মালাকে জীবনে সে ভুলতে পারবে না—মালা তার মা।

বিপ্রপদ বলেন, 'কেঁদ না, কেঁদ না সর্দার। মায়া মোহ এড়াতে হবে, তবে মিলবে তাঁর সন্ধান।'

'তা কি পাব আমরা? আমরা যে পাপী, বিষয়-বিষ পান করেছি কণ্ঠ ভরে।'

'পাবে, পাবে। শিবও তো পান করেছিলেন এই হলাহল।'

বিপ্রপদর তত্ত্ব-কথা শুনে মালা মুখ টিপে-টিপে হাসে।

'ঐ দেখ সর্দার, তুমি কাঁদছ আর উনি হাসছেন—উনি মায়ামুক্ত।'

মধু স্বীকার করে যে, সে সত্য সত্যই অত উচ্চস্তরের জীব নয়। সে পাপী—ঘোর বিষয়ী লোক।

সকাল বেলা দু'বাঁক নৌকা বেয়ে এসে মাঝি দেখে যে, নির্দিষ্ট নৌকাখানা সে স্থানে নেই। হয়ত দেরী দেখে এগিয়ে গেছে। বিপ্রপদ দাঁড়টা জুড়ে বাইতে থাকেন জোরে জোরে টেনে টেনে। অগ্রগামী নৌকাখানা ধরতে না পারলে সর্বনাশ।

বিপ্রপদর দাঁড়ের থাবায় নৌকাটা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে। মাঝিটাও বাইছে প্রাণপণে। এক এক টানে তারা দুনো পথ এগিয়ে চলে। আর বলে, 'জোর জোর, জোর করে···প্রাণপণে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই নৌকাখানা দেখা যায়। মাঝি ও বিপ্রপদর ধড়ে প্রাণ আসে। তিনি দাঁড়টা তুলে রাখেন।

মাঝির ডাকে নৌকাখানার পিছন থেকে যে ফিরে তাকায়, তাকে দেখেই বিপ্রপদ অবাক্। এবং সেও ভয়-বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে যায়, নিজের চোখকে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। নৌকা কাছে এলে সে হালের মুঠি ছেড়ে দিয়ে আদাব জানায়। হাল ঠিক রাখার কথা তার মনেই থাকে না। নৌকাটা বেহাল হয়ে ঘুরে যায়। বিপ্রপদর মাঝিও অনুকূল স্রোতে নৌকা সামলাতে পারে না। হা-হা করতে করতে দু'খানা নৌকা টক্কর খেয়ে যায় বাঁক খালে। ধাক্কা খেয়ে এ-নৌকার যাত্রীদের সংগে ও-নৌকার যাত্রীদের সাক্ষাৎ হয়ে যায়

মুহূর্তে। এ মুহূর্তটি দু'নায়ের যাত্রীর কাছেই পরম মুহূর্ত এবং অভাবনীয়ও বটে।

বিপ্রপদ কোনও দিন আশা করতে পারেননি যে আসমানতারা ও মোবারকের সংগে তাঁর দেখা হবে! ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'টিতেও কি কখন স্বপ্নেও ভেবেছিল এ মিলনের কথা।

বিপ্রপদ লাফিয়ে মোবারকের নৌকায় চলে যান। দু'খানা নৌকাই ফের চলতে থাকে।

মোবারক বলে, 'হুজুর, ছেড়ে দিন ক্ষমা করুন আমাকে। আমি আপনার ভয়ে বাস্তভিটা বেচেছি, দেশ ছেড়েছি, তবু কি আমার ওপর গোসা রাখতে হবে!' হালের মাচায় দাঁড়িয়ে সে কাঁপতে থাকে।

'তোমার অপরাধ অমার্জনীয়—তোমাকে কোনও দিনই মাপ করতে পারব না—তাই তোমার পিছু নিয়েছি মোবারক। এখন দক্ষিণের বিলের পথটা দেখিয়ে নিয়ে চলো আমাকে। আমি তোমার পুরানো মনিব, আশা করি, তুমি আমার হুকুম তামিল করতে দ্বিধা বোধ করবে না।'

বিপ্রপদর কণ্ঠে বিষের বদলে মধু। মোবারক কিছু বুঝতেই পারে না।

যে বোঝে, সে ছইয়ের ভিতর থেকে একটু মুখ বার করে হেসে বলে, 'সেলাম হুজুর। ভাল আছেন তো?'

'বেটির আমার আদব-কায়দা ঠিকই আছে। তোর সংগে কি আর এ জীবনে দেখা হতো, খোদা দেখিয়ে দিলেন। দেখ এখন মা, খোদা আছেন কি না? ওটা কে? বাঃ! বাঃ! অবিকল আমার সেই দাদু-ভাইটা যে! মরেনি—আবার ফিরে এসেছে তোর কোলে! দে দে, আমার কোলে দে।'

আসমানতারা হাসি-মুখে নীল জামা-পরা একটি তেল-কুচকুচে ফুটফুটে ছেলেকে সসংকোচে বিপ্রপদর হাতে তুলে দেয়।

'তোর আর ভাবনা কি মা, তুই চোরটাকে এবার শক্ত করে বেঁধেছিস, কি বলিস মা ?'

আসমানতারার মুখখানা একটু সলজ্জ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এবার চোরটাও হাসতে সাহস পায়। এমন মধুর খেতাবটা কে দিত হুজুর না হলে ? এখন গত রাত্রির মধু সর্দারের কথাটাও প্রাঞ্জল হয়ে যায় মোবারকের কাছে।

ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বিপ্রপদ আদর করতে থাকেন। দু'খানা নৌকাই চলতে থাকে।

মোবারকের বড আনন্দ হয়—তার নায়ে হুজুর এসেছেন। সে বলে, 'আরে বসতে দাও না!'

আসমানতারা জবাব দেয়, 'তোমার আর চালাকি করতে হবে না—নৌকার মাঝি নৌকা বাও।'

এ সস্নেহ তিরস্কারটুকু মোবারকের বড় ভাল লাগে। তার চেয়েও ভাল লাগে বিপ্রপদর কাছে। সাধে কি ওরা পালিয়ে এসেছে শিবচর ছেড়ে!

আসমানতারা কোথায় বসতে দেবে বাবুকে ? নৌকাটা বড় হলেও চাষ-আবাদের জিনিষে বোঝাই। বলতে গেলে তিল রাখারও ঠাঁই নেই। গরু-বাছুর, লাঙল-জোয়াল, বীজধান, হাড়ি-কলসী, আরও কত রকম সাজ-সরঞ্জাম। এক এক খোপ এক একটায় জোড়া। পিছনের দিকের ছোট দু'টো খোপ একখানা হোগলা দিয়ে কোনও রকমে ছই দেওয়া। ছইর নীচে সুপারি গাছ চিরে কাজ-চালান-গোছের একটা পাটাতন তৈরী করা হয়েছে আসমানতারার জন্য। ওর একটা পাশে গিয়ে বিপ্রপদ সামান্য একজন কৃষকের মত বসে পড়েন। আজ তাঁর আর অহংকার নেই। কিন্তু আসমানতারা সংকুচিত হয়ে পড়ে।

হালের মাচা থেকে মোবারক আবার বলে, 'কি, হুজুর কিসে বসলেন, দেখ না!'

এবার আসমানতারা জবাব দেয়, 'তোমার হুজুর আমার বাপ, যেখানে ইচ্ছে সেখানে বসবেন—আমারি হুজুরের ভয় নেই অত।'

'ঠিক বলেছিস মা, ঠিক বলেছিস। ওটা মিথ্যাবাদী। আমি যেদিন ওকে আমার খাস-কামরায় ডেকে নিয়ে শাসন করলাম, বুঝিয়ে দিলাম, সেদিন ও আমাকে বললেই বা কি আর করলেই বা কি?'

আবার একটু সলজ্জ হাসিতে আসমানতারার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মোবারক বলে, 'এবার আমার সাহস হয়েছে—তাই বলছি: হুজুর কেবল নিজের মেয়ের টান টানছেন। ওই তো আমাকে বুদ্ধি দিয়ে নিয়ে এলো এই বিলে। আসামী ধরা পড়েছে, ভাল করে শাসিয়ে দিন আজ।'

'আসামী তু'জনেই। আমি কি শাসন করব! যে শাসন করার মালিক, সেই শাসন করে বেঁধে ফেলেছে এই দড়ি দিয়ে। এখন আর পালাতে পারবে না কেউ'—বলে, বিপ্রপদ শিশুরূপী রজ্জুটিকে তুলে তুলে নাচাতে থাকেন। এই শিশু তাঁর মনে কত না দোলা দিয়েছে। ডালিমবাগের সেই ঘুমন্ত বালক আজ যেন অনেক দিন পরে হেসে হামাগুড়ি দিয়ে এলো তাঁর কোলে। সেই মুখ, সেই চোখ আজ যেন নকল করে এনেছে ও। তিনি সমস্ত আত্মমর্যাদা বিস্মৃত হয়ে ঘন ঘন চুম্বন করেন এই ছোট্ট দাদু-ভাইটিকে।'

তারপর অনেক কথা হয়। মোবারক বলে যে, সে বিপ্রপদর ভয়ে বাড়ী-ঘর বেচে এখন এক ভগিনীপতির বাড়ী গিয়ে রয়েছে শিবচর কাছারীর এলাকা ছাড়িয়ে। বিলে কিছু জমি-জায়গা করেছে। মোটমাট অভাব-অনটন নেই, বেশ সুখেই চলে যাচ্ছে সংসার।

বিপ্রপদও তাঁর সমস্ত কাহিনীই ওদের কাছে খুলে বলেন। ওরা খুব দরদ দিয়ে শোনে। আজ হুজুর ও গোলামের ব্যবধান ঘুচে যায়। অসাধারণ বিপ্রপদ ব্যথা ও নির্মম আঘাতে অতি সহজে জনসাধারণের সংগে মিশে যান। চাকরী নেই, কি করে সংসার পালন করবেন, সেই অর্থনৈতিক চাপই হয়ত মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সকলের শেষে ওঠে মালার কথা। বিপ্রপদ বলেন যে, তিনি কি করবেন? আসমান-তারার মতই ওকে বাধ্য হয়ে স্থান দিয়েছেন—নিরুপায় দেখে দিয়েছেন আশ্রয়। লোকনিন্দা কিম্বা গ্লানির ভয়ে কি পথে ঠেলে দিতে পারেন? তাই তিনি মালাকে নিয়ে চলেছেন বিলে—হয়ত ঘুরে বেড়াতে হবে কত দেশ-দেশান্তরে। এ ভ্রাম্যমান জীবনযাত্রার কবে এবং কোথায় পরিসমাপ্তি, তা তিনি জানেন না। আশংকা ও ভয়ে মালা বেপথু। এ আশংকা যদি না কমে, এ ভয় যদি না ভাঙে, হয়ত চিরদিনই সে থাকবে তাঁর অনুগামিনী হয়ে—ছায়ার মত ঘুরে বেড়াবে পিছে-পিছে।

সব শুনে আসমানতারা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে। সে ভাবে, এঁদের সুখের শরীরে কি বিলের কষ্ট সইবে? এঁদের মাখনের মত দেহ যে গলে যাবে রোদে। মিছামিছি এঁরা এসেছেন বিলে কৃষাণ খাটতে। মালার জন্য আসমানতারার দুঃখ হয়—তার চেয়েও বেশী দুঃখ হয় বিপ্রপদর জন্য। রাজা এসেছেন আজ লাঙল ঠেলতে।

বিপ্রপদ উঠে যাওয়ার পর সে বসে বসে অনেকক্ষণ চোখের জল ফেলে।

মোবারক ভারি গলায়, ওপার থেকে বলে, 'কি, কথা কও না যে আসমান?'

'কমব কি! আসমান-জমিন আজ সমান হয়ে গেল, উঁচু-নীচু আর রইল না।'

আট

মালা কিছু জানে না—কিছু বুঝতেও পারে না।

এতক্ষণ তো বসেছিল, মনে মনে জ্বলছিল হিংসায়। এ কি অস্বাভাবিক আচরণ বিপ্রপদর! একটা মুসলমান মেয়েলোক, সে দেখতে যত সুন্দরীই হক, তার সংগে গায় পড়ে অত কি কথা! তার পাশে বসে হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব কি সাজে ওঁর! আবার একটা তেল-মাখা ছেলেকে কোলে নিয়ে চুমো খাওয়া, ঘন ঘন হাসি। এমন প্রাণখোলা হাসি কখনও তো হাসেননি বিপ্রপদ মালার কাছে বসে। কখনও তো এমন দিলখোলা ভাব দেখাননি তাকে। ওই কৃষাণ যুবতী তার চেয়ে কোন্ অংশে বেশী গুণবতী, বেশী আকর্ষণের পাত্রী—তা মালা ঠিক বুঝতে পারে না। এবং পারে না বলেই গুম্ হয়ে বসে জ্বলতে থাকে।

বিপ্রপদ একটা আনন্দ নিয়েই ফিরে এলেন নিজের নৌকায়। এখন সেই নির্মল আনন্দটাই উপভোগ করবেন মালাকে নিয়ে। তিনি আগ্রহে ডাকেন, 'মালা।'

মালা উত্তর দেয় না।

মালা বুঝি ঘুমিয়েছে। এই খাল-বিলের স্যাঁতস্যেঁতে জলো হাওয়ার একটা নেশা আছে। একা একা চুপচাপ বসে থাকা কি সম্ভব? যদিও মালা চোখ বুঁজে থাকে, তবুও তিনি ওকে ডেকে তুলবেন। ওরই মত একটা ভবঘুরে মেয়ের কথা ওর কাছে বলবেন। আদ্যোপান্ত শুনলে সে সব বুঝতে পারবে এবং আনন্দও পাবে প্রচুর। আজকার এই দিনটা বিপ্রপদর কাছে কম মূল্যবান নয়। এ দিনটিকে হাসি ও গল্পে মুখরিত করে রাখতে চান তিনি। তাই একজন সংগীর প্রয়োজন। তাঁর চেষ্টা ও যত্ন যে এমন ফুলে-ফলে পরিণতি লাভ করবে

এবং তা যে তিনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন—এ আশা তিনি কল্পনায়ও করতে পারেননি। আসমানতারাকে তিনি ভালবাসতেন, কিন্তু কতখানি গভীর যে সে ভালবাসা, তা বুঝতে পারলেন দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর হঠাৎ দেখা হয়ে। মা'র মুখের সেই মিষ্টি আভাটুকু আরো মিষ্টি হয়েছে মোবারকের প্রেমে ও আনুগত্যে। মোবারক গ্রামের চাষা, তবু সে ভালবাসতে জানে। সেই প্রেমের গৌরবেই তো ওকে নিয়ে পালিয়ে গেছে দূরে। এ প্রেমের মাধুর্য নায়েব বুঝবে কি, বড়বাবু এবং ঘোষালই বা বুঝবে কি! যদি বুঝত, তবে আসমানতারাকে বেশ্যা বলতে অন্তত তাদের রুচিতেও বাধত।

'মালা, মালা!' ডাকতে ডাকতে বিপ্রপদ তার একটা আঙুল ধরে টান মারেন। 'ওঠো, উঠে শোনো একটা মজার কথা।'

'আমি কিছু শুনতে চাই নে। এতক্ষণ বসে যার কাছে বলছিলেন, তার কাছ থেকে এলেন কেন? সেখানে বসেই তো বলতে পারতেন, শোনার লোক ছিল, শুনত মন দিয়ে। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

হঠাৎ এ কি পরিবর্তন! মালা এ সুরে তো কোনও দিন কথা বলেনি বিপ্রপদর সংগে। তিনি কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেন, 'অসময়ে এমন তোমার কি ঘুম পেল যে, কথাটাও শুনতে চাইছ না? না চাও, বেশ, না-ই বা বললাম তোমাকে।'

'অসময়ে না ঘুমিয়ে উপায় কি! আজ তো আর রান্না-বান্নার ঝামেলা নেই। আপনি বুঝি ঐ নৌকায়ই খাবেন—নেমন্তন্ন হয়ে গেছে বোধহয়। এখানে আর না এলেও তো পারতেন।'

'ওঃ, এই কথা।' তা পাকের জোগাড় করো না কেন? আমি তো সংগে করে কিছু নিয়ে যাইনি। শুধু হাত-পায় গেছি, আবার তাই নিয়ে ফিরে এসেছি।' বিপ্রপদ নিজের মনের ব্যথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বলেন, 'তুমি হাসালে মালা, তুমি হাসালে!'

'এত দিন আমি কেউকে হাসাতে পারিনি, সে ক্ষমতা বিধাতা আমাকে দেননি—দিলে তো এখানে বসেই হাসতেন। আমার কি কোনও গুণ আছে?'

'মালা, তুমি আজ এ সব কি বলছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? বড় মুস্কিল হলো তো। তোমার সংগে তুলনা করছ আসমানতারার? তোমার কি হিংসা করা সাজে ওকে? বলতে চাও, ও আর তুমি এক?'

'ওর কাছে গিয়ে আপনি কোন প্রবৃত্তিতে বসলেন, ঐ তেল-কুচকুচে ছেলেটিকে খেলেন একশ'টা চুমো? এ সব হিংসার কথা—না রুচি-প্রবৃত্তির কথা?'

'না। তুমি শুনবে না কিছু, তাই বুঝবেও না কিছু। সে জন্ম যদি ভুল ভেবে বসে থাকো, তবে তোমাকে কথবে কে বল তো?'

'আমি যা স্বচক্ষে দেখলাম, তার আর ভুল বোঝাবুঝির কি আছে, শোনারই বা কি আছে? নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি নে।'

'ভুল বোঝার আছে বই কি মালা! মানুষের মাথা গরম হলে চোখেও ধাঁধা দেখে। তোমার বয়স আমার চেয়ে ঢের কম, এইটা মনে রেখো।'

সহসা মাঝিটার প্রতি লক্ষ্য পড়ায় দু'জনকে এখানেই থামতে হয়। মাঝিটা চোখ কান দিয়ে যেন কথাগুলো গিলছে। সে বলে, 'মা-ঠাকরুণ, রাগ করলে হবে কি? এখন রান্না না চাপালে কল বন্ধ—জাহাজের কয়লা ফুরিয়ে গেছে!' বলে সে হাসতে হাসতে পেটের মাংসপেশী দুলিয়ে দেখিয়ে দেয়। সারা শরীরটা তার ঘামে চপ্‌চপ্‌ করছে। 'অত রাগ করেছেন কেন মা-ঠাকরুণ? বাবু মাছ কিনে দেননি, তাতে হয়েছে কি? আপনি ভাত চড়ান, আমি ধরে দিচ্ছি মাছ ডুব দিয়ে। এখানে বিলের খালে মাছের অভাব নাকি?'

'কিছু কাঠও তো লাগবে—শুকনা গাছের ডাল-টাল পাওয়া যাবে না আজ?'

'এই জন্য চিন্তা? এ কি সহর? খুব পাওয়া যাবে। আগে তাই এনে দিচ্ছি।'

মাঝিটা আবার নৌকাখানা একটা ঝাঁকড়া পিঠা-করা গাছের তলে বাঁধে। সহজেই একটা নারকেল গাছে বাঁদরের মত চড়ে কয়েকখানা শুকনা পাতা নিয়ে আসে। দা দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে দেয়। মালা ভাতের হাঁড়িটা চাল-জল দিয়ে উনুনে চাপায়।

এই দারুণ গ্রীষ্মে ঘর্মাক্ত দেহে মাঝিটা প্রায় পোয়া খানেক সরষে তেল গা-হাত-পায় মেখে ঝপ করে লাফিয়ে পড়ে জলে। অল্প সময়ের মধ্যেই দু'হাতে দু'টো চিংড়ি মাছ নিয়ে নায়ের কাছে এগিয়ে আসে। বড় বড় সাঁড়াশীর মত ঠ্যাং দেখে মালা ধরতে সাহস পায় না। সে বিপ্রপদকে ডেকে বলে, 'বাবুজী, ধরুন, ধরুন। কি সুন্দর মাছ—কত বড়-বড় ঠ্যাং।'

'মাছ কুটবে তুমি, রাঁধবে তুমি, ঠ্যাং ধরবে আর একজন? ভাল ফ্যাসাদ।' বিপ্রপদ ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে মাছ দু'টোকে অবলীলাক্রমে ধরে একটা কষা চাপ দিয়ে অকর্মণ্য করে দেন। মালা তখন নেড়ে-চেড়ে হাত দিয়ে ধরে দেখে। মাঝিটা ডুব দিয়ে আবার দু'টো তুলে আনে। কিছুক্ষণ বাদে আবার দু'টো। এত মাছ দিয়ে হবে কি? মালা বারণ করে। মাঝিটা শোনে না। সে তুলতেই থাকে একটার পর একটা। প্রায় কুড়ি দেড়েক বড়-বড় গলা চিংড়ি ধরে সে ক্লান্ত হয়। বিপ্রপদ কয়েকটা মাছ আসমানতারার নৌকায় দিতে বলেন। বাকীগুলো এখানেই থাকে।

'এমন মাছ কখনও খাওনি মালা, মাথার ঘি বড় উপাদেয় জিনিষ। ভাত যখন মাখবে, হাত তখন রাঙা হয়ে যাবে ঘি'তে—গন্ধে আমেজ কর্পূর চারদিকে। আমরা বড় ভালবাসি এ মাছ।'

'তাই বুঝি ঐ নৌকায় গেল অতগুলো। থাক, আমি তো আর ও-মাছ খাই নে। এতেই আপনাদের ছু'জনের খুব হবে।'

'ভাল জিনিষ দিয়ে-থুয়েই তো খেলে শান্তি। তুমি রাগ করবে জানলে একটাও দিতাম না কারুকে। একা ভোগ করার চেয়ে ভাগ করে কি ভোগ করা ভাল নয়? তুমি খাবে না কেন?'

মাঝিটা মাঝখান থেকে ফোড়ন কাটে। 'বাবা, আমি বলব কি, মা-ঠাকরুণ ঠিকই রাগ হয়েছেন। ধম্মের ইচ্ছায় ওর দশটা তো আমি একাই খেতে পারি। তারপর আপনি রয়েছেন—আপনাকে দিয়ে মা-ঠাকরুণের ভাগে আর থাকবে কি? উনি তো ঠিকই—'

বিপ্রপদ একটা ধমক দিয়ে ওঠেন, 'থাম থাম পেটুক দামু। অর্বাচীনের মত যা-তা বলতে হবে না তোর। সব কথায় ঠোকর মারা!'

'আচ্ছা, আমি চুপ করলাম হুজুর।'

বিপ্রপদর খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে। তিনি বলেন, 'তোমার জন্য মাত্র ছুটো মাছই রইল, খেয়ে দেখো, বড় ভাল জিনিষ।'

মালা খেতে বসে বিপ্রপদর সমস্ত প্রশংসা অগ্রাহ্য করে মাছ ছু'টোকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। সে ছইয়ের ভিতর এলে বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন খেলে?'

'ভালই খেলাম।'

বিপ্রপদ সন্তুষ্ট হয়ে শুয়ে থাকেন।

মাঝিটা আগেই খেয়ে গেছে—এখন তার নাক-ঘোঙরানি শোনা যায় দূরে একটা গাছতলায়।

এত সময় মালার সংগে আলাপ করার জন্য আসমানতারা কেবলই সুযোগ খুঁজছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে—বিপ্রপদও বিশ্রাম করছেন, মোবারকও একটু ঘুমিয়েছে। ভাটা না হলে আর নৌকা

খোলা যাবে না। আসমানতারা ধীরে ধীরে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে কূলে ওঠে, বিপ্রপদর নায়ের কাছে গিয়ে ডাকে, 'শুনছেন, শুনছেন।'

'কে ?' স্ত্রীলোকের গলা শুনে মালা একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কে গা ?'

'আমি আসমানতারা—ঐ নায়ের মানুষ। আদাব মা-ঠাকরুণ, আদাব! একটু ওপরে উঠে আসুন না—দু'দণ্ড এই গাছের তলায় ছায়ায় বসে আলাপ করি। কেমন ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া। সাবধান হয়ে আসবেন, যেন বাবুর ঘুম না ভাঙে নৌকার দোলায়।'

মালা জ্বলে ওঠে। এত দিন এ মায়া ছিল কোথায়? কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কিছু যেমন বলতে পারে না, তেমনি না উঠেও পারে না। আদাবের পরিবর্তে তাকে আশীর্বাদও করতে হয়। 'সুখী হও!'

'মা-ঠাকরুণ আমার ছেলেকে দোয়া করলেন না ?'

'কি দোয়া করব! ছেলে যেন বাপের মত হয়। তার নাম রাখতে পারে। আর কি দোয়া করব, তা তো জানি নে! তোমার কথাগুলো তো বেশ পরিষ্কার—একেবারে ও-দেশী কথা। শিখলে কোথায় ?'

এবার দু'জনকে দু'জনে ভাল করে চেয়ে দেখে। মেপে দেখে দু'জনের গুণাগুণ দৃষ্টির মানদণ্ডে। নারী যা চায়, যা পেলে পূর্ণতা লাভ করে আসমানতারা তা সর্বাংগীন ভাবে পেয়েছে। তাই যেন তার মুখের মিষ্টি আভাটুকু তাকে আরও মধুর করে তুলেছে। আর মালা যা চায় তা এখনও পায়নি—কোনও দিন যে পাবে তার আশাও নেই। তাই তার দীপ্ত রূপ যেন হাহাকার করে কেঁদে কপাল কুটছে তার দেহের ছন্দে। মালা নিজেকে হীন মনে করে আসমানতারার তুলনায়। তাই তার ওপর থেকে ঘৃণার ভাবটা কেটে যায়। ছেলেটা দুধ খাচ্ছে, আর একটা দুধ কেবলই খুঁটছে কচি আঙুল দিয়ে। আসমানতারা তার হাত যতই সরিয়ে দেয়, ততই সে রুখে-রুখে ধরে মায়ের স্তন।

সস্ত-ভাঙা পেঁপের কষের মত গড়িয়ে পড়ছে দুধ। তার পর ছুটল সহস্রধারায়। শিশু আর কত খেতে পারে, মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দিশাহারা হয়ে গেছে।

মুগ্ধ নেত্রে মালা চেয়ে-চেয়ে দেখে এই পল্লী-জননীর স্মিত বিকশিত শান্ত মূর্তি—শিশুর সুতৃপ্ত বয়ান।

'এই ছেলেটা হয়ে অবধি আমি আর সামলাতে পারি নে দুধ। এত দুধ যে কোথায় ছিল তাই এক এক সময় ভাবি।'

'ভালই তো। ও খেয়ে দেয়ে তাজা মরদ হবে—শক্ত হবে ওর হাড়।' তার পর আরও দু' একটা কথা হয়।

মালা একটা এঁটেলী গাছের পাতা সমেত কয়েকটা ডাল ভেঙে এনে ওকে বসতে দেয়, নিজেও বসে। দু'জনে পাশাপাশি বসে গল্প করে।

'তুমি তো বললে না, এমন কথা শিখলে কোথায় এ দেশে জন্মে?'

'সে অনেক কথা মা-ঠাকরুণ।' আসমানতারা একটু বিষাদের হাসি হাসে।

মালা কি বুঝে যেন প্রশ্নটা ঘুরায়। 'তোমার আরও ছেলেমেয়ে আছে, না এটি প্রথম?'

নিমিষে আসমানতারার বিগত জীবনের বিস্তীর্ণ করুণ কাহিনী মনে পড়ে। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে একটি একটি করে মালার কাছে সব কথা বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে। মালা নির্বাক্ হয়ে শোনে। অনেক দুঃখ সেও পেয়েছে, অনেক নিষ্পেষণ তার ওপর দিয়েও গেছে, কিন্তু আসমানতারার তুলনায় তা অতি নগণ্য। সমাজের কাছে তুচ্ছ তার অভিযোগ।

আজ আসমানতারার ঘরে কত ভাত। কুকুরে বিড়ালে হাঁস মুরগীতেও খেয়ে ফুরাতে পারে না। আর এক দিন এই ভাতের অভাবে পেটের জ্বালায় সে তার বুকের রক্ত বুকের ধনদের এক এক ঘরে ফেলে

এসেছে! তারা আছে, না মরেছে, না মা-মা বলে কেঁদে-কেঁদে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে তা জানে না। আজ তার জানার সুবিধা নেই—উপায়ও নেই। হতভাগিনী নিজে পেট ভরে খাচ্ছে, তারা হয়ত এক মুঠো দানার জন্য চোরের মত যার তার হাতে মার খাচ্ছে! আসমানতারা কাঁদে আর বলে তার জীবন-নাট্যের এক এক অধ্যায়। শুনতে শুনতে মালা অধীর হয়ে পড়ে। ওকে কোলে টেনে নিয়ে ঘন ঘন ওর চোখ মুছিয়ে দেয় মালা। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'আর তুই চোখের জল ফেলিস নে আসমান। মা-জানকীর চোখের জলে মজেছে কনক লংকা—তোর চোখের জলেও মজে যাবে এ দুনিয়াটা।'

বেলার দিকে চেয়ে আসমানতারা বলে, 'আজ উঠি মা, নামাজের সময় ব'য়ে যায়—এখন তো রোজই প্রায় দেখা হবে।'

'তুমি তো আমার কথা কিছু শুনলে না, জিজ্ঞাসাও করলে না?'

'বাবুর মুখে সব শুনেছি, বাকীটুকু আর এক দিন তোমার মুখে শুনব। আদাব মা, আদাব।'

বিপ্রপদর ওদের কথায় এবং কান্নায় ঘুম হয়নি। মালা নৌকায় এলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায় গিয়ে কাটিয়ে এলে এতক্ষণ?'

'ওপরে।'

'কেন?'

মালা চুপ করে থাকে। এতক্ষণ ধরে সে যে আসমানতারার সংগে আলাপ করেছে তা কোনক্রমেই বলতে পারে না।

'কি, একেবারে চুপ চাপ যে?'

'বাবুজী, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না—ক্ষমা করুন।'

বিপ্রপদ হেসে বলেন, 'এখন তো বুঝলে মালা—আমার চেয়ে তোমার বয়স ঢের কম।'

সময় মত আবার দু'খানা নৌকাই চলতে থাকে ভাটার টানে এগিয়ে।

মোবারক হালের মাথায় দাঁড়িয়ে হাল ঘুরাচ্ছে—মাঝিটা বেয়ে চলেছে পিছে-পিছে। গ্রামের পর কত গ্রাম পার হয়ে চলেছে ওরা ঘুরে-বেঁকে-সোজা হয়ে খালের গতির ছন্দে! অপরাহ্ণ বেলা ক্রমে ঢলে পড়ে সায়াহ্নের দিকে। কত পাখীর পরিচয় মালা জিজ্ঞাসা করে, কত গরু-মোষের বাথানের দিকে বিস্মিত হয়ে সে চেয়ে থাকে।

অবশেষে বহু-বাঞ্ছিত দক্ষিণের বিল দূরে দেখা যায়।

মোবারক বলে, 'এই যে গাঁ-টা এর নাম শেখের গাঁ। এর পর শুধু মাঠ ধু-ধু করছে—সবুজ মাঠ। মাঠের দক্ষিণে খানিকটা জ'লো জমি। পাঁচ-সাত হাত জল আছে এখনও। তারপরই ঐ যে দেখছেন ঘন গাছ-গাছলি একেবারে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে—ঐটা সুন্দরবন। এটা নামে দক্ষিণের বিল, কিন্তু কাজে ধানী জমি। আগে এ অঞ্চল জুড়ে শুধু বিলই ছিল। এ সব জমি ছিল জলের নীচে। পাঁচ-সাত-দশ হাত জল ছিল এখানে। শাপলা-শালুক-পদ্ম ফুল জন্মাত শুধু। তখন কে ভেবেছে এই বিলে হবে ধান, এখানে আসবে মানুষ।'

মালা আনন্দে উঁচু-গলায় বলে, 'দেখুন, দেখুন, কেমন জলের রং বদলাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। ঘোলা জল কালো হয়ে গেল এই ছোট খালটায় এসে। বাঃ! ক্রমে আরও কালো। একেবারে কালো!' মালা নৌকার পিছনে বসে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত শাড়ীখানা তুলে তার পা দু'খানা জলে ডুবিয়ে ধরে। কি পরিষ্কার জল, যেন টল্‌টল্ করছে ডালিমের দানার মত। জলের নীচে কত লতা পাতা! কি নাম ওগুলোর সে তা জানে না। কে জানে। তাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে। কত যে নাম-না-জানা মাছ সাঁতার কাটছে। একবার আসছে, খানিকটা অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকে আবার ছুটে পালাচ্ছে। নৌকাটা দেখেই ভয় পেয়েছে বুঝি, মালাকে দেখে নয়। ওদের কাছে নৌকাটা একটা দৈত্যের মত। অতটুকু প্রাণীরা ভয় করবে না! কত বিচিত্র রং ওদের গায়-পাখনায়-কানলায়!

মালা দু-একটা ধরতে চায় হাত বাড়িয়ে। ধরা কি এতই সোজা! ওরা সহজেই এড়িয়ে যায় মালার আঙি। সে এমন একটা জলের লতা পা বাধিয়ে ছিঁড়ে আনে যে তার পাতাব বর্ণালী দেখলে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে থাকতে হয়। মালা তার চাঁপা রঙের আঙুলে লতাটা জড়িয়ে পাতাটার দিকে চেয়ে থাকে। কি সুকোমল স্পর্শ! কি অভিনব বর্ণবৈচিত্র্য। এমন একটা পাতা কি তুলি দিয়ে রং ফলিয়ে আঁকা যায়। না, না কিছুতেই পারা যায় না। মালা তো পারেই না। কেউ পারে কি না তাও সে জানে না। মালা পা নাচায়। জল ছলছল করে উচ্ছল হয়ে ওঠে। এখানে খালটায় পরিসর খুবই কম—একটানা সোজা। এর শেষ কোথায় তা দেখাই যায় না চোখে। দূরে মাঠের মধ্যে হারিয়ে গেছে এর সীমা-রেখা। মালা কপালে একটা হাত দিয়ে ঠাহর করতে চেষ্টা করে কত দূরে গিয়ে শেষ হয়েছে খালটা। মাঝি বলে যে, এটা মানুষের হাতে-কাটা খাল। বিলের জল-নিকাশের জন্যই না কি এর জন্ম। বিশ্বাস হয় না মালার। বলতে গেলে সে এক প্রকার মরুভূমির দেশের মেয়ে। সে এত দিন শুধু দেখছে ধূ-ধূ করা উষর ধূসর বালুকাময় প্রান্তর। হয়ত তার মায়া-মরীচিকাও দেখেছে সে—তাই তার আত্মা তৃষ্ণাতুর। এখন সে চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে বুক দিয়ে—সমগ্র দেহ দিয়ে পান করে নেবে এই সুজলা সবুজ প্রকৃতি। সে চেয়ে থাকে মাঠের দিকে। চারদিকে নধর সবুজ ঘাসে ডুবন্ত মাঠ। এখানে এত ঘাস, আর পশ্চিমে তাদের দেশে খাঁ-খাঁ করছে তৃণহীন গেরুয়া জমিগুলো। এগুলি সবই না কি ধানী জমি, বর্ষা ঘনিয়ে এলে একাকার হয়ে যায় জলে। শুধু থাকে ঐ টিলা-টিলা বাড়ীগুলো—কৃষকদের অস্থায়ী ছোণ-খড়ে ছাওয়া বাসা। আর থাকে গম্বুজের মত খড়-কুটোর গাদাগুলো। তার উপর এসে বসে সাদা কালো হলদে পায়রার ঝাঁক। খুঁটে-খুঁটে ধান খায়। হঠাৎ আকাশে যদি একটা প্রকাণ্ড বাজ দেখা যায়—ফুর-ফুর করে উড়ে পালিয়ে যায় ভীরু পায়রার দল।

আবার মালা চেয়ে দেখে তিনটা রাঙা শাপলা ভাসছে জলে। যে দু'টো ডাইনে-বাঁয়ে—তারা ফুট্‌ব ফুট্‌ব করছে, মাঝেরটা ফুটেই গেছে একেবারে। চলন্ত নৌকা থেকে মালা হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে আনে একটা আর দু'টো পড়ে থাকে দু'পাশে। কেমন সুন্দর হলদে রেণু ফুলটার বুকে। কত মোলায়েম। কি সুকোমল ওর ছোঁয়া। সে নিজের নরম গালে ধীরে ধীরে মাখে, একটু মিঠা গন্ধও আসে যেন।···মালা না-বলে কখন যেন নেমে পড়ে জলে। নৌকাটা দুলে ওঠে। আতংকে বিপ্রপদ শিউরে ওঠেন। মাঝি নৌকা থামায়। এখানে জল খুব কম—কোন ভয় নেই। সে নৌকা ঘুরিয়ে মালার কাছে গলুই এগিয়ে দিতে চায়। মালা নিষেধ করে। সে স্নান করে নেবে। বড়ই গরম বোধ হচ্ছে তার। সে ইচ্ছা মত ডুব দেয়, সাঁতার কাটে—হাসে অহেতুক হাসি! অবসর বুঝে মাঝিটা বসে বসে এক ছিলিম তামাক খায়। লগি ঠেলতে ঠেলতে সে-ও ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। মালা একখানা শাড়ী চায়। শাড়ীখানা দিতে গিয়ে বিপ্রপদর মালার অপাংগে দৃষ্টি পড়ে। চোখ দু'টো নিমিষে ক্ষুধিত হয়ে ওঠে। তিনি দ্রুত ছইয়ের ভিতর চলে আসেন। মালা নৌকার পিছন থেকে ধীরে ধীরে শাড়ীখানা নিয়ে কূলে ওঠে। উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সে কাপড় বদলায়। অবশেষে হাসিমুখে নৌকায় ফিরে আসে। তখন দিগন্তের ছইয়ের আড়ালেও সূর্য অস্ত যায়—তার রাঙা-ক্ষুধা যেন ছড়িয়ে থাকে সারা প্রকৃতির দেহে।

'তোমার জমি ও আমার জমি কতটুকু তফাৎ মোবারক ?'

'প্রায় মাইলটাক হবে।'

'এখন আর কত দূর, কত সময় লাগবে যেতে ?'

'আমি তো দেখতে পাচ্ছি আমার বাসা হালের মাচা থেকে, কিন্তু যেতে এখনও ঘণ্টা তিনেক লাগবে।'

'দেখা যাচ্ছে না কি ?' বিপ্রপদ সাগ্রহে বেরিয়ে আসেন গলুইর দিকে। 'সত্য না কি, তোমার বাসা দেখা যাচ্ছে ?'

'হ্যাঁ হুজুর।'

হঠাৎ বিপ্রপদ যেন আঘাত পান। বলেন, 'মোবারক, একটা কথা বলি। আর হুজুর বলে আমায় ডেকো না। নেহাৎ কিছু না বলে উপায় নেই তাই শুধু বাবু বলেই ডেকো—বোসমশাই তোমাদের মুখে আসবে না, তাই আর আমি বলব না। বাবুর অতিরিক্ত কিছু বললে আমি দুঃখিত হব। আমি মিশতে এসেছি তোমাদের সংগে—তোমরা আমার গত জীবনের বাহুল্যটা বাদ দিয়েই মিশিয়ে নিও। তা না হলে বুঝব, তোমরা আমায় ভালবাসতে পারনি, চিনতেও পারনি।'

মোবারক চুপ করে নৌকা বাইতে থাকে। রাত হয়ে আসে।

কিছুক্ষণ বাদে বিপ্রপদ আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'আর কত দূর মোবারক ? এখনও কি তিন ঘণ্টা হয়নি ? রাত তো কম নয় এখন।'

'বাবু আর অল্প একটু পথ, জল কম, ধীরে ধীরে নৌকা চলছে, তাই সময় লেগে গেল বেশী।'

বিপ্রপদ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। তাঁর আর বিলম্ব সহ্য হয় না। কতক্ষণে আসবে তাঁর স্বপ্নে-ভরা বিল! কতক্ষণে তার মাটির ছোঁয়া লাগবে তাঁর দেহে। দীনহীন বালক যেমন মূর্তিমতী দাক্ষিণ্যের আশায় চেয়ে থাকে তেমনি তিনি সুমুখের দিকে চেয়ে বসে থাকেন। যারা বিলের দিক্ থেকে ছোট ছোট ডোঙা ঠেলে ঠেলে পাশ কাটিয়ে যায়, তাদের কাছে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'ঘোষাল বাবুদের জমি আর কতদূর, তোমরা ভাই বলতে পারো ? বলতে পারো আর কতক্ষণ লাগবে যেতে ?'

সকলেই জবাব দেয় যে, তারা ঘোষাল বাবুদের কখনও দেখেনি। তবে জানে না কি তারা যে জমি ভোগ করত মিথ্যা একটা কবলার জোরে এক-জন বিধবাকে ঠকিয়ে সেই জমির সত্যিকার মালিক এবার এসেছেন। নাম

জানি তাঁর কি বাবু, বাড়ী যেন কোন দেশে। এখন থেকে সে জমির নাম হলো 'বাবুর বিল', বাবুর লোক-জন-কৃষাণ-লেঠেল-মজুর মিলে দখল করে বসেছে সে বিল চারদিক ঘিরে। ঘোষালদের নাম করে যে ওখানে মাথা গলাতে যাবে সে আর প্রাণে বেঁচে আসবে না। সাবধান হয়ে যাবেন মশাই, খুব সাবধান কিন্তু। শেষকালে তারা বিপ্রপদকে উপদেশ দিয়ে যায় যে, তাঁর মত ভদ্রলোকের ওখানে না যাওয়াই ভাল—আবার সংগে যখন জেনানা রয়েছে।

প্রায় দেড় প্রহর রাত্রে যেখানে এসে নৌকা থামে সেটা মোবারকের বাসা। সে বলে যে, এখন একা যেতে হবে বিপ্রপদকে এগিয়ে। তার নৌকায় আর পুরুষ মানুষ নেই যে, তাকে পাহারায় রেখে সে বাবুকে এগিয়ে দিয়ে আসবে। তবে এখন আর পথের কোনও জটিলতা নেই। ঐ যে বন্যা গাছটাকে আশ্রয় করে সহস্র সহস্র জোনাকী জ্বলছে, ঐটাই বিপ্রপদর বাসা। আর কেউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে ঐ গাছটার তলায় নৌকা ভিড়ালেই চলবে।...

অবশেষে নির্দিষ্ট স্থানে এসে নৌকা থামে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার। চোখে বিশেষ কিছু ঠাহর পাওয়া যায় না। টিলা একটা একটু দূরে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাও অস্পষ্ট। একটা ছোট ঘরও তার ওপর আছে বুঝি। একটা ঘোমটা-দেওয়া বৌ ঘরের কোণে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত রাত্রে এ বৌটি এলো কোত্থেকে। না, ও তো বৌ নয়। অপদেবতা না কি? হঠাৎ ঝম ঝম করে ওঠে সকলের শরীর। পর মুহূর্তেই বিপ্রপদ বুঝতে পারেন তাদের দৃষ্টির ভ্রম ঘটেছে। একটা কলা গাছের কচি পাতা ঘোমটার মত বেঁকে রয়েছে।

অন্ধকারে সকলই অস্পষ্ট। শুধু এইটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সব ঘুমে অচৈতন্য। এতগুলো মানুষজনের সাড়া-শব্দ নেই। এরা চমৎকার বিল দখল করতে এসেছে! এদের বাহবা না দিয়ে পারা যায় না! পাহারা

দিতে এসে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে দিল্লীর বাদশার মত। এখন এক দল শত্রুপক্ষের মানুষ এলে কি হবে ? এদের নাকের ডাক শুনে তারা কি ভয়ে-ভয়ে সেলাম দিয়ে পালিয়ে যাবে ? এত যাদের ঘুম তাদের এত দূরে বিদেশে না এসে বাড়ী বসেই ঘুমান উচিত ছিল। খুব দায়িত্বজ্ঞান নিতাই এবং ইমামের। সেনাপতি দু'টি ভালই জুটেছে।

বিপ্রপদ অসন্তুষ্ট চিত্তে ওপরে ওঠেন। অমনি চারদিক থেকে চারটা ন্যাজার ফাল এসে তাঁর চারদিকে থামে।

'কে ? বাবু, আদাব।'

বিপ্রপদ এদের অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হন। এই তো তিনি চান।

'ইমাম কোথায় ?'

'পশ্চিমে।'

'নিতাই ?'

'উত্তরে।'

'তোমরা ?'

'পুবে আছি।'

'দক্ষিণে ?'

'সুন্দর বন, জ'লো জমি।'

'বেশ ব্যূহ রচনা করেছ। ওরা এলেও আর পথ পাবে না ভিড়তে।'

'জান থাকতে না।'

অনায়াসে বিল দখল হয়ে যায়। এত যে লাঠি-সোটা অস্ত্রপাতির আড়ম্বর, কিছুরই দরকার হয় না। সপ্তাহ দুই বাদে বিদেশী লেঠেলেরা কিছু ইমাম বকশিশ নিয়ে বিদায় হয়ে যায়। ওদেরও তো সংসার আছে, মা-বোন-গরু-বাছুর-হাল-হালুটি। আবার ডাক দিলে ওরা আসবে, বাবুর কথা ওরা ভুলবে না। কারণ ভোলার মত ব্যবহার বিপ্রপদ করেননি। বিদেশে বিভূঁইয়েও রোজ দু'-দুটো ছাগল জবাই দিয়ে খাইয়েছেন। নারকেল-গুড়-চিনি-বাতাসার দিকে তো দৃক্‌পাত করেননি —যে যত পেরেছে, নিয়েছে, খেয়েছে। লম্বা-লম্বা টালাই নৌকায় ওরা খঞ্জরী বাজিয়ে গান গেয়ে কবিতা রচনা করে বিপ্রপদর যশ চারদিকে ছড়াতে ছড়াতে চলে যায়। তাদের নাচ-গান, ঢাল সড়কি নিয়ে আস্ফালন দেখে তো মালা অবাক। গান সেও জানে, কিন্তু এমন অদ্ভুত জারী ও কবিগান সে কখনও শোনেনি। ছন্দ-তাল-মান আছে কি না আছে, তার থেকেও নজরে পড়ে ওদের স্বভাব-সুলভ কবিত্ব ও আস্ফালন। যাওয়ার সময় মা-ঠাকরুণকে আদাব না জানিয়ে কেউ নৌকায় ওঠে না। মালাও হাত তুলে ওদের সেলাম জানিয়েছে—মনে-প্রাণে করেছে দোয়া। ধীরে ধীরে এমনি করে মালাও এদেশী আদব-কায়দা শিখে নিচ্ছে। তাই পান-তামাকের তহবিলটা নিজের হাতেই গুছিয়ে রাখে। কেউ এলে চাওয়ার আগে তা বের করে দেয় নিত্য দু'বেলা। এখানে এই বিলে এসে এত পান-তামাক কেউ কোনও দিন বিলায়নি। কিন্তু বিপ্রপদ খোলা হুকুম দিয়েছেন ঐ জিনিষটা বিলাতে। এর নীচে একটা বৈষয়িক স্বার্থ আছে। তিনি এখানেও নিজেকে প্রচার করতে চান। দূর-দূরান্তরে কৃষকদের বাসায়-বাসায় ছড়িয়ে পড়ুক তাঁর খোলা হাত, উদার

অন্তঃকরণের কথা। এ কথা একদিন তাঁর বিল দখলের অনুকূলেই আসবে—এবং তখন সুদে-আসলে উঠে আসবে পান-তামাকের দাম।

বিপ্রপদর ঘরখানা মন্দ হয়নি। একখানা বেড়া দিয়ে দু'টো ভাগে বিভক্ত করা মেটে ঘর। মালা লিপে-পুঁছে নিতে পারে না ঠিক মত। এ অভ্যাস তার নেই। বিশেষত মেটে ডোয়া ও মেঝে কি করে কেটে চেঁছে সমান করে লিপতে হয়, সে তা জানে না। তাই আসমানতারা এসে সাহায্য করে যায়—মালাকে যায় হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে। বার-বার ভুলচুক হলে মুখ-ঝামটাও সে মারে। মালা হাসে, বলে, 'কি জানি ভাই, তোমার মত যেন পারি নে।'

'তা হলে সংসার করবে কি করে মা-ঠাকরুণ?'

মালার সংসার না খেলার সংসার! সময়তে তার হাসি পায়, সময়তে হয় দুঃখ। আবার কখনও হয়ত ভাবে, কার যেন ন্যায্য অধিকারে ভাগ বসাতে এসেছে। সে যদি আসে, তখন কি হবে? হয়ত আসবে না, হয়ত আসতে পারে, তখন কোথায় যাবে মালা, কোন্ কোণায় পাবে ঠাঁই! সময় সময় এখন একটু মালা ভাবে এবং সময়তে গাঢ় হয় সে চিন্তা।

কমলকামিনীকে সে দেখেনি। লোকের মুখে যা শুনেছে, তা-ই সম্বল করে নিজের মনে একটা চিত্র এঁকেছে তাঁর। সে চিত্রের কাছে মুখ দেখাতে সাহস হয় না মালার। জীবন্ত মানুষটি এক দিন যদি এসেই পড়ে, তবে উপায় হবে কি? তার তো এখানে লুকোবারও স্থান নেই, পালিয়ে যাওয়ার মতও অবস্থা নয়। এদেশী কৃষকরা প্রায় সকলেই তাকে চেনে। যারা চেনে না, তারা নাম শুনেছে লোকের মুখে-মুখে। কেউ জানে মালা বিপ্রপদর আত্মীয়া, কেউ জানে পরিচারিকা। বেদিয়া-জীবনে তার কোনও পরিচয় ছিল না। এখন এমন একটা পরিচয়-লিপি তার ললাটে অংকিত হয়ে গেছে যে, তার আর পথে নামার উপায় নেই।

নামলে, অমনি সহস্র প্রশ্ন তীক্ষ্ণ তীরের মত তার বুকে এসে বিঁধবে। সকলেই বলে, এখানে এক দিন বড়মা আসবেন—তিনি আসতে না চাইলেও তাঁকে জোর করে তারা নিয়ে আসবে, যখন পৌষ মাসে উঠবে সোনার ধানের অফুরন্ত পালা। তখন মালা কি জবাবদিহি করবে তাঁর কাছে, জোর করে বলার মত কি সম্বল তার আছে? কেন সে এখানে? কি প্রয়োজন তার বিপ্রপদর কাছে? এ সব প্রশ্নের কোনই তো যুক্তিযুক্ত উত্তর সে জানে না। তাই নিরুত্তরে অবনত মুখেই দাঁড়িয়ে সইতে হবে লাঞ্ছনা, সইতে হবে যত গঞ্জনা—যেমন করে ব্যভিচারিণী কন্যাকে সইতে হয় মাঁ'র সুমুখে দাঁড়িয়ে সুতীক্ষ্ণ তিরস্কার। মালার রক্ত হিম হয়ে আসে, মুখ হয় পাংশু।

এই কিছু দিন পূর্বেও মালা বিপ্রপদর সংগে সংগে ঘুরে ঘুরে জমির চারদিকের সীমানা দেখে এসেছে। নিতাই ইমামের কাছে বালিকার মত প্রশ্ন করেছে কত। ঐ যে সুন্দর বন, ওখানে যাওয়া যায় কি না? বাঘ ভালুক থাকলে তারা বিলের মানুষ ধরে-ধরে খায় না কেন? হরিণের পাল কখন্ জল খেতে আসে নদীর ধারে? তা এক দিন তাকে অবশ্যই দেখাতে হবে। বুনো হাঁস তাকে একটা ধরে দিতেই হবে। একটা টিয়া সে পুষবে। এই সেদিনও সে হাততালি দিয়ে বিলের পাখী একা একাই গিয়ে উড়িয়ে দিয়ে এসেছে। বাসা থেকে কত দূরই বা বিল। কয়েক বিঘা জমি—একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে এড়ো পাড়ি দিলেই হলো। কিন্তু আজ তার মন ভেঙে গেছে, কিছুই ইচ্ছা করছে না যেন। শুধু ভাল লাগে ঘরে বসে থাকতে। কাজও রয়েছে কত, কিন্তু কে করে সে সব! মনই বসছে না। দক্ষিণের বিলে এসে মালার মনে একটা পরিবর্তন এসেছে—সংঘাত চলছে খুবই।

'বীজ ধানগুলো দাও না, বসে বসে বাঁধি—ভালো তো এলো বলে। এখানেও কিছু বীজ করা ভাল. দেশী বীজে কাজ না-ও হতে পারে।

অত দূর থেকে তুলে আনতে-আনতে হেজে মরে যেতে পারে। তা হলে সর্বনাশ! তাই এখানে কিছু ধান ফেলব ভাবছি, বীজ-ধান। অন্ততঃ কুড়ি-বাইশ বিঘে জমিতে আউশ না দিলে খরচ-পত্তর কুলাবে কেন, পোষাবে কেন এত ঝামেলা। আমি হিসেব করে দেখেছি, এই ধানের দামেই জন-মজুরের মজুরী পুষিয়ে যাবে, লাভের অংকে থাকবে আমন ধান। অবশ্য যদি মামলা-মকর্দমা এবং আপদ-বিপদ কিছু না আসে। সে আশংকা তো আমাদের যথেষ্টই রয়েছে!'

মালা একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছিল, বলল, 'ডালাই' বা কি আর 'জো'-ই বা কি—জানলে আমিই তো পারি ও-সব করতে।'

'পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত 'ডালা'—তিথির বাকী দিনগুলোকে 'জো' বলে। 'ডালায়' নদীর জলের গতি থাকে মন্থর, 'জো' পড়লে আবার ফেঁপে-ফুলে ওঠে জল। একবার দেখিয়ে দি, তা হলে প্রত্যেক বাবই তুমি ধান বাঁধতে পারবে। কিন্তু তুমি কি এখানে মন বেঁধে থাকতে পারবে এই চাষা-ভূষোর মধ্যে? তোমার মুখ অমন দেখাচ্ছে কেন, মনটা বুঝি ভাল না?'

'কেন, আমার মন-খারাপ হতে যাবে কিসের জন্য? বলুন না, কি কি লাগবে, এনে দিচ্ছি এক্ষুণি। কাজ কিছু না থাকলে মানুষের কি এমনি বসে থাকতে ভাল লাগে, না মন তার ভাল থাকে?'

'আচ্ছা, তবে কাজ দিচ্ছি, করো। একবারেই হিসাব করে বলছি কি কি লাগবে আমার। ধান ডালা কলার কচিপাতা দা দড়ি।'

'আর কিছু?'

'না।'

মালা একবারে সব গুছিয়ে নিয়ে আসতে পারে না। একটা একটা করে এনে বিপ্রপদর হাতে দেয়। বিপ্রপদ ধরে ধরে তা নামিয়ে

রাখেন। সব দেওয়া হলে সে বলে, 'এখন আমি যেতে পারি? সব পেয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ, তুমি তোমার কাজে যেতে পার—সবই তো পেয়েছি।'

কিছুক্ষণ বাদে আবার মালার ডাক পড়ে, 'একটু শুনে যাও, মালা!'

মালা আসতে আসতে বলে, 'আমি তো শুনব না—আপনার তো কিছুর আর দরকার নেই। এই একটু আগেই না বললেন—সবই পেয়েছেন। যাই, আমার রান্নার জোগাড় করতে হবে। বেলার দিকে একবার চেয়ে দেখেছেন?'

'কোনও জিনিষের দরকার নেই বটে, কিন্তু মানুষের তো দরকার আছে এবং চিরদিনই তা থাকবে, না হলে কাজে যোগান দেবে কে? এখন এই ধানগুলো ঝেড়ে দাও কুলো এনে।'

'বাইরের কেউকে ডাকলে হয় না?'

'ঘরের কাজ বাইরের লোক দিয়ে হবে কি করে? তা হয় না মালা, হয় না।'

অমনি একটু উত্তরের আশায় বিপ্রপদকে মালা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা কথা বলে এবং তা শুনে ও যে কত খুশী হয়। একটু আগেই ওকে যে চিন্তায় অভিভূত করে রেখেছিল তা ওর মন থেকে মুছে যায়। হাসিমুখে বিপ্রপদকে সাহায্য করতে থাকে সকল কাজে। কোনও চিন্তাই—যত বেদনাদায়ক হক না কেন স্থির হয়ে দানা বাঁধতে পারে না মালার মনে।

'নিতাই, ঘোষালেরা এলো না, এন্তেজদ্দিকেও পাঠাল না, সব চুপ-চাপ—এর মানে?'

'মানে একটা বাবু আছেই। আমাদের নিঃসন্দেহে বসে থাকলে চলবে না। ওরা একটা চাল চালবেই, তা এ নাগাদ চালুক কি ফসল পাকার সময়। ওরা পাত্তর কম নয়।'

'হ্যাঁ, শয়তানেরা তিন ভাই যখন পিছনে রয়েছে, তখন আমারও সন্দেহ হয়। বসে বসে কি যেন একটা ফন্দি আঁটছে।'

'বাবু, আপনি ঠিক ধরেছেন। ঘোষালেরা আপাতত কিছু টাকা ফাঁকি দিয়ে তুলে নিয়েছে বটে, কিন্তু এস্তেজদ্দিকে একবার পাঠাবেই এখানে। তারা দূরে বসে কল টিপবে, সামনা-সামনি হবে না। এস্তা আসবে টাকার মায়ায়। ওটা তো হার জিত হিসেব করবে না।'

'আবদুল রহিম, ওই জান-খালাস তিন ভাইর হালের বলদ ঠিক আছে তো? এক টুকরা জমিও যেন 'খিল' না যায়। চাষ করে যেমন তেমন করে বীজ লাগাতে হবে দখল-স্বত্ব প্রমাণের জন্য, বুঝলে—এ সব আইনের কথা।'

'সেদিন দেখি আপনি বললেন কিছুই জানেন না—এখন দেখছি সব, আপনি গুরুমশাই এ সব কাজে।'

'চাষ-আবাদের বিষয় এখন পর্যন্ত তেমন ভাল হয়ত বুঝি নে, কিন্তু আইন-আদালতের কথা জানব না কেন?'

'বিদ্যে যখন পেটে আছে, তখন ওটাও আমাদের চাইতে বেশী বুঝতে পারবেন দু'-এক বছরে।'

'অসম্ভব কি! শিখলে সবই পারা যায়। দেখ না, তোমাদের মা-ঠাকরুণটি এর মধ্যেই কত কাজ শিখে নিয়ে অনায়াসে করে যাচ্ছে।'

'তাই তো বললাম: লেখাপড়া জানা লোক গায় লেখা থাকে না—তাঁধা করলে সহজে সব পারে।'

'একটা খবর বাবু শুনলাম। শুনে মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল। গো-মড়ক না কি লেগেছে বিলের আস-পাশ গাঁয়ে।'

'তাতে আমাদের কি?'

'জানেন না, এ রোগ বড় ভয়ানক রোগ। একবার একটার হলে খানকতক কাবার। বড্ড ছোঁয়াচে ব্যামো, বিলে আসছে কতজন। ঐ

রোগের উৎপাতে আমি সারা হয়ে গেছি। আমার একার কথা বলি কেন—আমার মত ছোট-খাট গেরস্থ সকলেরই এক দশা। লম্বা সুদে টাকা ধার এনে গরু কিনলাম, সেই গরু যদি একটা বছরও না টেঁকে তবে বলুন তো কি সর্বনেশে কথা?'

'চিন্তার কথাই নিতাই। এক-একটা বলদের দাম তো কম না। তুমি যে রকম বলছ, তাতে আমার মনটা বড খাবাপ হয়ে গেল। এই হালের বলদ ক'টি এখন আমাদের প্রাণ। যখন সন্ধ্যে বেলা ওদের দিকে চেয়ে দেখি তখন আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। বুকে যে কত বল পাই তা বলব কি। ওদের যে ভালবাসি তা ওরা ভাল করেই বোঝে। তাই ওদের পাশ দিয়ে আমাকে হেঁটে যেতে দেখলেই ওরা এমন করতে থাকে যে বাধ্য হয়ে দাঁডাতে হয়। শুনতে হয় ওদের অভাব অভিযোগের কথা। কেউ ঘাস নাগাল পাচ্ছে না, কারুর দড়িটা একটু ঢিলে করে দিতে হবে, না হলে শুতে পারছে না—এই সব ছোট-খাট নালিশ—এ কি না শুনে উপায় আছে? কে বলে ওদের বোবা—ওদের চোখে মুখে কত ভাষা—সে ভাষা শিখতে হয়, দরদ দিয়ে বুঝতে হয়। তোমরা শিখেছ, বুঝেছ বলেই তোমাদের গরু-বাছুরের জন্য এত মায়া।'

'ওগুলো টাকার মাল বাবু, মায়া না হয়ে উপায় আছে? টাকা দিয়ে কাঠের জিনিষ কিনলেও মায়া হয়, আর ওরা তো হেঁটে চলে বেড়ায়!'

'তা ঠিক নিতাই। আচ্ছা যে রোগের কথা বললে তার কি কোনও ওষুধ নেই?' বিপ্রপদ একটু চিন্তা করে ফের বলেন, 'নিতাই, এর জন্য ত জেলাবোর্ডে মাইনে করা সরকারী ডাক্তার আছে, তারা আসে না সে সময়?'

'আসবে না কেন? এক জন্ ডাক্তার, এলাকা তার একটা জেলা। বর্ষাকালে খবর দিলে শীতকালে আসে।'

'অথচ এই বোর্ডের ব্যয় চলে আমাদের তোমাদের পয়সায়। ওদের জন্যও কি কম টাকা বরাদ্দ হয় না কি বছর বছর? ওরাও এক একটা জাঁদরেল হাতী। জলে বর্ষায় তোমার আমার বাড়ী আসবে কেন, তার চেয়ে সহরে বসে মেম সাহেবদের কুকুরের চিকিৎসা করে, কুকুরগুলো মরলে মেম সাহেবদের উপায় হবে কি? নিতাই এ কথার অর্থ ঠিক বোঝে না।'

'আমাদের ওষুধ বলেন, ডাক্তার বলেন—ঐ ভগবানই সব। ওঁর নাম ছাড়া গতি নেই। সেবার আমি একে একে দশ বার গরু কিনেও জমি চাষ করতে পাবলাম না—জমি গেল এক রকম খিল। সেই বছরের দেনাযই আমি তক্তসারা হয়ে গেছি। নইলে আমার বাড়ীতে উঠত টিনের ঘর। যাক, সে কথা ভেবে হবে কি। ঈশ্বরেব মার দুনিয়ার বার। তিনি আবার দয়া করলে এড়িয়েও যেতে পারি।'

বিপ্রপদ চিন্তিত মনে জবাব দেন, 'তা ছাড়া আর উপায় কি?'

মালাকে একটা টিয়া এনে দেওয়া হয়েছে, ময়নাও একটা কিনে আনা হয়েছে তার জন্য। একটা হরিণের বাচ্চাও তার চাই—তবে দু'দিন বাদে দিলেও চলবে। সে এগুলো পুষবে। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে সে করবে কি। ওদের নিয়ে হৈ-চৈ করবে। সময় কাটাবে ওদের নিয়ে। এখন তবু কাজ আছে, বাইরেও বেড়ান যায়। কিন্তু বর্ষা যখন গাঢ় হয়ে নামবে, ক্ষেত-খামারের কাজ সারা হয়ে যাবে, জল থৈ-থৈ করবে সারা মাঠে—এ-টিলা থেকে ও-টিলায় যাওয়া যাবে না নৌকা ছাড়া—তখন দীর্ঘ দিনের অবসর কাটাবে যাদের নিয়ে তাদের সংগে একটু আগেই পরিচয় হওয়া ভাল। তাই বিপ্রপদ একে একে জোগাড় করে দিয়েছেন এ সব। তিনি নিপুণ কারিগর, একটা জালা বাঁশের সরু শলা চেঁছে সুন্দর দু'টি খাঁচা তৈরী করে দিয়েছেন মালাকে। নারকেলের

মালা চেঁছে বানিয়ে দিয়েছেন চারটা বাটি। তিনি চান ওকে ওর মনের মত খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে। অতটুকু একটা মেয়ে, সংগী নেই, সমবয়সী নেই—পুরুষ মানুষের কাজের যোগান দিতে কতক্ষণ আর ভাল লাগে ওর। স্নেহের আতিশয্যে সময়-সময় ওকে ওর বয়সের চেয়েও অনেক ছোট করে দেখেন—অহেতুক মমতা জন্মে ওর জন্য।

মালা টিয়াটাকে যা শিখাবে, ময়নাটাকে তা শিখাবে না। পৃথক্ পৃথক্ ভাষা শিখবে তু'টোতে। টিয়াটা আওড়াবে বাংলা বুলি, ময়নাটা হিন্দুস্থানী। একটা এসেছে যেন বাংলা দেশ থেকে, অপরটা হিন্দুস্থান ঘুরে—তু'জনার সংগে যেন দেখা হয়ে গেল দক্ষিণের বিলে। এই সব কথা মালা কল্পনা করে, আর গুন্-গুন্ করে গান গেয়ে গেয়ে ওদের খাবার জোগান দেয়। অন্ধকারে থাকলে না কি তাড়াতাড়ি কথা শিখতে পারে। তাই মালা খাঁচা তু'টোকে কি দিয়ে ঢাকবে তাই ভাবে। কাপড় একখানা হলে ভাল হয়। সে কাপড়ের আবার রং হওয়া চাই কালো। কালো কাপড় সে কোথায় পাবে? একখানা মাত্র তার ও-রংয়ের শাড়ী আছে, কিন্তু সেখানা নতুন, ছিঁড়বে কি করে? এই সেদিন বিপ্রপদ তাকে এনে দিয়েছেন—পুরোন হতে ঢের দেরী। শাড়ীখানা বেশ দামী। তবু হরদম সে সেখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে। রান্না-বান্না মাটি-গোবরের কাজও সে সেখানা পরেই করে।

বিপ্রপদর চোখ এড়ায় না, 'এ শাড়ীখানা পরে এ সব না করলে হয় না?' নষ্ট হলে এখন আর অমন একখানা শাড়ী বিপ্রপদর পক্ষে এনে দেওয়া এক রকম অসম্ভব, তা তিনি মালাকে বলতে পারেন না। ওর কাছে অক্ষমতা প্রকাশ করতেও তাঁর বড় কুণ্ঠা বোধ হয়। আর্থিক অক্ষমতাই বেশী—কিনে-কেটে আনার ঝামেলাও কম নয়। কিন্তু তিনি প্রথম অন্তরায়টা স্বীকার করে নিজের মনেও খাটো হতে চান না। দ্বিতীয়টার ওপরই জোর যেন বেশী। মালার এ সব খামখেয়ালী দেখে

তাই একটু বিরক্ত হন, কিন্তু অতিরিক্ত কিছু বলে তাকে অসন্তুষ্ট করতে চান না। যাকে এনে দেওয়া হয়েছে, সে তার খুশী মত পরুক, ছিঁড়ুক। তাঁর কাজ কি ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে। কিন্তু মাথা তার ঘামাতেই হয়—ঠিক ঘামান বলা চলে না, মাথা তাঁর ঘুরিয়ে দেখতে হয়, যখন শিশিরে ভিজা নরম ঘাসে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে ও হাঁটে, ঐ কালো শাড়ীখানা পায়ের গোঁড়ালি পর্যন্ত লুটিয়ে দিয়ে দিগন্ত-জোড়া এই খোলা মাঠে।

এক দিন বিপ্রপদ সবিস্ময়ে দেখেন যে, আসমানতারা এসেছে। তার পরনে সেই কালো শাড়ীখানা। যদিও আসমানতারা বিপ্রপদর নিতান্ত পর নয়, তবুও তাঁর মনে কেন জানি আঘাত লাগে। তিনি জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে প্রশ্ন করেন, 'এ সব কি মালা ?'

'আমি সব বুঝতে পেরেছি। ও-কাপড়খানা ওকে আমি দাতব্য করিনি—শুধু বদলে এনেছি আর একখানা। তাতে এমন কি দোষ হয়েছে যে অমন করে তাকাচ্ছেন ? আসমান আমার মেয়ে, ওকে ফেলে কি করে একা-একা পরি ভাল কাপড় ? আর তো আমার এখানে কেউ নেই, ওর দিকেও কি চাইব না ?'

'তা ভাল করেছ, বেশ করেছ।' বিপ্রপদ লজ্জায় এতটুকু হয়ে যান, কিন্তু লজ্জার গ্লানি ঢাকার জন্য ফের বলেন, 'এ বুদ্ধি কোথায় ছিল তোমার মাছ দেওয়ার দিন ?'

মালা একটা কটাক্ষ করে বিপ্রপদকে থামায়। বিপ্রপদও থামেন।

কিন্তু আসমানতারার লক্ষ্য এড়ায় না, সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'আমি তো বুঝলাম না কি হয়েছিল সেই মাছ দেওয়ার দিন ? কি হয়েছিল মা-ঠাকরুণ ?'

বিপ্রপদ বলেন, 'আজ আর কাজ নেই আর এক দিন শুনো। আসমান, তোমাদের এই ছোট্ট মা-ঠাকরুণটি পাগল ! যখন যা খেয়াল চাপবে তাই করা চাই।'

মালা একটু দুষ্ট হাসি হেসে বাধা দিয়ে বলে, 'না, না, আজই বলি—শোন আমার কথা : সেই বিলে আসার দিন গো, মাঝিটা যে মাছ ধরেছিল মনে আছে তোমার ? চিংড়ি মাছ। বাবুজী দিতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, আমি দিলাম তোমার নাঁয়ে পাঠিয়ে।'

বিপ্রপদ এমন ভাবে হেসে ওঠেন যে, আসমানতারা হতভম্ব হয়ে যায়। মালাও হাসতে থাকে। এঁরা দু'জনে এত হাসছে কেন ? আসমানতারা ফাঁপরে পড়ে যায়—কিছুই সঠিক বুঝতে পারে না। সে কি যেন একটা চাষের যন্ত্র চাইতে এসেছিল তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়। আর এক সময় এসে দু'দণ্ড বসে এ সব রহস্য উপভোগ করবে, আজ তার মোটে সময় নেই।

কিছু দিন যেতে না যেতে টিয়া ও ময়নার খাঁচা ঢাকার আচ্ছাদন মালার জোগাড় করতে মোটেই বেগ পেতে হয় না।

বিপ্রপদ এ সব বুঝতে পারেন, বুঝেও মালাকে কিছু বলতে সাহস পান না। তিনি চুপ করেই থাকেন। আবার ভাবেন : ভালই হয়েছে। বেশ করেছে মালা নিজের ভাল শাড়ীখানা না ছিঁড়ে আসমানতারাকে পরতে দিয়ে। মালা যা করে তা ভাল বুঝেই করে।

মালা টিয়াটাকে যখন বাংলা কথা শিখায় ময়নাটা কান খাড়া করে থাকে। এ তো ভাল নয়। সে ময়নাটাকে রেখে আসে বিপ্রপদর ঘরে। কারণ সে বাংলা কথা শুনে আবার হিন্দুস্থানী বুলি না ভুলে যায়।

এক দিন ভোর বেলা ময়নাটা বলে, 'নমস্তে বাবুজী, সুপ্রভাত !'

বিপ্রপদ তো অবাক্ ! অবিকল মালাকে নকল করেছে পাখীটা। তিনি মশারি থেকে মুখ বের করে সহাস্যে জবাব দেন, 'নমস্তে মালা।' তিনি আজ থেকে ময়নাটার নাম রাখলেন মালা। ও-ঘর থেকে এ সব শুনে মালা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। চোখ বুঁজে অনুভব করে তার রোমাঞ্চ। ময়না আবার একটু জোরেই বলে, 'নমস্তে বাবুজী—সুপ্রভাত !'

পাশের ঘর দিয়ে টিয়াটা উত্তর দেয়, 'সুখী হও মালা, সুখী হও।'

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ, তবু বিপ্রপদ আর শয্যা ছেড়ে উঠতে পারেন না। তিনি সমস্ত শরীর এলিয়ে পড়ে থাকেন বিছানায়। এ সব কি? কি করছে মালা? ভাল, না মন্দ? না অন্য কিছু? কিছুই ঠিক করতে পারেন না বিপ্রপদ। বোঝায় শক্তিও তাঁর যেন লোপ পেয়েছে। তিনি তাঁর সমস্ত দেহ শ্লথ করে দিয়ে আলস্য অনুভব করতে থাকেন। সময়তে তাঁর মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, সময়তে খচ খচ করে বিঁধতে থাকে একটা সরু কাঁটা—যে কাঁটা দেখা যায় না, তোলা যায় না অথচ ভোলাও যায় না যার সুস্পষ্ট ব্যথা। তার জীবনে একটা আলস্য এলো, কেন এলো তা তিনি ভেবেও দেখতে চান না। দূরে টিলাটার পাদদেশে একসংগে দশ-বারখান হাল চলছে, কৃষাণ-মজুর-বর্গাদার ও বলদগুলোর একটা সমবেত কোলাহল শোনা যাচ্ছে, কিন্তু তা বিপ্রপদর কানেও যায় না।

মালা এসে বলে, 'বীজ-ধান কৃষাণেরা চাইছে। আজ না ছড়ালে অংকুর নষ্ট হয়ে যাবে—জমি সাজান হয়ে গেছে। ধান বোঝাই ডালা-গুলো বের করে দিতে হবে। আমি একা তো আর পারব না তুলতে—একটু ধরবেন, আসুন।'

এবার বিপ্রপদর আলস্য ভাঙে। তিনি চট করে উঠে পড়েন বিছানা ছেড়ে। কলার পাতা দিয়ে সযত্নে মোড়া একটা ডালার মোড়ক খুলে দেখেন যে, কালো কালো সুস্পষ্ট আউশ ধানের বুক ফেটে সহস্র সহস্র সাদা রেশমের মত কোমল শিকড় বেরিয়ে সবগুলো ধান যেন জড়িয়ে গেছে। ধান তো কম নয়। চার-পাঁচ ডালা। ওরা দু'জনে বসেন ধান ভাঙতে। দু'হাত দিয়ে ধীরে-ধীরে আলগা করে দেন শিকড়ে-শিকড়ে জড়ান জটিলতা। কৃষাণদের কাছে ডেকে বলেন, 'এখন নিয়ে যাও এক-একখানা করে ডালা।' বিপ্রপদর সংগে সংগে যান। মালাও যায় তাঁর সংগে। নিকটেই জমি। চাষ করে মই দিয়ে বন-জংগল বেছে, জমি

সাজান হয়েছে অতি পরিপাটি করে। মাখনের মত কাদার মধ্যে কৃষাণেরা ধানের ডালা নিয়ে বীজ ছড়াতে নামে—বিপ্রপদও নেমে পড়েন একখানা বীজের ডালা হাতে নিয়ে। মালাও নামতে চায়। তাকে বারণ করে সকলে। সে দুঃখিত মনে দাঁড়িয়ে দেখে বীজ ছড়ানর প্রণালীটা। বিপ্রপদ ঠিক পারেন না, কিন্তু সবাই উৎসাহ দেয় যে, তাঁর অল্পতেই আয়ত্ত হয়ে যাবে এ সব খুঁটিনাটি কাজ।

বিলের বুনো হাঁস ও পাখ্-পাখালির মুখ থেকে দু'-চার দিন রক্ষ করে রাখতে হয় বীজগুলো। তার পর ওরা সুন্দর মাথা ঠেলে ওঠে আকাশের দিকে। প্রথম প্রথম একটা হরিৎ আভা দেখা যায়, অবশেষে আসে সবুজের প্লাবন—ওরা বড হয় দিন-দিন। মুগ্ধা মালা চুপি-চুপি এসে সকাল-সন্ধ্যায় দেখে যায় ওদের—পরিচয় করে গায় হাত বুলিয়ে। ওরা যেন শিশু, মালা যেন ওদের মা।

কাজ-কর্ম সেরে সন্ধ্যার পর সকলে এসে জমা হয় বিপ্রপদর বাসায়। রহিম এবং আবদুলও আসে। তাদের বেশ তাজা দেখায়। দেখাবার কারণ আছে। চাষার ছেলে হলেও এ জীবনে তো কখনও এমন নিশ্চিন্ত মনে চাষ-আবাদ করতে পারেনি। নানাবিধ খোস-গল্প হয়। তার মধ্যে আবদুলের বয়সের কথাটাও ওঠে এবং তা নিয়ে প্রায় প্রত্যহ একটা হাসির পাল্লা পড়ে যায়। কেউ জারী গান গায়—কেউ গল্প বলে, সেই পরমা সুন্দরী রাজকন্যার গল্প যে রইল দুধ-সাগরের ধারে পথের কথা ভুলে।

এমনি করেই দিন কাটে।

বিপ্রপদ ভাবেন: এত দিনে তাঁর কল্পনা ও স্বপ্ন বুঝি সফল হতে চলেছে—তা বুঝি হাসি-আনন্দের পথেই হবে। চাকরী নেই, সে জাঁক-জমক নেই, তার জন্য একটুও দুঃখ হয় না প্রাণে। লঘু মেঘের মত শরতের মুক্ত আকাশে ভেসে বেড়ায় তার মন।

তখনও ভোর হয়নি ভাল করে। বাইরের দিকে চাইলে সব পরিষ্কার দেখা যায় না। মালার ঘুম ভেঙেছে, যেমন তার ঘুম ভাঙে রোজ। সে ধীরে ধীরে একখানা গান গাইছিল। গান গাইতে গাইতে সে তার দুয়ার খুলল। বেশ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এমন সময় তার দুয়ার এসে কারা যেন উঁকি-ঝুঁকি মেরে কি যেন বলাবলি করতে লাগল। মালা তো দেখেই ভয়ে অস্থির। দু'টি মেয়ে-লোক, এক জন পুরুষ তাদের সংগে। স্ত্রীলোক দু'জনের মধ্যে এক জন যুবতী; অপরটিকে প্রৌঢ়া বলেই মনে হয়। মালা এদেব বিলে কখনও দেখেনি। এরা কি অভিপ্রায়ে এসেছে এখানে? মালাকে দেখেই কি অমন করছে ওরা। মালা গান বন্ধ করে বিপ্রপদকে ডেকে ওঠায়।

'বাবুজী উঠুন, উঠুন—দেখে যান, কারা যেন এসেছে। আমি তাদের চিনি নে। বড্ড ভয় করছে আমার।'

বিপ্রপদ ধড়-মড় করে উঠে বসেন। প্রথমত মালার কথা কিছুই বুঝতে পারেন না। হাঁ করে হাবার মত চেয়ে থাকেন খানিক। তারপর তার কথার অর্থ বুঝতে পেরে একখানা রামদা নিয়ে বের হয়ে যাদের দেখেন, তাদের আর যা হক, হিংসা কি হত্যা করা চলে না। তারা পরম নিরীহ জীব—ধোপা-বৌ ও তার মেয়ে সুখী। সেই সুখী, যে যখন-তখন একটু আগুনের টুকরার মত হাসে। তাদের সংগে এক জন কৃষাণ এসেছে ডোঙা নাও বেয়ে। নৌকাটা একখানা হোগলা দিয়ে কোনও প্রকারে ছই দেওয়া—দেখা যায়, খালে ভাসছে। গরীব মানুষ, একটা এক বৈঠার ডিঙি তো কেরায়া করে আসা সম্ভব নয়।

বিপ্রপদর মনটা বিরক্ত হয়ে যায়। সকাল বেলা উঠে ধোপার মুখ দেখলেন বলে নয়—সুখীর মাকে দেখলেন বলে। তার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে সকলের মতই একটা বদ ধারণা ছিল বিপ্রপদরও। এখানে মরতে

এসেছে কেন খাওয়া করে? কয়েক কাঠি ধান সে পাবে মাঘে না হক' ফাগুনে, তার এখন কি?

'বাবু পেন্নাম হই, পেন্নাম হই—সুখী, পেন্নাম কর বাবুকে।'

'বসো বসো ধোপাবৌ—তারপর কি মনে করে এত দূর এলে?'

ধোপা-বৌ একটু তামাক খায়। বহু দিন পর্যন্ত কর্ণ-পীড়ায় ভুগে তাকে বাধ্য হয়ে এ বদ্ অভ্যাস করতে হয়েছে। প্রথম প্রথম নিসিন্দে পাতা কল্কীতে ভরে সে টানত। কয়েক বছর হয়, একেবারে তামাকই না কি টানা সুরু করেছে। এ তো তার নেশা নয়, তার রোগের ওষুধ। তাই সে অকুণ্ঠিত চিত্তে সকলের কাছে চাইতে পারে এবং ব্যবহারও করতে পারে সকলের সমান।

'বাবু, তামাক আছে? অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার কান দু'টো টনটন করছে। পান তো নেই বুঝি।'

'কেন থাকবে না, সবই আছে—দাও তো মালা ধোপা-বৌকে বার করে।'

মালার গান শুনেছে, এখন তাকে দেখে তো ধোপা-বৌর চক্ষু-স্থির। সে মনে মনে হিংসায় জ্বলে ওঠে। এক দিন সে যা কল্পনা করেছিল, তা বুঝি ঘটে উঠবে না। সে গুড়ে বালি! এত রূপও মানুষের থাকে! উঁহু—তা কিছুতেই থাকতে পারে না। ওটা মানুষ না—মায়াবিনী। বাবুর লোক-লস্কর আশ-পাশ সব খেয়ে ও বাবুকে গিলবে। ধোপা-বৌ একটা চেষ্টা করে দেখবে যদি রক্ষা করতে পারে, হাজার হলেও গ্রামের এক জন প্রধান লোক তো বটেই বিপ্রপদ। আপদে-বিপদে গরীব-গরবার পরম বন্ধু। ধোপা-বৌ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বিপ্রপদর ভবিষ্যৎ ভেবে।

তামাক টানতে টানতে ধোপা-বৌ বলে, 'এলাম কেন এখানে তার আর কি বলব! আপনি তো আর খোঁজ-খবর নেবেন না। সুখীর

বাপ মারা গেছে, এখন আমরা খাই কি! গত বছর তো আপনি আমাদের এক গোটাও ধান দিলেন না।'

'আমরা কি জমি দখল করেছি গত বছর, না ধান-পান জন্মাতে পেরেছি যে তোমাকে দেব ধান?'

'তা কি জানি বাবু, কিছু টাকা-পয়সা দিয়েও তো সাহায্য করলে পারতেন। আমাদের তো দোষ নেই, আমরা তো যথা-সর্বস্ব আপনাকে বিশ্বাস করে লিখে দিয়েছি।'

'তা তো বুঝলাম। তা তো দিয়েছ—অস্বীকার তো করছি নে। কিন্তু আমি এমন কি অবিশ্বাসের কাজ করলাম তাও তো বুঝতে পারছি নে।'

'ছিঃ ছিঃ, আপনি তা করতে যাবেন কেন? আপনি তা করতে যাবেন কেন?'

'তবে?'

'আমাদের দিকে তো একটু দিষ্টি দিতে হয়—আমরা গরীব মানুষ।'

'ধান উঠুক, দেখো, আমি চুক্তি মত কাজ করি কি না, তারপর বলো।'

'কিন্তু তত দিন তো পেট মানে না। আমরা চুক্তি-টুক্তির বুঝি কি? ও সব বড়লোকের—'

'তার আমি কি করব? এত দিন যে কিছু পাওনি, চলল কি করে?'

'তখন তো লিখে-পড়ে দেইনি, মনে একটা ভরসা ছিল, এক দিন কিছু পাবই।'

'এখন সে ভরসাটা গেল কোথায়? আগে ধান উঠুক—'

ভরসাটা ধোপা-বৌর মোটেই যেত না, যদি সে মালাকে এখানে না দেখত। এতগুলো ধানী জমি সে বিনা বহায়তে কিসের আশায় ছেড়ে দিয়েছে! মেয়ে এবং নিজের ভবিষ্যতের আশায় তো! সে আশায়

তার আগুন দিয়েছে ঐ সর্বনাশী রাক্ষুসী। ওটা জুটল কোথা থেকে? ওটার হাড়-মাংস চিবিয়ে খেতে পারলেও সে ছাড়ত না। ক্রোধ দমন করে তামাক টানতে টানতে ধোপা-বৌ কাঁদতে থাকে। 'ধান ওঠার তো কত দেরী, আমরা এখন খাবো কি দেশে গিয়ে? তার চেয়ে গরু-বাছুর বাঁধব, এটা-ওটা করব—আউশ ধান ওঠা পর্যন্ত মায়ে-ঝিয়ে এখানেই পড়ে থাকব। ও সুখী হারামজাদী, এখন একটু বাবুর হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি কর। বাবুর দয়ার শরীর, দয়া হতে কতক্ষণ। পোড়ারমুখীর বাপ মরেছে, তবু মুখে হাসিই লেগে আছে। মর মর হারামজাদী, কোনও চিন্তে ভাবনা নেই। বাবুকে পেন্নাম করেছিস? গড হয়ে পেন্নাম কর। একটু কাঁদ, কাঁদতে পারিস্ নে?'

সুখী কাঁদে না—চুপ করে দাঁড়িয়ে একটু হাসে।

বিপ্রপদ কোনও সান্ত্বনা দেন না, কোন সহানুভূতিও দেখান না। মালা বলে, 'তোমরা কান্নাকাটি করো না—তোমরা এখানে থাকো, উনি পরে যা হক বুঝে-সুজে একটা কিছু সুবিধা করে দেবেন। ধান না দিতে পারেন,' টাকা দেবেন—একটা কিছু করবেনই তোমাদের জন্য, বুঝলে? আহা হা, বুড়ো মানুষ, চোখের জল ফেলো না।'

'না, না, ওরা এখানে থাকবে কোথায় মালা? বেশী একখানা ঘরও তো নেই এখানে। তার চেয়ে সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করে, আমার একখানা চিঠি নিয়ে বাড়ী যাক—বড-বৌর কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে ধান কিনে নেবে।'

সুখীর মা বোঝে, এখানে আর সুবিধা হবে না। অগত্যা সে আবার কাঁদতে থাকে এবং কাঁদতে কাঁদতে দশ টাকাকে বিশ টাকা করে। অর্থাৎ গত বছরের ফসলের তুল্য-মূল্য বের করে নেয়। অন্য সুবিধার যখন আশা নেই, তখন টাকার অঙ্কটা যত বাড়িয়ে নিতে পারে ততই লাভ। বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি মালাকে রান্নার জোগাড়ে যেতে বলেন।

মালা খুব যত্ন ও পরিপাটি করে ওদের খাওয়ায়। যাওয়ার সময় সুখীকে একখানা শাড়ী ও দু'টো টাকা গোপনে দিয়ে দেয়। বলে যে, শক্তিগড়ে ও যখন যাবে, তখন যেন ওরা দেখা করে। বাবুজীর কি যে মতলব, বোঝাই কঠিন। ওরা দু'-চার দিন এখানে থেকে খেয়ে গেলে হতো কি! ওরা তো এক গাঁয়েরই লোক।

সুখীর মা খেতে বসে আগা-গোড়া সব প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে। সে বুঝে গেল, এখানে আর কোনও দিন কোনও মতে ঘুন বসান যাবে না। বিপ্রপদ বামুনের মেয়ে যখন পেয়েছেন, তখন ধোপার মেয়ের দিকে ফিরেও তাকাবেন না।

সুখীরা বিদায় হলে মালা বলে, 'আপনার দেশের লোক, যাওয়ার সময় ওদের সংগে একটু কথাও বললেন না—ওরা গরীব মানুষ, মনে বড় ব্যথা নিয়ে গেল—এ আপনার কেমন ব্যবহার, এমন তো আপনি কোনও দিন করেন না?'

'তুমি ওদের চেন না মালা। ওই বোবা মেয়ের মা-টি বড় সাংঘাতিক মেয়ে-মানুষ। ও দেশে গিয়ে কি যে সর্বনাশ করবে, তা একমাত্র ভগবান জানেন।'

মালা কিছু বুঝতে না পেরে বিপ্রপদর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কমলকামিনীকে পত্র দিয়েছেন টাকা দিতে, অথচ এ পত্রেও কিছু উল্লেখ করলেন না বিপ্রপদ। লজ্জা এবং কেমন বাধো-বাধো ভাবের আতিশয্যে কলম চলল না ওদিকে। এও তিনি ভুল করলেন নাকি কে জানে! অহরহ মালার জন্য যাঁর কাছে সংকোচ, লজ্জা ও ভয়, তাঁর কাছেই পাকেপ্রকারে দূতী গেল কিন্তু পত্রে কিছু লেখা হলো না—এর ফল নিশ্চয় ভাল হবে না। দূতী যা বলবে, তাই অভ্রান্ত সত্য হয়ে দাঁড়াবে।

'কি ভাবছেন বাবুজী?'

'ভাবছি আকাশ-পাতাল মাথা-মুণ্ড কত কি!' বলে তিনি হাসতে থাকেন। এ হাসিটাও যে খাপছাড়া হলো, মালা তা বুঝতে পারে।

দশ

দীনুর না কি স্ত্রী মারা গেছে। প্রতিবেশী হিসাবে বোসেদের বাড়ীর একজন শ্মশানে যাওয়া দরকার।

কমলকামিনী বলেন, 'ঠাকুরপো, আর দেরী না করে যাও—না গেলে নিন্দে হবে।'

শিবপদ জবাব দেয়, 'তুমি ব্যস্ত হয়ো না বোঠান—আগে ভাল করে মরুক তারপর যাব। আমার বিশ্বাস হয় না এখনও যে অমন শয়তানের বৌ মারা গেছে। ও দীনু ঠাকুরের চালাকি। তোমার কাছে কিছু চায় নাকি, তাই আগে দেখ না। তুমি হয়ত দু'-দশ সের চাল দিলে মড়া খাড়া হয়ে উঠ্‌তে পারে।'

'ছিঃ ঠাকুরপো, বামুনের স্ত্রী মারা গেছে তা নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত না।'

'আমি ঠাট্টা করছি নে, সত্যিই বলছি। একবার এক চতুর চোর মালের বখরা দেবে না বলে অমনি জল-জ্যান্ত মানুষটা মরার ভান করে পড়ে রইল। ভাগীদারটিও কম চতুর না। ওর ঠ্যাংয়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গেল কাঁটা-বন দিয়ে শ্মশানের দিকে। চিতায় চড়িয়ে যখন আগুন দেবে দেবে, এমন সময় সে তড়াক করে উঠে বসে বলল, 'এই নে ভাই তোর ভাগের সোনার দানাটা? মশাল জ্বালিয়েছিস নিভিয়ে ফেল—আমার মুখে আগুন দিয়ে লাভ নেই, কারণ তোর ভাগের দানাটাই তো আমার মুখে। গল্পটা ছোট্ট কালে তোমরাও বোধ হয় শুনেছ, দীনু ঠাকুরের বাড়ীর ঘটনাটাও তাই নাকি আগে তুমি ভাল করে জেনে এসো—তার পর আমি যাবো শ্মশানে।'

শিবপদর কথা মত কমলকামিনী দীনু ঠাকুরের বাড়ী গিয়ে ত্বরায় ফিরে আসেন। 'তুমি যা বলেছ তাই ঠিক ঠাকুরপো। এখনও মরেনি

মাগী।' মরবে যে সে লক্ষণও কিছু দেখছি নে এখনও। গরমির দিন, বোশেখ মাসের গরম—তাতে নাকি রাত্রে কি সব গুরুপাক জিনিষ খেয়েছে। সকাল থেকে ভেদবমি—একেবারে ভেটকি মেরে পড়ে আছে, মরবে বলে মনে হয় না। কিন্তু দীনুদা আশা ছেড়েছে, তাই একটু আগেই আমাদের বাড়ী থেকে একজনকে শ্মশানে যেতে বলেছে।'

'তোমরা যা-ই কেন বল না বোঠান, ওর কথা শুনলে আমার গা জ্বলে।'

'কি করবে ঠাকুরপো, প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর জ্বালা সকলেরই সইতে হয়। মরুক কি না-ই মরুক তুমি একবার ঘুরে এসো গে।'

অনুমান ও বাদানুবাদ যা-ই হক, দীনুর স্ত্রী সেই রাত্রেই মারা যায়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক শিবপদকে সেই রাত্রেই শ্মশানে যেতে হয়। কমলকামিনীর অনুরোধ এড়াতে পারে না। শ্মশানে এসে দীনু শিবপদর হাত ধরে যথেষ্ট কান্নাকাটি করে, ক্ষমা চায় সেদিনের সেই বাক-বিতণ্ডার জন্য। সে এখন উদাসী বৈরাগীর মত বেরিয়ে যাবে এক দিকে। সংসারে তার এখন আর কোনও আসক্তিই তো রইল না। এমন পরমা সাধ্বী স্ত্রী ক'জনের থাকে!…

দু'-একদিন যেতে না যেতেই শোনা যায়: দীনু শ্রীবৃন্দাবন যাচ্ছে। জীবনের শেষ দিন ক'টা তীর্থস্থানেই কাটাবে। তার স্ত্রী নাকি ভ্রষ্টা চরিত্রা ছিল এবং যে তাকে বিপথগামিনী করেছে সে এই গাঁয়েরই লোক। তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে যাবে। আর ঐ দুশ্চরিত্রা মেয়ে-মানুষের ভাল করে শ্রাদ্ধ-শান্তি করে কি হবে? তার অনন্ত নরকবাসই শ্রেয়ঃ! দীনু তার ভদ্রাসনটুকু বেচবে, বেচে যা পাবে, তা বাজে কাজে ব্যয় না করে দেশান্তরে যাবে। সে কপালে একটা লম্বা সিঁদুরের ফোঁটা কেটে একখানা ধারাল দা হাতে নিয়ে ইদানীং চলা-ফেরা করে। তার চেহারা দেখে কেউ তার সংগে যেচে কথা বলতে সাহস পায় না।

ছেলেরা তো দূরের কথা, বুড়োরাও তাকে দেখলে গা-ঢাকা দেয়। ধীরে ধীরে শোনা যায়, শিবপদ নাকি তার মৃতা স্ত্রীর সংগে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত ছিল। তাই শিবপদ দীনুকে দেখতে পারে না। যখন তখন যা-তা নিয়ে তার সংগে ঝগড়া করে। এবার দীনু সব ঝগড়া মিটিয়ে দিয়ে যাবে। শ্রীবৃন্দাবন ও জেলখানা তার কাছে এখন দু-ই সমান। এখন সে নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে। তাই তার কাছে পাপ-পুণ্যে ভেদাভেদ নেই।

সে তার বাড়ীখানা বেচবে। কে রাখবে দীনুর ভদ্রাসন টাকা দিয়ে? এমন সস্তা টাকা এ দেশে নেই। কারুর সাহস হয় না ওর সম্পত্তি কবলা করতে। পদে পদে বিপত্তি হতে কতক্ষণ? পর-পর ক'টা 'ছেগা' করে রেখেছে কে জানে!

দীনু দেশের মধ্যে আর সুবিধা করতে পারে না। যাদের টাকা অল্প, তারা কাছেই ঘেঁষে না। তাই ঘোষালদের স্মরণ নিতে হয় শেষ কালে। বড় ঘোষালকে লক্ষ্য করে বলে, 'আমি বহায় চাই নে। আমার বাড়ীটা কবলা রেখে তুমি ঋণমুক্ত করে দাও আমাকে। আমি শ্রীবৃন্দাবন যাব।'

সবিস্ময়ে বড় ঘোষাল বলে, 'আপনি আমার কাছ থেকে তো কোনও দিন কোনও টাকা-পয়সা ধার—'

'টাকা-পয়সার দেনাই বুঝি দেনা! বিষয় ঘেঁটে-ঘেঁটে ঘোর বিষয়ী হয়ে গেছ বাবাজী—ঘোর বিষয়ী!'

বড় ঘোষাল আরও বিস্মিত হয়—সে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে থাকে।

'এখানে তো কেউ নেই এখন—বড্ড অনুতপ্ত হয়েছি, তাই বলতে এসেছি তোমার কাছে। সেবারের দৈ'র কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে।'

'হ্যাঁ, সে কথা কি ভুলতে পারব কোনও দিন। যাক, বলুন তার পর—'

'তার পর তুমি তো জানো, মানহানির মামলায় বাদী কি দাবী করে এবং হাকিম সাধারণত কি রায় দেয়। তোমার বয়স হয়েছে, তোমার নখদর্পণে সব। হুঁকোটা এদিকে দাও তো, অনেকক্ষণ অভুক্ত আছি, একটু সুস্থ হয়ে নি, তার পর সব বলছি।'

হুঁকোটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেওয়া হয় দীনুর হাতে। সে ধারাল দা'খানা তক্তপোষের ওপর রেখে হুঁকোটা ধরে।

ছোট শনিগ্রহটি উদয় হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'ওখানা কি দীনুদা?'

'তোমরা প্যাদা-পাইক পাঠিয়ে দুষ্টের দমন করো, আমার তো সে সম্বল নেই। সংগী যেটি ছিলেন তিনিও তো আমার মায়া মমতা ত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেলেন—এখন আমার সম্বলও ঐটি, সংগীও ঐখানাই। রাত-বিকেলে যেখানে-সেখানে চলি-ফিরি, বলা তো যায় না—দেশে তো শত্রু-মিত্রের অভাব নেই।'

'খুড়ো খুব হুঁশিয়ার লোক।' ছোট ঘোষাল মন্তব্য করে।

বড় ঘোষাল জিজ্ঞাসা করে, 'তারপর?'

'তারপর আর কি, কল্কিটায় তামাক নেই, আছে শুধু আগুন।'

'যা ভাই ছোট, একটু তামাক পাঠিযে দে খুড়োর জন্য। খুড়ো নাকি দেশত্যাগী হচ্ছেন—আব তো খাবেন না, আর তো আসবেন না আমাদের বাড়ী।'

'তোমার তামাকের ডিবেটা কোথায়?'

'আমারটা খালি, না হলে কি তোকে অনুরোধ করি?'

অগত্যা তামাক আনতে ছোট ঘোষাল বাড়ীর ভিতর বিপিনকে পাঠায়। বিপিন ভাগের চাকর, তিন দিন অন্তর এক দিন এক এক হিস্যায় পালা। খুড়োর নাকি এই শেষ খাওয়া—তাই ছোট ঘোষাল নিজের তহবিলে হাত দিতে রাজী হয়। তা না হলে সে নিশ্চয় ভাবত অথবা মুখের ওপরই বলে দিত, 'দাদার খুড়ো আমার কি!'

দীনু তামাকের প্রত্যাশায় বসে থাকে। তামাক না টেনে সে আর কিছু বলবে না।

তাড়াতাড়িই বিপিন তামাক নিয়ে ফেরে! বড় ঘোষাল আবার অন্যমনস্ক ভাবে হাত বাড়ায়। দীনুর দিকে তার নজর পড়তেই লজ্জিত হয়ে বলে, 'না, না খুড়ো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে—আপনি নিন, আপনিই—'

দীনু তবু ছাড়ে না, বলে, 'বাড়ীর ভিড়টাই আগে ভাঙো বাবাজী, অতিথ-বিতিথ পরে হবে।'

ছোটটি মূর্খের মত হাসে। বড়টি আরও লজ্জিত হয়। 'না, না খুড়ো, ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন।'

'তার পর যা বলছিলাম: মানহানির জন্য দৈহিক কি মানসিক ক্ষতি যা-ই হোক, বাদী তার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ পায় টাকা। সত্যি কি না বাবাজী? এই তো সাধারণ নিয়ম, কি বলো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলে যান—বলে যান।'

'তোমার কন্যার বিয়েতে দৈ না দিয়ে, তোমার মানহানি ঘটিয়েছি আমি—না, না, আমি নই, বিপ্রপদ। ওই ধরো আমি, কারণ আমিই তো ভরসা দিয়েছিলাম। এখন বাবাজী, দেশ ছাড়ব, শুধু শুধু দেনা রেখে যাবো কেন? তোমার ক্ষতিপূরণ করব টাকা দিয়ে। বলতে পার, টাকা আমি পাব কোথায়? আমি আমার ভদ্রাসনটা তোমায় লিখে দেব। তার বদলে আমি কিছু চাই নে, চাই ঋণমুক্তি। তোমার জামাই একটি নাকি এ দেশে বাড়ী করতে চায়, তার পক্ষে বেশ ভাল বাড়ীই হবে একখানা। আমি সজ্ঞানে এবং সরল অন্তঃকরণেই লিখে দেব—এখন তুমি লিখে নিতে যা দেরী। ভূ-সম্পত্তি এবং নগদ টাকা একই কথা বাবাজী—একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিলেই হল।'

প্রস্তাবটা মন্দ না। পরের দিনই দলিল একখানা রেজিষ্ট্রী হয়ে যায়।

টিকিট বরাত দেওয়ার সময় দীন্থ বলে, 'বাবাজী, জামাই তো স্থায্য মূল্যই দেবে, আমি কি একেবারে খালি হাতেই যাব? অন্তত শ্রীবৃন্দাবনের রেল-ভাডাটা—তোমার মেয়ে-জামাই বসত করবে এই ভিটায়। আমি আশীর্বাদ করব।'

কথাটা সত্যই। বড ঘোষাল বলে, 'খুডোব কথাটা আমি উপলব্ধি করেছি—এই ত্রিশটা টাকা নিন, না, ত্রিশটা নয় একত্রিশটা, শূন্যে শূন্যে কাজ হওয়া ভাল নয়। ও টাকার আমি কোনও দাবী রাখি নে।' তার পর গলার স্বর একটু খাটো করে ফের অনুরোধ করে, 'কিন্তু বহায় যে নিলেন না, খুড়ো, এ কথাটা গোপন রাখবেন—কি বলেন, মনে থাকবে তো?'

'হুঁ, থাকবে। কিন্তু ছোট যে জানে।'

'জানুক। ওটা গোমুখ্যু, ওকে একটা ভাঁওতা দিলেই হবে। কিন্তু মেয়ে-জামাইর কানে যেন না যায়। গেলে সর্বনাশ, আমাকে ঠাওরাবে কি!'

'তা ঠিক।' দীনু একটু বাঁকা হাসি হাসে। 'বে-কায়দায় পড়লে দশ-হাজারী মনসবদার ও দীনু ঠাকুর এক।'

বড় ঘোষালও একটু সলজ্জ হাসি হেসে দীনুর বক্তব্যেই যেন সায় দেয়। 'তা বটে।'

বাড়ী ফিরেই বড় ঘোষাল বছরের চালটা কিনে ফেলে।

দীনুর বাড়ী-ঘর নেই, সে ফিরবে কোথায়? ধোপা-বৌর বাড়ী গিয়ে ওঠে। 'সুধীর মা, একটা কথা, বোসেদের সংগে তোমার একটা বিশেষ সম্পর্ক হয়ে গেছে, সত্যি কিনা বল তো?'

'হাঁ, কেন বলুন তো ঠাকুরদা?'

'শুনলাম, তুমি প্রতি বছর পঞ্চাশ কাঠি করে নাকি ধান পাবে। সুখের কথা, কিন্তু তুমি এই ছাড়া-বাড়ীতে পড়ে থাকো, চোরের ভয় করে না? সব যে নিয়ে যাবে এক রাত্রে। পুরুষ মানুষ নেই, তাতে বাড়ীটাও নেহাৎ পাড়ার বাইরে খাল পারে, তুমি ধান-পান নিয়ে থাকবে কি করে?'

'কি করব ঠাকুরদ্দা, ধান-পান তো 'আরামে' পাবো, এর মধ্যেই ঐ সুখীকে নিয়ে বড্ড মুস্কিলে পড়েছি। প্রতি রাতে কারা যেন এসে বেড়ার ওপর টোকা মারে, এ গাঁয়ে তো দামড়ার অভাব নেই। কি করব, একটু যদি মাথা গোঁজার স্থান পেতাম মাঝ-পাড়ায়!'

'আমিও তাই বলছি সুখীর মা। শ্রীবৃন্দাবন যাব তাই সৎ পরামর্শ দিতে এসেছি তোমাকে। তুমিও অনাথা আমিও অনাথিনী, উভয়ে উভয়ের ব্যথা বুঝি—অন্যে বুঝবে কি?'

'আপনি এখন কি করতে এজ্ঞে করেন?'

'তোমার ধান-পান টেনে আনতেও কষ্ট হবে না, সুখীর জন্যও চিন্তা থাকবে না—এক কাজ করো।'

'কি কাজ?'

'ঐ যে আমার ভদ্রাসনখানা, দান-পত্তর রেজেষ্ট্রি করে দেই তোমাকে। তুমি এসে থাক তোমার মেয়েকে নিয়ে। জানই তো, আমার বাড়ীখানা কেমন গাঁয়ের মাঝখানটিতে।'

'এত টাকা আমি কোথায় পাব?'

'ওই তো বললাম: দান করে দেব, শুধু আফিস-খরচ—আর গোটা পঁচিশেক টাকা দিও, বৃন্দাবন যাওয়ার রেল-ভাড়া বাবদ। ভাবতে পার, এত লোক থাকতে তোমাকে কেন দিতে যাচ্ছি বাড়ীখানা। তোমার স্বামী আমাকে অনেক আফিং খাইয়েছে। একবার যা হাত উপুড় করে দিয়েছে, তা আর কখনও ফিরিয়ে নেয়নি। খোপা হলেও তার আত্মা ছিল। তা' ছাড়া ধরো, যদি কোনও দিন ফিরে আসি, তুমি গরীব

মানুষ, আমাকে তুচ্ছ করবে না। কিন্তু বড়ওয়ালাদের দিলে তারা ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। তুমি তো তা পারবে না—কি বল, পারবে ?'

'ধেৎ, তা কি মুনিষ্যির কম্ম! আপনার বাড়ী-ঘরে আপনি এসে থাকবেন—'

'কিন্তু একটা কথা ?'

'কি কথা ?'

'তোমাকে দলিল করে বসিয়ে দেব বাড়ীতে—' দীনু একটু গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে, 'দলিলটা হবে বিপ্রপদর নামে, কিন্তু হাতে থাকবে তোমার। কখনও দরকার হলে বলবে যে, বাবুর নামে বেনামী করেছ তুমি।'

'এত ঘোর প্যাঁচের অথ কি ঠাকুরদ্দা ?'

'অর্থ একটা আছেই, বলছি শোন। ঘোষালেরা তোমাদের ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা, যদি তোমার নামে একটা মিথ্যা মামলা-টামলা করে, তুমি মেয়েমানুষ, তোমার সম্পত্তিটুকু হয়ে যাবে নিলাম। নামটা বিপ্রপদর থাকলে সেই অন্তত নামকে-ওয়াস্তে লড়বে। তুমি থাকবে নিরাপদ। কেমন পরামর্শটা ভাল কি না ?'

ধোপা-বৌ সব বুঝতে পারে না। পরামর্শটা একেবারে মনের মত না হলেও মন্দ লাগে না। টাকা তো মাত্র পঁচিশ-ত্রিশটা—তাতে কি হবে হাতী-ঘোড়া ? সে কোনও প্রকারে এখন মেয়েটাকে নিয়ে থাকতে পারলেই হয়। বাবুর বাড়ীর কাছে, এই তো বড় দলিল।

'আরও একটি কথা—সেইটাই আসল কথা। যদি কেউ তোমায় ঐ বাড়ী থেকে বেদখল করতে আসে বা জ্বালাতে আসে, তবে তুমি তাকে খ্যাংরা মেরে বিদায় করবে। কি, পারবে না ? যদি না পার তবে তো তুমি ধোপা-বৌই না।'

'সে জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না, মুষ্টিযোগ আমি ঢের জানি।'

পরের দিন নিয়ম মত কাজ হয়ে যায়।

সুধীর মা বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে দীনু ঠাকুরের ঘরে গিয়ে ওঠে। দীনু তাকে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে-বুঝিয়ে দেয়। খ্যাংরা ও রসনাটা খুব সচল রাখতে বলে। তা হলে তার কাছে ঘেঁষবে না কেউ। মামলা-মকদ্দমায় সংসার অনেকেই করতে পারে, কিন্তু ধোপা-বৌকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে হটিয়ে দেওয়া যার-তার কর্ম্ম নয়।

এখন দীনু যাবে কোথায়? একবার সে বাড়ী বেচল, আবার দান করল, তবু তার বাড়ীর ওপর দাবী রয়ে গেল। তার ধারণা, বুদ্ধি থাকলে ইংরেজ রাজত্বে কেউ কারুর ভূ-সম্পত্তি সহজে নিয়ে যেতে পারে না। হাওলা স্বত্ব কিনেছে ঘোষাল, নিম-হাওলা সে দান করেছে সুধীর মাকে—তার নীচের স্বত্ব এখনও তারই করায়ত্ত। ফৌজদারী মামলার আপাতত একটা ভয় আছে বটে, তাই সে কিছু দিনের জন্য ঘুরে আসবে বাইরে থেকে। শ্রীবৃন্দাবনই যাবে। গয়ায়ও যেতে হবে। স্ত্রীর নামে একেবারে খোদ গয়াসুরের পাদপদ্মে সে পিণ্ড দেবে। কে বলে যে তার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা ছিল! ভাল করে সে যখন শ্রাদ্ধ-শান্তি করতে পারবে না, তখন তার তো একটা অজুহাত চাই। তার এই নতুন চালে শিবপদটাও একটু জব্দ হয়েছে। সমাজে এবং সংসারে তার মুখ হয়েছে অনেকখানি নীচু। দীনুর ভাব-ভংগী দেখে তার যে কিছু ভয়ও হয়নি, তা নয়। সে দীনুকে দেখলে আজকাল একটু এড়িয়েই চলে। ধারাল দা'খানা তার ব্রহ্মাস্ত্র। যে সে ব্রহ্মাস্ত্র নয়! প্রয়োগ না করে শুধু দেখিয়েই কাজ হাসিল। এখনও তার একটা কাজ বাকী আছে। পাথেয় বাবদ আরও কিছু টাকা চাই। টাকা রয়েছে শিবপদদের নাট-মন্দিরে। তা তাকে একটু পরিশ্রম করে বের করে নিতে হবে।

দীনু ফের বাড়ী ফিরে যায় এবং রান্না ঘরের কয়েকখানা ভাঙা বেড়া নিয়ে বোসেদের বাড়ী চলে আসে। হোগলের বেড়া, হাল্কা জিনিষ। খানচারেক একা তুলে আনতে কষ্ট হয় না।

'এত রাত্রে কে নাট-মন্দিরে?' শিবপদ প্রশ্ন করে, 'কে?'

'আমি দীনু ঠাকুর, একটু বিশ্রাম করব তোমাদের নাট-মন্দিরে— বাড়ীটা আমার একেবারে শূন্য খাঁ-খাঁ করছে, ভাল লাগে না।' সে বেড়া ক'খানা একটু অন্ধকারে লুকিয়ে রেখে এসে বলে, 'বড়বৌ, একটা আলো দাও, চৌকিটা একটু ঝেড়ে-পুঁছে নি।'

কমলকামিনী বিষম দায় ঠেকেন। শিবপদকে বের হয়ে আলো দিতে বলতে পারেন না, নিজেরও দিতে সাহস হয় না। তিনি গড়িমসি করতে থাকেন।

'আরে, তোমার কোনও ভয় নেই, আমার মাথা খারাপ হয়নি। তুমি স্বচ্ছন্দে বাতি একটা দিয়ে যাও, একটু ঠিকঠাক করে নি।'

কমলকামিনী একটা কেরোসিনের ডিবা বের করে দিয়েই দোর বন্ধ করেন।

দীনু হাসে।

সকাল বেলা কমলকামিনী ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে, নাট-মন্দিরের একটা কোণ বেশ শক্ত করে আটকান হয়েছে সেই হোগল-পাতার বেড়া দিয়ে। সেই বেড়ার ভিতর শুয়ে দীনু অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। দীনু যতই বলুক, ওর মাথা খারাপ না হলে পরের বাড়ী এসে এমন করে পড়ে থাকে! স্ত্রী নেই, পুত্র নেই—আছে পড়ে, থাক! ওকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই। তিনি বিশেষ করে শিবপদকে পাগলের কাছে যেতে বারণ করে দেন।

সে উত্তরে বলে যে, ওকে আস্কারা দেওয়া মোটেই ভাল না। এখনই থানায় গিয়ে খবর দেওয়া কর্ত্তব্য।

কমলকামিনী তাতে আপত্তি করেন। নাট-মন্দির থেকে হয়ত ওকে তাড়ান সোজা, কিন্তু ওর আক্রোশ থেকে যখন-তখন রক্ষা পাওয়া কঠিন। বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়ের জন্যই বিশেষ চিন্তা হয় তাঁর। অবুঝগুলোকে কি সামলান যে-সে কথা! সর্বনাশা ঠাকুরের হাতের দা'খানা দেখলে আর প্রাণে জল থাকে না। কতক্ষণে যে ও এ-বাড়ী স্বেচ্ছায় ছাড়বে, তাই কেবল ভাবতে থাকেন।

দীনু বাড়ী ছাড়ার নাম করে না। বরঞ্চ আর একটু শক্ত হয়ে চেপে বসে। দুপুর বেলা কমলকামিনীর কাছ থেকে চাল ডাল চেয়ে নিয়ে দিব্যি রান্না চাপায়। সে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটার দিকে চেয়ে চেয়ে জোরে জোরে বলে যে তাকে আর কে তাড়ায়? বেশী জোর করতে এলে দেবে এক কোপ বসিয়ে। তাও যদি একান্ত না পারে, নিজের দেহে কিম্বা মাথায় নিজে নিজেই কোপ মেরে যাবে সোজা থানায়—গিয়ে করবে লুঠ-মামলা। তাকে তুলতে হলে রীতিমত দেওয়ানী করতে হবে—সে হচ্ছে দু'-চার বছরের ব্যাপার! একটা পুলিশ এনেই আর ভয় দেখিয়ে তোলা যাবে না। সে আর কেউ নয় দীনু ঠাকুর, আইন-কানুন তার মুখস্থ।

শিবপদ বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে। 'এখন উপায় কি বৌঠান?'

'তোমার দাদাকে খবর দাও। ওর মতলব তো ভাল নয়।'

'দাদাকে খবর দিলে তিনি বুঝবেন কি! তিনি এখানে এলে [illegible] আমাদের দু'ভাইকে জুতিয়ে লম্বা করে তারপর ওর [illegible], [illegible] করবেন। আমি খবর দিতে পারব না তাঁকে—এমন সাহস আমার নেই। তিনি কত বড় একটা সাংঘাতিক ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত আছেন, কখন কি হয় তার ঠিক নেই, আমি দেব তাঁকে এই সব [illegible] খবর? তোমরা প্রতিবাদী না হলে এতক্ষণ আমি ওকে [illegible] বিদায় করে। [illegible] ঠাকুর ভূত পালাবে বাপ বলে।'

'কিন্তু সেবার তো দেখলে, ওকে পুলিশ এনেও জব্দ করা গেল না— আইনের ফাঁক বুঝে ও পা বাড়ায়।'

'ওর জন্য কি থানার পুলিশ এনে লাভ আছে। থানায় যেতে হয় শুধু আইন রক্ষার খাতিরে। ওর জন্য হাত-পুলিশের ব্যবস্থা করতে হয়। মানুষের নামে ও যে সব বদনাম রটায়! আমার গা জলে যায় বৌঠান, করব কি, তোমরা প্রতিবাদী।'

নাট-মন্দিরে দীনু কান খাড়া করে বসেছিল। সে সজোরে জিজ্ঞাসা করে, 'কি বললি রে শিবে? ফের বল তো।'

কমলকামিনী অমনি ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠেন, 'দীনুদা, ও কিচ্ছু বলেনি। নিতান্ত ছেলে মানুষ—আবোল-তাবোল বকলে আপনি কান দেবেন কেন ওর কথায়?'

শিবপদ একটা লাঠি নিয়ে গর্জন করে ওঠে।

কমলকামিনী এক হাতে তার মুখ এবং অন্য হাতে লাঠিটা চেপে ধরে বলেন, 'চুপ করো ঠাকুরপো, চুপ করো। আমার মরা-মুখ দেখ, চুপ করো। তোমরা আমায় আর পাগল না করে ছাড়বে না। আমার অন্তরে জ্বালা, বাইরে জ্বালা, আমি কোথায় যাবো, বিধাতা আমায় নাও।'

শিবপদ অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করে বাইরে বেরিয়ে যায়।

কমলকামিনী শ্রান্ত দেহে একটা কি যেন আশ্রয় করে চুপ করে থাকেন।

এমন সময় বাইরে একটা সকৌতুক প্রশ্ন ও হাসির কলরব শোনা যায়। কে যেন ডেকে বলে, 'অমরেশ এসেছে, অমরেশ।'

অমরেশ এসেছে! কমলকামিনী ছুটে বেরিয়ে আসেন। মেজো এবং ছোটবৌও কাজ কর্ম ফেলে দ্রুত আসে।

অমরেশের আগের সে চেহারা আর নেই। মুখ চোখের সে উদ্দণ্ড ভাব, মাথার খাড়া-খাড়া চুল—সবই যেন সলজ্জ ও সুবিন্যস্ত

হয়েছে। কেমন ফর্সাও হয়েছে দেখতে। সাজ-সজ্জা ফিট্‌ফাট। প্যাণ্ট সার্ট জুতা মোজায় কেমন সুন্দর মানিয়েছে। একটা ব্যাগ ভর্তি বই ঝুলছে সংগে। কমলকামিনীর ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে ছেলেকে কোলে নিতে। কিন্তু লজ্জায় তা পারেন না। সগৌরবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন।

অমরেশ ছুটে এসে ঘরে না উঠে একেবারে নাট-মন্দিরে গিয়ে ঢোকে। সকলেই একটা অস্ফুট আপত্তি করে ওঠে—তা ওর কানেই যায় না।

'কি রে অমরেশ, আছিস কেমন ? তোর দিদিরা ভাল আছে তো ? বাঃ, চমৎকার দেখাচ্ছে যে তোকে।' দীনু মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'একটা আম খাবি বাবা ? এই দেখ, কেমন গাছ-পাকা আম।'

দীনুকে প্রণাম করে বলে, 'সব ভাল। কই আমটা, দিন খাবো।' তারপর সে আমটা নিয়ে ছুটে মা'র কাছে গিয়ে হাজির। হাতের আমটা রেখে সে সকলকে প্রণাম করে—সেবাকে জড়িয়ে ধ'রে একটা চুমো খায়। সেবা করতালি দিয়ে নাচতে নাচতে বল্‌তে থাকে, 'দাদা এসেছে,রে দাদা এসেছে।'

'সেবা আম খাবি, পাকা আম ? একখানা দা নিয়ে আয়। বিনু আয়, তোরাও সব আয়।'

কোন সময় দীনু এসে যেন বারান্দার চৌকাঠে হাত দিয়ে এতগুলি ছেলে-মেয়ের কলরব শুনছিল—ঠিক চোরের মত চুপ করে, 'এই নে—' বলে সে হাতের ধারাল দা'খানা অমরেশের কাছে এগিয়ে দেয়, 'আরও দু'টো আম আছে, এনে দি—তোরা কেটে কুটে খা। বাবা অমরেশ, হাত সাবধান।'

একবার কমলকামিনীর ইচ্ছা হয়, অমরেশের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমগুলো ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিতে, আবার কি যেন কি ভেবে চুপ করে থাকেন।

আম ক'টা কেটে অমরেশ সকলকে ভাগ করে দেয়। দীনু একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বেড়ার ঘেরার মধ্যে চলে যায়।

এর কয়েক দিন পরে গভীর রাত্রে দীনু কেমন করে যেন নাট-মন্দিরের তার দখলীয় অংশের কয়েকখানা টিন খোলে। রাতারাতি তা সরিয়ে দেয় এস্তেজদ্দির বাড়ী। অবশ্য এস্তেজদ্দি যে টিন রাখে, তা দীনু এবং সে ছাড়া গ্রামের কেউ সহজে জানতে পারে না—এমনি পাকা হাতে কাজ হয়।

অতঃপর দীনু বুঝি শ্রীবৃন্দাবন রওনা হয়।

এগারো

পর পর নানা ঝঞ্ঝাটেই কমলকামিনীর শিবচর যাওয়া হয়নি, বিপ্রপদ নিজে এলেন, তাঁর কাছেও মালার কথা জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হলো না। তাই তিনি মনে মনে স্থির করে রেখেছেন, সুযোগ নিজে না এলে ব্যস্ত হয়ে তাকে চুলে ধরে টেনে আনা যায় না। আজকাল তাঁর মনের চাঞ্চল্য তাই একটু কমেছে। তিনি একটু স্থির হয়ে বাঁধা পথেই গড়িয়ে যাচ্ছেন। তবু তাঁর মনটা প্রচ্ছন্ন অগ্নিশিখায় সময় সময় বহ্নিমান হয়ে ওঠে। তখন বোঝা যায়, দুর্বল ও রুগ্ন অংগ, বাইরে থেকে যা ভাল হয়েছে মনে হয়, তা পূর্বের মত অবিকল নিরাময় হতে ঢের দেরী। মণির ছেলে হয়েছে সে টের পেল না, দীনু শিবপদ কিছু জানল না, অমরেশ ছেলে মানুষ, সে তো বুঝবেই না মায়ের মর্ম-ব্যথা। এই বহু-পরিবারের কোথায় যে ঘুনে ধরেছে, কোন পাঁজরখানা যে রোগে ঝাঁঝর হয়ে যাচ্ছে, তা বাইরের লোকে তো দূরের কথা, ভিতরের লোকেও বুঝতে পারে না।

নতুন বাড়ীখানা মেজে-ঘসে লিপে-পুছে তকতকে ঝরঝরে করে তবে

এত দিন বাদে ধোপা-বৌর সময় হলো, এলো সংবাদ পরিবেশন করতে। তার কথা যে সত্য তা কমলকামিনীর বিশ্বাস করতে যাতে একটুকুও বেগ পেতে না হয়, সেই জন্য হাতে হাতে প্রমাণ সংগ্রহ করে নিয়ে আসে সুখীর মা। দশটা পাঁচটা আজে-বাজে প্রমাণ না, একটি মাত্র, সেই মালার দেওয়া শাড়ীখানা—ধ্রুব এবং অকাট্য। ঠিক হাতে-হাতেই নিয়ে এলো না, এলো সুখীকে পরিয়ে নিয়ে। এমন কায়দা করে জড়িয়ে ছড়িয়ে পরাল যে দেখলেই চোখে লাগে।

'সুখীর মা, ও শাড়ীখানা সুখী পেল কোথায়? কে দিল? দিব্যি নতুন রয়েছে তো?'

'বলো দেখি বড় মা, কে দিয়েছে? যেদিন বাবুর পত্তর দিয়ে টাকা নিলাম, সেদিনই ভেবেছিলাম বলি, কিন্তু কি যেন ভেবে বলা হলো না। ও ঠিক ঠিক, মনে পড়েছে—এখানে যেন কারা সব বসেছিল। নিজের ঘা কি পরকে দেখান ভাল। আমরা ছোট নোক হলেও তা বুঝি মা।'

'না, তোমাকে যেদিন টাকা দিলাম, সেদিন কেউ তো ছিল না এখানে। আমার ঠিক মনে আছে, তুমি ছিলে ঐ খুঁটিটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, আমি ছিলাম এই এখানেই বসে।'

কমলকামিনীর কথাই সত্য, তবু ধোপা-বৌ একটা মিথ্যা হেঁয়ালীর অবতারণা করে এই জন্যই যে, সেদিন তার সংগে ঐ শাড়ীখানা ছিল না। একটা প্রমাণ না এনে এত বড় একটা কথা যে পত্তন করা উচিত নয়, সে তা জানে।

'না গো বড় মা, তোমার সোরণ নেই, তখন কে কে যেন বসে পান খাচ্ছিল—আমরা দশ বাড়ীর কাজ করি, খাতা-কলম নেই তবু সব কথা মনে না রাখলে কি চলে?'

'হবে হয়ত। আমার আজকাল অমনি ভুল ভ্রান্তি হয়।'

'হবে না? মনের ওপর তো কম আঘাত যায় না—তুমি দেখে তা

বলো না। আমরা হলে একটা কুরুক্ষেত্তর হয়ে যেত। সে মাগী কি যে সে মাগী, আমাদের একটা দিন তিষ্ঠিতে দিলে না বিলে! বকে-ঝকে তক্ষুনি বাবুকে বলে দিলে নৌকায় তুলে। আমরা মা তোমাদের শাসনের ধোপা, হাজার অপরাধ করলেও তো চারটি ভাত দিতে কক্ষনো কেউ আপত্তি করো না। ও মাগী আমাদের না-খেয়েই বিদায় করে ছাড়লে। সংগে কিষাণ গিয়েছিল নবীন, তাকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ না।'

'কার কথা বলছ তুমি ধোপা-বৌ, কার কথা?'

'কি নাম রে সুখী সেই বামনীটার?' সুখী শুধু হাসে। ধোপা-বৌ জলে ওঠে। 'অ্যা হারামজাদী, শুধু বেহায়ার মত হাসতে জানে—কাজের কাজ কিছু জানে না। নামটা, নামটা—মালা।'

'কার নাম মালা?'

'বললাম যে, বাবুর রাঁধুনীটার।'

'সে-ই বুঝি এই শাডীখানা সুখীকে দিয়েছে?'

'দান করবে এত বড আত্মা। এ কি তোমার বড মা।'

'তবে আনলে কি করে?'

সুখীর মা কথায়-কথায় এমন জায়গায় এসে পড়েছে যে, তার আর জবাব দেওয়া কঠিন। সে ঢোক গিলে চোখ পাকিয়ে বলে, 'বামনীটার আটপৌরে কাপডই এই—ভিজে শাড়ী বাইরে রোদে দিয়েছিল, তুমি আবার আমাদের কথা অবিশ্বেস করো না কি, তাই তুলে নিয়ে এসেছি তোমাকে পেরতক্ষ দেখাব বলে।'

'না বলে চুরি করে?'

'তা যদি ভাবো, তুমি রেখে দাও। তোমাদের শাড়ী মা, আমাদের কি।'

'কি, আমি রাখব ঐ শাড়ী? একটা নোংরা মেয়েমানুষের শাড়ী! তোমার বলতে লজ্জা করে না ধোপা-বৌ? তুমি ওঠো—আমার বাড়ী

বলে ও-সব আর বলো না। ওঠো, ওঠো। আমার, আমার বৌ-ঝি-ছেলে-মেয়ের কি কাপড়ের অভাব যে আমি রাখতে যাব চোরাই মাল। ওঠো, যাও আমার সুমুখ থেকে।'

ধোপা-বৌ ওঠার আগেই কমলকামিনী দ্রুত উঠে ঘরের মধ্যে চলে যান। তিনি যে আজ এতটা উত্তেজিত হবেন, ধোপা-বৌ তা বুঝতেই পারেননি। তা হলে সে এ-সব কথা বলতে আসত না কিছুতেই।

কমলকামিনী অতটা উত্তেজিত হতেন না। যে মুহূর্তে তিনি শুনলেন, শাড়ীখানা মালার, সেই মুহূর্তেই যেন তাঁর চোখে স্পষ্ট প্রতীয়মান হল যে, ঐ শাড়ীখানা পরে সেই নির্লজ্জা যেন তাঁর স্বামীর শয্যায় গিয়ে উঠল এবং উঠেই বাতিটা নিবিয়ে দিল। তার পর যা হলো, তা অনুমান করে কমলকামিনী কণ্টকিত হয়ে ওঠেন। ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে মন।...বিপ্রপদ যেন সঙ্কুচিত ভীত। কার জন্য এত ভয়, আবার কাকেই বা এত তাচ্ছিল্য? তাঁকে? তাঁকে তো ভয় বা তাচ্ছিল্য করার কিছুই নেই। তিনি তো আজ পর্যন্ত মনে-প্রাণে প্রতিবন্ধক হতে যাননি কোনও বিষয়ে। কখনও মতানৈক্য হলেও পর মুহূর্তে তা মিটে গেছে। তিনি ছায়ার মতই দীর্ঘ রেখা রেখে চিরদিন চলেছেন পিছে পিছে। তিনি কুলবধূ—নতি ও বিনয়ে সন্নত হয়ে রয়েছেন চিরদিন। তবু তাঁকে ভয়? তবু তাঁর কাছে আত্মগোপন? কমলকামিনী বালিশে মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকেন।

অমরেশ পিছন থেকে এসে বলে, 'অন্ধকারে ঘরে বসে কি করছ মা?'

'কিছু করছি নে বাবা, অমনি শুয়ে রয়েছি।'

'না, তুমি কাঁদছ—এই যে চোখে জল।'

'তুই যে কি ছেলে হয়েছিস বাবা!'

'আমার হাতে জল লেগেছে, তুমি গোপন করবে কি করে, আচ্ছা মা, তোমার দুঃখ কিসের? তোমার এত বড় বাড়ী, এত বড় ঘর, এত ধান, চাল টাকা পয়সা, তোমার আবার ভাবনা কি?'

'বাড়ী ঘর টাকা পয়সা থাকলেই বুঝি ভাবনা থাকে না? তোর মুখেই তো শুনেছি: দেশবন্ধুর কত বড় বাড়ী, কত ধন-দৌলত, তবু তিনি না কি ভেবে মরতেন কি করবেন ও-সব দিয়ে।'

'হ্যাঁ, তিনি তো ভাবতেনই। ভাবতে ভাবতে তিনি সব দান করে দিলেন পরের জন্য। ঘর-বাড়ী-ধন-দৌলত সব।'

'আমিও তাই দেবো বাবা, দিয়ে তোমার সংগে গিয়ে থাকব ছোট্ট একখানা ঘরে কলকাতায়।'

'তুমি কি তা পারবে মা, পারবে?'

'খুব পারব বাবা, খুব পারব।'

বাস্তবিক ত্যাগ ও বৈরাগ্যের যে মহা মন্ত্র বালকের মুখ থেকে কমলকামিনী শুনেছেন, সেই মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ভাল লাগে না এ সংসারের ক্লিষ্ট আবেষ্টন। নিজেকে মুক্ত করে দূরে চলে যেতে ইচ্ছা করে। কত দূরে, তা তিনি বলতে পারেন না। ভাল লাগে না বিপ্রপদর কথা ভাবতে। অভিমান অনুযোগও নেই কারুর ওপর। ভালও তিনি বাসেন না কাউকে। তিনি সকল দাবী-দাওয়া ত্যাগ করেছেন। তাঁর আসন যে-ই এসে অধিকার করুক, তাতেও তাঁর ক্ষোভ নেই। তিনি শুধু এ বন্ধনের মুক্তি চান। বিনিময়ে তিনি তাঁর সমস্ত স্বত্ব দান করে দিয়ে যাবেন অক্লেশে।...না, না, এ অসম্ভব কথা! তাঁর মত স্ত্রীলোক তা পারেন না। বিপ্রপদকে না হয় তুলে দিয়ে গেলেন ডাইনীর হাতে। কিন্তু তাঁর সেবা, রেবা, এই যে অমরেশ, ঐ যে বিনু—ওদের দিয়ে যাবেন কার কাছে? মা ওদের নেই, বড় মাও চলে গেছেন, এ ব্যথা তিনিই তো সইতে পারেন না, ওরা সইবে কি করে? ত্যাগ তিনি কিছুই করতে পারেন না, বৈরাগ্য শুধু তাঁর কাছে কল্পনা। সত্য সত্যই কি তিনি বিপ্রপদকে ফেলে রাখবেন ডাইনীর কবলে? এত দিন তিনি যা ভোগ করেছেন, নিজের একান্ত বলে

জেনেছেন, তা এত সহজেই তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেবে কেউ? তাঁর জিনিষ তিনি সংগ্রাম করে ছিনিয়ে আনবেন। অবুঝ হলে শাসন করবেন, প্রয়োজন হলে তিরস্কার করবেন—তা বলে কি বিলিয়ে দেবেন একটা অপরিচিতা মেয়েমানুষের কাছে? এ স্বত্ব তাঁর সংরক্ষিত স্বত্ব—অপরের পক্ষে দাবী করা নিষ্ফল?

বারো

বেশ স্ফূর্তিতেই চলেছে বিলের কাজ।

সকাল বেলা কৃষাণেরা, বর্গাদারেরা এবং যারা প্রজা হয়ে এসেছে তারা—সকলে মিলে কুড়ি-পঁচিশখানা হাল জুড়ে মনের আনন্দে চাষ করে চলে। বড় বড় এক-এক খণ্ড জমির চাষ দুপুরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তার পর তারা মই জোড়ে। মইতে চড়ে আনন্দে তারা এক-এক জন বলদগুলোর সংগে হৈ-হৈ করতে থাকে। টাল সামলাতে না পেরে সময় সময় মই থেকে পড়ে যায়। ক্ষীরের মত কাদাগুলো ছিঁটে উঠে চার দিকে ছড়িয়ে যায়। আবার দৌড়ে গিয়ে মইর ওপর চড়ে। এমন বলবান মজবুত বলদ দিয়ে মই দিতে কি আরাম! লোকের দু'টো-চারটে ভাল বলদ থাকে আর ওদের সব কটাই ভাল।

দুপুরের পর বেলা যখন একটু শেষ হয়ে আসে, গ্রীষ্মকাল বলেই তখনও রোদ পড়ে না। গরমও কমে না। তবু তারই মধ্যে চলে আবাদের কাজ। মাথায় গামছা জড়িয়ে ওরা বুনো পতিত জমিগুলির জংগল, নানা ঘাস ও গোলপাতা কেটে পরিষ্কার করে। একসংগে লম্বা-লম্বা হাতিয়ার চলে অনেকগুলি। দরদর করে ওদের সর্বাংগ বেয়ে ঘাম ঝরে, হাতিয়ারগুলো রোদে চমকায়। কখনও একটা চিল ডেকে যায়, কখনও শূন্য আকাশে দু'-একটা শকুন চলন্ত বিন্দুর মত ঘুরে ঘুরে উড়ে চলে।

মালা ও আবদুলের যুবতী বৌটা তখন ভিজা শাড়ী জড়িয়ে, ভাল করে বুক-পিঠ আব্রু করে ঐ পথে জল নিয়ে আসে। কাঁখে ঠাণ্ডা জলের কলসী—কিন্তু উত্তপ্ত কৃষাণ মজুরগুলির চাহনি। ওরা হেসে তাড়াতাড়ি টিলার উতরাই ভেঙে গিয়ে ওপরে ওঠে।

এ সব কাজে বিপ্রপদকে এঁটে ওঠা বড়ই দুষ্কর। তিনি একা করেন পাঁচ জন কৃষাণের কাজ। এক এক কোপে তিনি মোটা মোটা এক একটা গোলের ছোপা কাত করে ফেলেন অক্লেশে। রানা ঘাস তো মাথা সমান উঁচু হলেও তিনি গ্রাহ্যই করেন না। তাঁর সারা দেহের মাংসপেশীর সঞ্চালন দেখে গেঁয়ো নাম-করা বলিষ্ঠ কৃষাণদের তাক লেগে যায়। তাঁর সংগে কেউ আর পাল্লা দিয়ে কাজ করতে সাহস পায় না। এক দিন তিনি কি একটা সাপই যেন সাফ করে ফেললেন বন-বাদাড়ের সংগে। খানিকটা জল একেবারে রক্তে রাঙা হয়ে যায়।

এ বছর কেন, আরও এক বছর এ সব জমিতে চাষ দেওয়া যাবে না। এক-একটা গোঁজ দিয়ে গর্ত করে পুঁতে যেতে হবে ধানের চারা। মাটির তেজে ফসল তাতে কম হবে না। হয়ত বেশীও ফলতে পারে—আবহাওয়ার আনুকূল্য থাকলে নতুন আবাদী জমিতে অনেক বেশী ফলতেও ঢের দেখেছে কৃষাণেরা। বিপ্রপদর ভাগ্য ভাল, ফলতে পারে অনেক বেশী।

নিতাই প্রথম প্রথম এ সব কাজে আসতে বিপ্রপদকে বাধা দিয়েছে। কিন্তু তিনি সে কথা শোনেননি। তিনি চুক্তির কথা জানেন। চুক্তি যা আছে, তাই যে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে হবে, এ চুক্তি তো তিনি করেননি কারুর সংগে। তবে নিজের যথেষ্ট অবসর রয়েছে। বসে না থেকে হাতিয়ার চালালে দোষ কি? তিন বিঘে সাফ হলে এক বিঘে তো তিনিই পাবেন। আর ওরা তো বসে নেই। সংগে সংগে কাজে নামছে, স্তূপাকার করছে বন জংগল।

সেবার গোলপাতা বেচেও বেশ টাকা পান বিপ্রপদ। তাই টাকার জন্য নিত্য লোক পাঠাতে হয় না বাড়ীতে।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের এত রোদেও মালাকে অস্থির করতে পারেনি। কখনও রেণু রেণু ঘাস জমলে খোলা-মেলা দিগন্ত-জোড়া মাঠের সপ্‌সপে হাওয়ায় তা শুকিয়ে যায়, মিলিয়ে যায় দেহের সংগে। শুধু একটা ক্ষীণ রাঙা আভা ছড়িয়ে থাকে সারা মুখে।

মালা বলে, 'বাবুজী, গরম এবার টের পেলাম না দুরন্ত হাওয়ায়।'

'ছোট একটা খড়ের ঘর, তাতে জ্যৈষ্ঠ মাস, তাই বুঝি ঠাট্টা করছ আমাকে?'

'না, না, এমন মিঠে হাওয়া দেখিনি কোনখানে। জলো জমি, মিঠে হাওয়া, তাই তো এত রোদেও কৃষাণেরা কাজ করে অনায়াসে। বুক ভরে খাটে তবু নালিশ করে না কক্ষণো।' মালা বলে, 'ঐ না সুন্দরবন? ওখানে যাব এক দিন—কেমন বাবুজী?'

মালার দিকে চেয়েছিলেন বিপ্রপদ, জবাব দেন, 'যাবে। কিন্তু সুন্দরীরা সাধারণত সুন্দরবনে যায় না, তারা ঘরেই থাকে।'

'এবার আপনি ঠাট্টা করলেন আমাকে? বিলে এসেছি, বনে যাব কি?'

'কোনও দোষ নেই।'

'রামায়ণ-মহাভারতে তো কত নজির আছে।'

'আছেই তো। কিন্তু বাঘের ভয়ের নজির নেই মালা—ডোরা ডোরা সুন্দরবনের বাঘ, সুন্দরীদের দেখলেই হালুম করে ওঠে।'

'সে ভয় আমার নেই, আমি তো বাঘিনী।'

'তবে তো ভয়ের কথা আমারই—এক ঘরে বসত করি।'

'আচ্ছা ওগুলো কি দেখাচ্ছে? খুব ছোট-ছোট—ঐ বনের পাশ দিয়ে নদীর চরে এসে নামল—ঐ যে—'

'তুমি যা দেখতে চেয়েছিলে, তাই—হরিণের পাল এসেছে জল খেতে। আজ ভাল করে দেখে নেও।'

'হরিণ! হরিণ!' মালা কি যে করবে, খানিকক্ষণ দিশাই পায় না। তার পর চেয়ে থাকে যতক্ষণ ওরা না জল খেয়ে চলে যায়। 'একটা বাচ্ছা যদি ধরতে পারতাম, কেউ দিত আমাকে!'

'তোমার চিরদিনই অদ্ভুত সখ। একটা টিয়া হয়েছে, ময়না হয়েছে—এখন একটা হরিণের বাচ্ছা চাই। তার পর বলবে, একটা বাঘের বাচ্ছা এনে দিতে। তোমার কটা বাচ্ছা চাই? এত সখ দেখিনি কারুর!'

বিপ্রপদ সহজ ভাষায় যা বলেন, মালা জটিল ভাবে তা গ্রহণ করে। তাই সে পাশের ঘরে চলে যায় মুখ না তুলে।

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এসেছে। গরুগুলো একটা-একটা করে গোয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল। মালা বলে, 'সারা বিলে এমন গরু দেখিনি আমাদের গরুগুলোর মত। গা বেয়ে যেন তেল ঝরে পড়ছে।'

'ওরাই তো আমার লাভের সামগ্রী। একটা বছর যাক, দেখবে ওদের দাম হয়েছে দুনো। হাল-হালুটির লাভই হচ্ছে বলদ মোষ। ওরা বেঁচে থাকলে সামনের বছর চিন্তা কি! এবার বীজধান লাঙ্গল-জোয়াল খড়-কুটো সবই জুড়তে হয়েছে—কিনতে হয়েছে গরু-বা[illegible] সামনের বছর সব জোড়া-গাঁথা থাকবে, বিলে এসে হাল হয়েছে। হলো। একটা বছর কামড় খেয়ে থাকতে পারলে আর [illegible] নাগাল পায় কে?' বিপ্রপদ সস্নেহে বলদগুলোর গায় হাত বুলান, ওরা এগিয়ে এসে গলা বাড়িয়ে দেয়।

'আচ্ছা, আগামী বছর এমনি দিনে, এমনি সময় আমি থাকব কোথায়? আপনি তো চাষ-আবাদের কাজ সেরে যাবেন বাড়ি[illegible] তারপর কোন সময় আবার শীতকালে ধান কাটাতে আসবেন!'

'চাষের কাজ সারা হলে সকলে যেমন বাসা তুলে দেশে যায়, আমরাও তেমনি যাব। শুধু প্রজারা থাকবে—তুমিও যাবে।···কিন্তু তারপর?···না, না, তুমি যাবে, না এখানে থাকবে তা এখন পর্যন্ত ঠিক করতে পারিনি। অবশ্য যা হক একটা করবই।'

'এর মানে? কত দিন দেখি বাড়ী নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন—আজ এ আবার বলছেন কি? তবে কি আমি একা বিলে পড়ে থাকব? আমাকে ফেলে যাবেন এখানে?'

'তুমি অমন করছ কেন? একটা কিছু স্থির করতেই হবে আমাকে। এখনও তো ঢের সময় আছে।'

'আমি আপনার সংগে গেলে আপত্তি কি?'

'আমার আবার আপত্তি থাকতে যাবে কেন? এতে তো আমার কোনও লাভ-লোকসান নেই।'

'তবে ভয় কাকে?'

'কাকে আবার ভয় করতে যাবে বিপ্রপদ বোস?···অন্ধকার হলো, গরুগুলো একটু বেঁধে রেখে আসি, রাত্রে কথাবার্ত্তা হবে 'খন। বুঝলে মালা, তোমার চেয়ে এ বিষয় আমার চিন্তা ঢের বেশী।'

বিপ্রপদ যতই যা বলুন, মালার চিন্তা কমে না।

মালা যেন বিপ্রপদর কাঁধে একটা ভারী বোঝার সামিল। এমন বোঝা যা ফেলাও যায় না, টানাও যায় না। তিনি ভারসাম্য না করতে পেরে কেবলই টাল-মাটাল করছেন। দেহের সংগে সংগতি রেখে মনও তাঁর দোদুল্যমান।

মালা লক্ষ্য করে, অত বড় একটা শক্তিশালী পুরুষেরও কোথায় যেন একটা দুর্বলতা রয়েছে। সে দুর্বলতা কার জন্য? তাঁর স্ত্রী কমলকামিনীর জন্য? মালার মনে ভয় হয়। আর ভাবতে সাহস হয় না তাঁর কথা।

রাত্রে বিপ্রপদকে একান্তে পেয়ে মালা জিজ্ঞাসা করে, 'আমি এখানে থাকতে পাবি নে? ওই আবদুল থাকবে, রহিম থাকবে, আমিও না হয় থেকে যাব এখানে। যখন আবার শীতকালে আসবেন, দেখা হবে। আপনি ভাববেন না বাবুজী আমার জন্য।'

'তা কি সম্ভব?'

'তবে আমাকে ফেলবেন কোথায়? আমি তো আপনার কাছে একটা বোঝার সামিল।'

'যিনি বোঝা দিয়েছেন, তিনিই বইবার ক্ষমতা দেবেন—তুমি আমি ভেবে করব কি?'

'তবু তো মানুষে না ভেবে পারে না।'

'ভাব, দেখ কিসে কি হয়?'

বিপ্রপদ হঠাৎ কান খাড়া করে জিজ্ঞাসা করেন, 'মালা, ও কিসের শব্দ?'

'গোয়ালে একটা বলদ গোঙাচ্ছে যেন!'

'মালা, সর্বনাশ, সর্বনাশ! নিতাই—নিতাই! ও—ও নিতাই! ইমাম,—ইমাম! একটা লণ্ঠন দাও মালা—তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো!'

বিপ্রপদ ছুটে যান গোয়ালের দিকে। মালাও ছোটে পিছে পিছে। একটা বলদ চারটা ঠ্যাং শূন্যে তুলে পাগলের মত ছিটাচ্ছে—আর থেকে থেকে একটা করুণ দৃষ্টি মেলে ধরছে বিপ্রপদর দিকে। তিনি গরুটার বাঁধন খুলে তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে আসেন বাইরে। হাঁপাতে থাকেন একটা কি যেন ধরে। 'একটু জল—জল নিয়ে এসো। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না—যাও।'

'এই যে জল।'

'নিতাই, ইমাম, তোমরা কি কানে তুলো দিয়েছিলে এতক্ষণ? কৃষাণেরা কোথায়?'

'খেতে বসেছে, এক্ষুণি আসবে।'

'এখন যা করার তাই করো, আমি আর দেখতে পারি নে ওর ছটফটানি।'

'কিছু করার নেই বাবু।'

'তবে মরবে আমার বলদ—অমনি অমনি মরবে?'

ওরা অপরাধীর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিপ্রপদ বলদটার মাথায় জল দেন, গায় জল দেন, জিবটা ভিজিয়ে দেন বার বার। তিনি বলদটার গায় হাত দিয়ে পরীক্ষা করেন, গা গরম, লোমগুলো খাড়া। ভয়ানক জ্বর হয়েছে। তবে জল গায় দেওয়া ভুল হলো না কি? তিনি ঘর থেকে একখানা কম্বল টেনে আনেন। বলদটার গায় দিয়ে দেন—নীচে বিছিয়ে দেন নরম পোয়াল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না দেখে একজন ওঝা ডাকতে বলেন।

ওঝা আসে। সে নাকি গো-বৈদ্যও। এসে খুব আশ্বাস দেয়। ফিকির করে সের আষ্টেক চাল নেয় কয়েক বাটি তেল। তারপর নাচানাচি দাপাদাপি করে আগুন জ্বালিয়ে। বলদটাকে একটু ভাল মনে হয়। শ্রদ্ধা হয় সকলের ওঝার উপর। ওর মন্ত্রের গুণ আছে! ওঝা ইত্যবসরে তার মজুরী নিয়ে সরে পড়ে।

'তোমরা তো বললে কোনও চিকিৎসা নেই—এখন দেখলে তো? আমি বিশ্বাস করতাম না ওঝা-বৈদ্যে, তবু ভাবলাম, পরীক্ষা করে দেখি—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ! ফল তো ভালই হলো। ওদের অবজ্ঞা করে করেই ওরা বুনো বাজে হয়ে গেছে। আমরা না হয় অবজ্ঞা করতে পারি, তোমাদের তো তা করা উচিত নয়।'

সকলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কয়েক ঘণ্টা বাদে আবার বলদটা গোঁঙাতে থাকে। আবার সেই ছটফটানি। বলদটা মারা যায়।

বিপ্রপদ সারা রাত ওটার গায় হাত দিয়ে বসে থাকেন। কৃষাণেরাও জেগে থাকে।

মালা আলোটা নিয়ে চুপ করে থাকে দোর-গোড়ায়।

দু'-তিন দিনের মধ্যে একটা-একটা করে সব কটা বলদ—ঝড়ে যেমন কলা গাছ পড়ে, তেমনি পড়ে, আর মরে।

রোগ এসেছে রাক্ষসের মত করাল দংষ্ট্রা মেলে, তাকে রুখবে কে?

'আমার বুদ্ধি ও শক্তি দু'ই নষ্ট হয়ে গিয়েছে নিতাই! আমার মুখের দিকে চেয়ে বসে থেকো না। যা ভাল বোঝ, ইমামের সংগে পরামর্শ করে করো।'

'টাকা আনতে যেতে হবে শক্তিগড়—বলদ কিনতে যেতে হবে যশোহর জেলায় এক হাটে। আমি শক্তিগড় থেকে ফিরে এলে, ইমাম যাবে কৃষাণদের নিয়ে রওনা হয়ে। এবার কিন্তু বাবু বলদ একটু কেন বেশ চড়া দাম দিয়ে কিনতে হবে। মাল কম, খদ্দের বেশী। যেখান দিয়ে যে আসে, তার মুখেই এই মড়কের কথা শুনি। এমনি ধারা একটা মাস চললে আউসের খন্দ মাটি—আমনেরও বীজ ছড়ান যাবে না। দু'-একখানা যা চাষ পড়েছে, তাতেই তো আর জমি সাজান হয়নি!'

'টাকা—কত টাকা লাগবে অনুমান করো? হাজার খানেক নিয়ে গেলে মন্দ হয় না, কি বলো? দু'-চারটা বেশী বলদ আনাই ভাল, কেমন নিতাই?'

'তা হলে তো ভালই হয়। কিন্তু অত টাকা কি ঠাকরুণ আমাকে বিশ্বাস করে দেবেন?'

'টাকা কার? তাঁর, না আমার? আমি কি ছেলেমানুষের মত টাকা জলে ফেলে দিচ্ছি?...এই চিঠি নাও। শোনো, তোমার মা-ঠাক্‌রুণকে একটু ভাল করে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে বলো। তিনি ঘরে এসেছেন অবধি আজ পর্যন্ত আমি মনে এত বড় দাগা পাইনি।

তাঁরই ভাগ্যে আমি পরিপূর্ণ মান-সম্মান নিয়ে সব বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছি। আজ বিধাতা যে কেন এ পরীক্ষায় ফেললেন জানি নে। যাক, তুমি রওনা হয়ে যাও। কবে ফিরছ?'

'যত তাড়াতাড়ি পারি।'

বিপ্রপদ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একা-একা খানিকটা ঘুরে বেড়ান।

মালা বিপ্রপদ ও নিতাইর সব কথা শুনেছে। এত দিন বাদে বিপ্রপদ তাঁর মর্মকোষ খুলে দেখালেন। সেখানে যে মধু সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, তা কমলকামিনীরই শ্রম যত্নলব্ধ। মালা এক ফোঁটাও আহরণ করে দিতে পারেনি। যদিও সে দিয়ে থাকে, তার একটি বিন্দুও যে ওখানে জমা হয়েছে, তার পরিচয় কোথায়? তিনি তো তা স্বীকার করেন না। তবে সে এত দিন ধরে দিল কি? ব্যথা, গ্লানি, নৈরাশ্য? মালা আর ভাবতে পারে না। সংকুচিত হয়ে থাকে।

প্রজাদের যে ক'টা বলদ বেঁচে আছে, সেগুলোরও যখন আশা নেই, তখন আর মায়া করলে কি হবে? বিপ্রপদ কঠোর সেনাপতির মত হুকুম দেন, 'সারা দিনে আর বিশ্রাম দিও না। যতক্ষণ জান আছে, ততক্ষণ কাজ আদায় করে রাখ। রাত্রে পুরো খেতে দেবে, একেবারে বাছা-বাছা ঘাস। খাটুনির ধাক্কায় গরু মরবে না, যদি রোগের হাতে রেহাই পায়। বেঁচে যেটা থাকবে, একেবারে লোহার মত শক্ত হবে, কলিজা হবে পুরু। দুপুর পযন্ত কৃষাণেরা আমার হাল চষবে, তার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমরা—দিনমানে কাজে কামাই দেওয়া চলবে না—মুখে যদি রক্ত ওঠে তবুও না।'

বিপ্রপদ নিজেকে নিজে সজ্জিত করে নেন। দৈবের সংগে লড়তে হবে। তিনি যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজেকে প্রবুদ্ধ করেন—হৃত শক্তি ফিরিয়ে আনেন বুকে! একবার বলদ মরেছে, হয়েছে কি? নিতাইর মত গৃহস্থ যদি দশ-দশ বার চোট খেয়ে আজও বেঁচে থাকতে পারে, তিনি পারবেন

না কেন অন্তত পাঁচটা বারেও চোট সামলাতে? টাকা লাগবে? লাগুক টাকা। তিনি সঞ্চয় করেছেন, তিনিই আবার ব্যয় করবেন। এ তো অন্যায় অহেতুক ব্যয় নয়। যদি কেউ তাঁকে বাধা দেয়, দিলেই বা তিনি শুনবেন কেন সে কথা?

যে ক'দিন নিতাই না ফিরে আসে, সে ক'দিন বিকালে কৃষাণদের কোনই কাজ নেই, কিন্তু বিপ্রপদ তাদের বসতে দেন না। আগে ওদের জন্যে যেটুকু মায়া-মমতা ছিল এখন তা যেন আর নেই। 'দুপুর বেলা আবার ঘুম কেন? সারাটা রাতই তো নাক ডাকাও—কোনও চিন্তা-ভাবনার তো ধার ধারো না। এসো সকলে বেঁকি দা নিয়ে, চলো আবাদ করতে। একদিকে ক্ষতি হলে আর একদিক দিয়ে পুষিয়ে নিতে হবে সে চোট।'

এমনি ভাবেই জমি আবাদের কাজ পূরো দমে চলে।

কিন্তু সে ক'দিন? নিতাই যেন ঘোড়ার মত ছুটে গিয়ে ফিরে আসে।

'এত তাডাতাডি এলে কি করে? টাকা পেয়েছ তো? কেমন আছে বাড়ীর সব?'

'ভাল।' বলে নিতাই টাকার তোড়াটা বিপ্রপদর হাতে দেয়, এবং ইচ্ছা করেই দীনুর কীর্তিটা গোপন রাখে। 'আমার তো একটা চিন্তা আছে। একা ডোঙা বেয়ে গিয়েছি—রাত-দিন বৈঠা জিরোয়নি, হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে, আবার টাকা নিয়েই ফিরে এসেছি। নিজের বাড়ী উঠেও একটা খবর নিতে পারিনি যে, কে কেমন আছে।' একটা ক্লান্তির শ্বাস ফেলে গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে থাকে নিতাই।

কৃষাণেরা ভয়ে ভয়ে রওনা দেয় ইমামের সংগে। কোথায় কত দূরে যেতে হবে যশোহরের জেলা। তারা নিজের গ্রামের আশ-পাশের দু'-একটা বন্দর ছাড়া চেনে না। অনেকেই রেলগাড়ী তো দূরের কথা,

জাহাজেই চড়েনি—যে জাহাজ নিত্য দু'বেলা ওদের দেশের নদী দিয়ে চলে। যশোহরের লোক দেখতে কেমন, কি ভাষায় কথা বলে, তা যারা জানে না তারা মিশবে কি করে তাদের সংগে। ইমাম অনেক বার সে দেশে গেছে ইছমাইল মিঞার সংগে যখন গরুর কারবার করত। সে সকলকে সাহস দেয়। পথ-ঘাট সব তার চেনা। শুধু শিকল বেঁধে তার পিছু-পিছু চললে আর কোনও অসুবিধা হবে না, বিপদেরও আশংকা থাকবে না। রেলে-ষ্টীমারে ঠিক মত চড়াতে নামাতে পারবে। যদি শিকল ভেঙে কেউ এ-দিক ও-দিক যায়, তবে আর একা-একা দেশে ফিরতে পারবে না। চালান হয়ে যাবে কলকাতা। কলকাতা এক আজব সহর। সেখানে হাজার-হাজার রাস্তা ঘাট, লাখ লাখ গলি ঘুঁজি। সে দেশে কারুকে কেউ চেনে না—কারুকে কেউ পথ দেখিয়ে দেয় না। অতএব খুব হুঁশিয়ার যেন।…কথাবার্ত্তা সব শুনে সব চেয়ে যে ছোট কৃষাণ, সে এখনি গিয়ে পিছু নিয়েছে ইমামের। ইমাম বলে, দূর বোকা, এখনই কি? ষ্টীমার-ঘাটে যেয়ে তবে চলতে হবে নির্দেশ মেনে। সে কাঁচা টাকাগুলো ভাল করে বাজিয়ে কোমরে বাঁধে।

'মিতা, আবাদ চোরা গরু কিনে দায় ঠেকো না সেবারের মত।'

এবার সে তা কিনবে না।

'যাবে রেল-ষ্টীমারে, আসবে হেঁটে—ফিরতে ক'দিন লাগবে?'

'আইজ রওনা দিমু, কাইল গিয়ে পুঁছুম, পুঁছইয়াই ধরুম হাট, হাটের পর ফের রওনা দিমু বিলের দিকে। আইতে লাগবে মোটে দুইডা দিন। এই দুই রোজ দিনে-রাত্তিরে ঘুম-নিদ্রা নাই, খাইতে হইবে চিড়া মুড়ি আর চলতে হইবে পথ।'

'তোমরা না হয় চিঁড়ে-মুড়ি খেলে—গরুগুলো?'

'সে আর শুনে কি হবে বাবু, কত লোকের খেত-খামারে জিরেত কৃষি রয়েছে, তাই রাত-বিরাতে খাওয়াবে।'

'ধরে ঠেঙিয়ে গরু বাছুর কেড়ে রাখবে না তো?'

'টের পেলে তো? আর আমাদের দেশের লোকের নাম শুনলেই ভয়ে জুজু।'

'যাক, খুব সাবধান—আমাদের কিন্তু সময়টা বড় মন্দ।'

'চাষ-আবাদের কাজ করলে এ রকম মন্দ সময় প্রায় প্রত্যেক বছরই আসে—রুই-কাতলারা সামলাতে পারে, চুনো-পুঁটিরই মরণ। এই ধরুন, আমাদের মত লোকের পক্ষে ক'বার গরু কেনা সম্ভব?'

মুখে কিছু না বললেও বিপ্রপদ মনে মনে স্বীকার করেন, এ রকম ধাক্কা এলে দু'-চার বার না হয় সামলান যায়, কিন্তু তার বেশী এলে রুই-কাতলাও কুপোকাৎ।

কৃষাণেরা নেই, ইমাম নেই—আছে শুধু নিতাই। সে সারা দিন বিশেষ কোন একটা কাজ করে না, কিন্তু সব ক'টা বাসার ফাই-ফরমাশ জাগাতেই অস্থির। কার কি লাগবে তাই এনে দিতে হবে। প্রজাদের যে ক'টা গরু এখনও জীবিত, সেগুলোর তত্ত্ব-তালাসি সে না করলে করবে কে? দড়ি আনো, পাট কেনো, হাল-জোয়াল গুছিয়ে রাখো—এমনি হাজারও খুঁটি-নাটি কাজ। তাই বিপ্রপদ আর নিতাইকে ডাকেন না। নিজেও এক মুহূর্ত বসে থাকতে পারেন না। ন ছটফট করে। তিনি ছুটে জমির দিকে যান। মনে মনে একটা হিসাব করে দেখেন, ক'বিঘা আউশের জমি সাজান হলো আর ক'বিঘেই বাকী। একখানাও রীতিমত সাজান হয়নি। বীজ আর বড় না হলে রোয়ার সময় না এলে সাজিয়েই বা লাভ কি? তাতে বন জংগল জন্মাবে, আবার দিতে হবে চাষ। অন্তত আর পনরটা দিন ঠিক মত ই হাল ক'খানা চললে আউশের জমির চাষের কাজ সারা হয়ে যেত য়া যেত বীজ।

কিন্তু দুর্দৈব এই পনরটা দিনও অপেক্ষা করল না—একেবারে

লাথি মেরে ফেলে দিল যেন সমুদ্রে। এখন সবাই মিলে হাবুডুবু খাচ্ছে। যদি কোনও কারণে আউশের ফসল না জন্মে, তবে বিপ্রপদ কি দিয়ে চালাবেন এত ব্যয়? কৃষাণদের দাদন দিতে হবে, বর্ষাকালে জমিতে ঘাস থাকবে না, বলদগুলোর খোরাকীর জন্য আরও খড় কিনতে হবে—তার ওপর এতগুলো লোকের আহার্য যোগান চাই। খরচের আর অন্ত নেই। ওটা যেন একটা বুভুক্ষু রাক্ষস। মুখ ব্যাদান করে বিপ্রপদর কাছে কেবলই চাইছে: আরো দাও, আরো দাও। তিনি চোখ বোঁজেন। কপালের শিরাগুলো টিপে ধরেন। ভুলতে চান রাক্ষসটার ক্ষুধিত ভয়াল মূর্তি। বেঁকি দাখানা নিয়ে আবাদ করতে যান জংগল। কাজে ব্যস্ত থাকলে তবু মনটা খানিক বিশ্রাম পাবে। ..

'বাবুজী একা-একা যাবেন না বনে-জংগলে। সময় আমাদের ভাল না—কত সাপ-খোপ আছে।'

সে কথায় তিনি কর্ণপাত করেন না। একাই চলেন অনাবাদী জমির দিকে এগিয়ে। তিনি মানসিক পীড়নে অস্থির হয়ে পড়বেন শরীরটাকে না খাটালে। বিলে এসে উঠতে না উঠতেই দু'হাজার টাকা ব্যয় হয়ে গেল। দু'হাজার? হিসাব করলে বেশীও হতে পারে। কত দুঃখ-কষ্টের এ টাকা। আর কি তিনি এ জীবনে সঞ্চয় করতে পারবেন? এতেও যদি হতো, দুঃখ ছিল না। আরো কত লাগবে কে জানে! পুত্রশোকের চেয়েও তাঁর মত গৃহস্থের পক্ষে এ টাকার শোক বেশি।

সুখীর জায়গা কেনার দুর্বুদ্ধি কেন তাঁর হলো?

বিপ্রপদ যে চিন্তার ভয়ে পালিয়ে এলেন, সেই চিন্তাই এলো তাঁর সংগে সংগে। তিনি চিন্তার সূত্রগুলি কেটে ফেলবেন—একেবারে টুকরা-টুকরা করে। তেমনি ভাবেই কোনও দিকে দৃকপাত না করে হাতিয়ার চালাতে থাকেন। সূর্যের তির্যক্ রশ্মিতে হাতিয়ারখানা ঝলসাতে থাকে—আর ছিন্ন-ভিন্ন করতে থাকে বন-বাদাড়।

কে যেন পিছনে এসে একটা গোলপাতার গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকে।

কমলকামিনীর কাছে দিন দিন বিপ্রপদ যে অপরাধ করে যাচ্ছেন, তাঁরই দীর্ঘশ্বাসের কি এই পরিণাম? কে জানে, হয়ত হবে। আজ কত দিন গত হলো তাঁকে তিনি ডেকেও জিজ্ঞাসা করেননি। একটি বার তাঁর কথা মনে পর্যন্ত উদয় হয়নি। কমলকামিনী এখনও কিছু টের পাননি, এ অসম্ভব। সুখীর মা, নিতাই নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু তাঁকে জানিয়েছে। সে ক্ষেত্রে তাঁরও উচিত ছিল, সব তাঁকে খোলাখুলি জানান। তা তিনি করেননি। অথচ কমলকামিনী সব জেনে-শুনেও মালার সম্বন্ধে নীরব। এ নীরবতা যে কতখানি বেদনার গূঢ় অভিব্যক্তি তা আজ বিপ্রপদ বুঝতে পারেন। তিনি পাষণ্ড, নির্মম। ভাগ্যলক্ষ্মী তাই তাঁর দূরে চলে গেছে। মোহিনীর বেশে অলক্ষ্মী এসে দখল করে বসেছে কাঁর পরিত্যক্ত আসন।

বন জংগল ঘাস লতাপাতা কাটতে কাটতে তিনি এগিয়ে চলেন। বেলা যে কখন ধীরে ধীরে গড়িযে গড়িয়ে দিকচক্রবালে মিলিয়ে যেতে থাকে তা বিপ্রপদ খেয়ালই করতে পারেন না। কাজে তাঁর অসীম উদ্যম এসেছে। হাতিয়ার প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু অন্ধকারও তো হয়ে এলো। দক্ষিণের সুন্দরবন একটু একটু করে নীল হয়ে আঁধারে মিশে যাচ্ছে। দূরে বিলের জলে পানিকৌড়িগুলিকেও আর দেখা যাচ্ছে না। ওরা কালো, বিলের জলও কালো—তাই একাকার হয়ে গেছে ক্রমে।

মালা আর দাঁড়াতে পারে না—এগিয়ে গিয়ে লম্বা বেঁকিখানা সমেত বিপ্রপদর হাত চেপে ধরে। 'আজ আর থাক, কেটে-কুটে যাবে।'

'কে, মালা? কতক্ষণ এসেছ?'

'আপনার সংগে সংগেই।'

'সেই অবধি তুমি ঠায় দাঁড়িয়ে, আর আমি দেখিনি!'

'আজকাল তো আপনি ব্যস্ত, দেখবেন কি করে?'

সেই এক সুর। বিপ্রপদ কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাসার দিকে ফিরে চলেন।

'এত খাটলে কি শরীর টিকবে?'

'করব কি? চুপ করে বসে থাকলে তো আরও ভয়।·· তুমি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলে অথচ আমি টের পাইনি!'

আর কোনও কথা হয় না—তু'জনে চলতে থাকেন।

বাসায় এসে সংবাদ পান, প্রজাদেরও বলদ মরতে সুরু করেছে।

'যাক, মরুক, যে ক'টা বেঁচে আছে তাদের জিরান দিও না। মরে মরুক, তুঃখ করো না আবতুল—শক্ত হয়ে যতটা পারো, দাম তুলে নাও।'

বিপ্রপদর মুখে সেই কঠিন ও নির্মম আদেশের পুনরাবৃত্তি শুনে ওরাও মরিয়া হয়ে চাষ করতে সুরু করে। জানোয়ারগুলোকে একটুও দাঁড়াতে দেয় না। হাঁটতে না চাইলেও সপাসপ লাঠি মারে। তবু ওদের যেন গায়ের ঝাল মেটে না—যেখানে-সেখানে এমন কি চোখে মুখে পর্যন্ত গুঁতো মারে। তু'-দিনের কাজ এক দিনে আদায় করে নেবে। মড়ক এসেছে, ওরা মরছে—এ যেন ওদেরই দোষ, তাই আক্রোশটা প্রজা মনিবের ওদের ওপরই পড়ে।

তু'দিন যেতে না যেতেই আবার এক কুড়ি বয়েল কাত। এগুলোর টাকাও প্রায় সবই বিপ্রপদর দাদন করতে হয়েছে। কথা ছিল 'আয়ামে শোধ করে দেবে ওরা ধান বেচে। কোথায় 'আয়াম', কোথায়ই বা ফসল, কেমন করেই বা ওরা শোধ করবে তাঁর ঋণ?

সেই ক্ষুধাতুর রাক্ষসটার মূর্তি তাঁর চোখের সুমুখে আবার ভেসে ওঠে। 'দাও, দাও,—আরও চাই।'

আবার দাদন দিতে হবে, আবার পাঠাতে হবে বলদ খরিদ করতে। তাও যদি মরে, তখন কি হবে? তবুও ওদের অগ্রিম দিতে হবে—

চালিয়ে যেতে হবে সব খরচ। না হলে এখানে কিসের আশায় এসেছে ওরা? আবার নিতাইকে টাকা আনতে আজই পাঠাতে হবে। দেরী করা মোটেই উচিত হবে না। একটি দিন—এমন কি একটি বেলাও আজ বিপ্রপদর কাছে মূল্যবান। আউশের মরসুম—এখন যে অসময়ের জীবিকা বোরো ধানের মরসুম! ধান তাঁর জন্মান চাই-ই—অসময়ের বান্ধব সুপুষ্ট বোবো ধান। না হলে কিসেব জোরে বাঁচবে তাঁর মান, কি দিয়ে রাখবেন হালুটির অগ্রগতি? তাঁর বাড়ীতে ক্ষুধা, বিলে ক্ষুধা—অনন্ত ক্ষুধা যেন তাঁর চার দিকে জ্বলছে দাউ-দাউ করে!

'নিতাই, তুমি দেরী না করে আজই আবার যাও।'

'আমি আর যেতে পারব না বাবু, গিয়ে লাভ হবে না।'

'মেয়েমানুষেব মত এ সব বলছ কি? যেতে পারবে না, তবে আমাকে কেন বুদ্ধি দিয়ে এখানে এনেছিলে? তখন বোঝনি তোমাকেই সামলাতে হবে সব ঝামেলা?'

'আমাকে আর মা-ঠাকুরুণ টাকা দেবেন না, তা আমি আগের বারই বুঝে এসেছি।'

'দেবেন না বললেই হলো? আমার যেখানে যা আছে বলে দিচ্ছি—তা তুমি ছলে বলে কৌশলে নিয়ে এসো। আমি যেতে পারব না, গেলে এদিক অচল হয়ে থাকবে, তোমরা কাজে নামতে পার কিন্তু তা চালাতে পার না—তাই আমি যেতে পারব না। হুকুম তামিল করার লোক ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু দেওয়ার লোক কালে-ভদ্রে দু'-এক জন জোটে। যাও, আর দ্বিরুক্তি করো না। এই যে পত্র!'

নিতাই ক্ষুণ্ণ মনে রওনা দেয়।

বিলের সমস্ত প্রজাদের ডেকে বিপ্রপদ একত্র করেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের কাছে প্রায় এক কুড়ি হাল পাওনা রয়েছে আমার।

ইচ্ছা করলে তোমরা তা শোধ করতে পার। জিজ্ঞাসা করতে পার যে, গরু-বাছুর নেই কি করে পাওনা হাল শোধ করবে? তোমরা যদি লজ্জা না করো, অসন্তুষ্ট না হও, তবে উপায় একটা বলে দিতে পারি। চাষার ছেলের পক্ষে তা একটা কঠিন কাজ নয়। যত দিন গরু-বাছুর না আসে, তত দিন বসে-বসে ঝিমিয়ে লাভ কি? অন্তত আমনের বীজের জমিগুলো তো দুরস্ত করা একান্ত দরকার। কাজও তাতে অনেকটা হাল্কা হবে—আমি তা বললেই বুঝবে। চিন্তা করে দেখেছি, এতে কোনও দোষ নেই। নিজের কাজ নিজে করলে মানও যাবে না কারুর।'

রহিম জিজ্ঞাসা করে, 'কি করতে হইবে বাবু? আমাগো জানে কুলাইলে কি আমরা ফিরুম!'

'দু'-তিনখানা করে যে সব জমিতে চাষ দেওয়া আছে, এখন একটু লাঙল ঘুরিয়ে মই টানলেই বীজ ছড়ানর উপযোগী হয়, এমন দুঃসময়ে মানুষে লাঙল টানলে দোষ কি, একটু জান কবুল করে খাটলে?'

কথাগুলি বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে শ্রুতিমধুর করে বিপ্রপদ ওদের কাছে পরিবেশন করেন—যেন বহু দিনের অভিজ্ঞ এক জন পাকা কৃষক উপদেশ দিচ্ছেন ঝড়ে-জলে।

ওরা অভিভূত হয় এবং স্বীকার করে যে, কাল থেকে তাই করবে সকলে মিলে-মিশে।

জান-খালাস তিন ভাই-ই অগ্রণী হয়। দু'ভাই হালের জোয়াল বুকে ঠেকিয়ে ঠেলতে থাকে—আর এক জন ধরে হালের মুঠি। সুদৃঢ় মাংসপেশীগুলি সঞ্চালিত হতে থাকে, স্ফীত হয়ে উঠে ওদের দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। যে বিদ্রোহী মাটি এখনও হার মানেনি ওদের কাছে, সে মাটির বুক লাঙলের ফালে ফালা-ফালা করে চিরে সুমুখের দিকে এগিয়ে চলে ওরা। ওদের দেখা-দেখি আরও দু'খানা হাল চলতে থাকে

পাশাপাশি—মানুষের হাল, যেন দৈবের বিরুদ্ধে উদ্ধত বিদ্রোহের হাল।'

বিলের খাল দিয়ে যারা নাও বেয়ে যাতায়াত করে, তারা কেউ কেউ ওদের কাণ্ড দেখে দাঁত বের করে হাসে। কেউ কেউ বলে, 'সাবাস মরদ! এ না হলে রাখতে পরে হালুটি!'

দশ জন মানুষের মধ্যে ন'জনই খেটে যায় তিনখানা হালে—বাকী থাকে এক জন।

বিপ্রপদ বলেন, 'আবদুল দাঁড়িয়ে থেকো না—তুমি আর আমি একখানা মই জুড়ি।'

'এয়া কন্ কি, এয়া কন্ কি! ছোবান আল্লা—আপনে টানবেন মই?'

'আজ কোনও দোষ নেই। তুমি আমি এক। তোমার আর্জি, তোমার আক্রোশ যার বিরুদ্ধে, আমার আর্জি, আমার আক্রোশও তারই বিরুদ্ধে। তোমার একটু শক্তি কম তাতে হয়েছে কি? তুমি চড়ো মইর ওপর, আমি টেনে নিয়ে যাই দড়ি ধরে। কাজ নিয়ে কথা, মান নিয়ে কথা নয়।'

ঈশ্বরের অভিশাপের বিরুদ্ধে এমনি করে ওরা লড়াই করে চলে দিনের পর দিন। বুকে আশা ইমাম এলো বলে বলদ নিয়ে। ক'দিনই বা লাগবে তার আসতে। তখন তাজা যোয়ান যোয়ান বলদ জুড়বে হালে। এ দুঃখ এ কষ্ট তাদের বেশী দিন সইতে হবে না।

কিন্তু ইমাম আসে না। নির্দ্দিষ্ট দিন গত হয়ে যায়, তবু তার সংবাদ নেই। একটা কৃষাণও ফেরে না।

নিতাই এসেছে অনেক গঞ্জনা শুনে টাকা নিয়ে। কমলকামিনী রাগ হয়ে সেই চিটা গুড়ের টিনের ভিতরের আধুলিগুলা পর্য্যন্ত বের করে দিয়েছেন। এত দিনে তাঁর সংসারে শনির দৃষ্টি পড়েছে। অলক্ষ্মী নাকি অধিষ্ঠিত হয়েছে বিলে। এত অনাচার-অবিচারেও হবে না?

আর যেন নিতাই কখনও টাকা চাইতে আসে না তাঁর কাছে। তিনি বিপ্রপদর এক কপর্দকও রাখলেন না, সব কিন্তু বের করে দিলেন। যাঁর সংগে শুধু টাকার সম্বন্ধ, তাঁর হাতে যখন আর কিছু রইল না, তখন আর যেন কেউ এ-মুখো হয় না কোনও দিন কোনও প্রয়োজনে।

ছোট-খাট একটা পরামর্শ-সভা বসে। যে যা বোঝে সে তা বলে। একটা না দু'টো না একেবারে এগার-এগারটা মানুষ মিলিয়ে গেল হাওয়া হয়ে ?···টাকা নিয়ে কি ওরা পালিয়ে গেল ?···এ কথা যে বলে, সে একটা আহাম্মক।···বলদ কিনতে গেছে কতকগুলো বলদ নিয়ে। তার দু'-একটা পাল ছাড়া হলো না কি ?···পথে যেতে কোন বিপত্তি ঘটে নাই তো ?···এমনি আরও নানা কথার পর স্থির হয়, আজ জেল-খালাস তিন ভাই ও নিতাই যাবে পদব্রজে ইমামের খোঁজে। শেষ পর্যন্ত নিতাই কুড়িয়ে-গুছিয়ে যে ক'শ টাকা এনেছে, তাও সংগে নিয়ে যাবে। সে বুদ্ধিমান, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে।

শেষ বেলায় বিপ্রপদ বলেন, 'যাচ্ছো তো টাকা-পয়সা নিয়ে—যে ক'জন বিলে রইল তাদেরও সংগে করে নিয়ে যাও। শুধু আবদুল আর রহিম থাক।'

প্রস্তাবটা সংগত। ব্যবস্থাও তেমনি হয়। ওরা চলে যায়।

এত বড় বিলটা একেবারে যেন খালি হয়ে যায়। আবদুল বুড়ো মানুষ, রহিম রুগ্ন—ওদের হিসাবে ধরে কে ?

যদি শত্রুপক্ষ এ দুর্বলতার সংবাদ পায়, তবে বিলে এসে চড়াও হতে কতক্ষণ।

'মালা তুমি খেয়ে-দেয়ে ঘুমাও, আমাকেও খেতে দাও। আজ কেন, যে ক'দিন ওরা না ফেরে, সারা রাত বিল পাহারা দিতে হবে। তুমি একা থাকতে পারবে না ?'

'কি করে এই খালি বাসাটায় একা থাকব ?'

'একা থাকবে কেন ? এই নাও।' বিপ্রপদ একখানা ধারাল রামদা এগিয়ে দেন মালার কাছে। 'এখানা হাতের কাছে রেখে ঘুমিয়ে থেকো। বিপদের সময় মনে বল সঞ্চয় করতে হয়।'

'কিন্তু, তবু যদি ভয় করে।'

'চীৎকার দিয়ে ডেকো। আমি তো আর ঘুমিয়ে থাকব না, তোমার ডাকের বাইরেও যাব না।'

'ঘুম আমার আসবে না!'

'তা হলে আরও ভাল। আমার মাচার তলে যে বীজধানগুলো রয়েছে, তার জন্য আর বেশী ভাবনা থাকবে না। এবার বিলে মড়ক লেগে দারুণ অভাব হয়েছে। ভাল ভাল লোকও রাত কামাই দেয় না। অন্যান্য বছরও এ সময় চুরির একটা হিড়িক পড়ে, এবার তা খুবই বেড়েছে। গরু-বাছুরের বালাই নেই, ওদের নজর ধান-চালের দিকে। যাওয়ার সময় নিতাই একশো বার হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেছে।'

'আর কেরুকে পাওয়া যায় না পাহারা দেওয়ার জন্য ?'

'বিলের দু'টো বাসা ছাড়া তো আর সবই খালি—শুধু মেয়েলোক। তারা যদি থাকতে পারে, তুমি পারবে না কেন ?'

যুক্তি নেই, তবু ভয় হয়। অগত্যা রাজী না হয়েও উপায় নেই। তাই মালা আর পীড়াপীড়ি করে না। চুপ করে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে চলে যায়।...

'কোনও ভয় নেই, ঘুরে ঘুরে এসে দেখে যাব।' একখানা রামদা ও ল্যাজা একটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বিপ্রপদ।

সারাটা বিল অন্ধকারে নিঃসাড় নিস্তব্ধ। একটি লোকেও জেগে নেই। দূর থেকে বাসাগুলো দেখা যায় না। বাসাগুলো কেন—কিছুই দেখা যায় না। শুধু দু'-একটা বন্যা গাছ অস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় জোনাকীর আলোতে। অন্ধকারে অনুমানের ওপর নির্ভর করে

হেঁটে চলেন বিপ্রপদ। বিলের বুকের ওপর আড়াআড়ি কোন পায়ে-চলা পথ নেই, হাঁটু সমান ঘাস চিরে চলতে হয়। স্থানে স্থানে জোয়ারের জল উঠেছে। জলে ঝপ্-ঝপ্ শব্দ হয়। জায়গায় জায়গায় পচা ঘাস, দাম ও কচুরীপানাগুলোর ভিতর পা বসে যায়। বিপ্রপদ জোর করে পা টেনে তুলে এগিয়ে চলেন। যাবেন জমির পশ্চিম সীমানায়—কাটাখালীর তেমুখীতে। যদি কেউ আসে, তবে ঐ পথেই ঢুকবে নৌকা নিয়ে বিলে। অন্য মুখ তো বিপ্রপদর বাসার কাছে। সে দিক দিয়ে কারুর আসতে সাহস হবে না।···

নিতাই থাকত পশ্চিম সীমানায়—সংগে থাকত দু'-এক জন শক্ত কৃষাণ। খালি বাসায় ঝাঁপ খুলে তিনি একটু বিশ্রাম করে নেন। পায়ে জোঁক ধরেছে কি না তাও ধারাল দাটা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন।

সুন্দরবন থেকে নিশাচর পাখী এবং বন্য পশুর চীৎকার কঁকানি হুংকার কানে ভেসে আসে, আর একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক। এ যেন একটা মনুষ্য বিরল পোকা মাকড় পশু পাখীর জগৎ। তাঁর স্বজাতির কোন অস্তিত্ব নেই। এবং কোন দিন যে এখানে তা ছিল মনে হয় না। কেমন যেন একটা ভয় ও বিষাদে তাঁর অন্তর ভরে ওঠে। এদিকেই তো সমস্ত মরা বলদগুলোকে টেনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর সাধের বলদগুলো। ঐ যেন তাদের কাতর গোঁঙানি শোনা যাচ্ছে। ঐ তো বেশ স্পষ্ট শোনা যায় তাদের সমবেত দুঃসহ ধ্বনি। তিনি কি করবেন? যাবেন না কি ঐদিকে এগিয়ে?···না, না, এ তাঁর মনের ভ্রান্তি।··· ঐ তো শকুনগুলো ডাকছে, মাতামাতি করছে ভাগাড়ে। না, না, এও তাঁর ভ্রম।···

বিপ্রপদ চুপ করে তেমুখীটা পর্যবেক্ষণ করে বাসার দিকে ফেরেন। ফিরে যাওয়ার সময় সবগুলো বাসায় এক-একটা হাঁক দিয়ে যান।

সাহসী স্ত্রীলোক যার বাসায় আছে, তার বাসায় আর কেউ ভুলেও কোন দিন হাত দিতে সাহস পাবে না।

সকাল বেলা একটা এজাহার দিতে আবদুলকে বিলের চৌকিদার নিয়ে থানায় যেতে বলেন বিপ্রপদ। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে তাই এবারে এজাহারটা দিয়ে রাখা ভাল।

অবশেষে ইমাম ফেরে দারুণ কম্প-জ্বর নিয়ে। মুখে-চোখে তার কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। পথের কষ্টে, মনের কষ্টে, সে একেবারে ভেঙে পড়েছে। মেরুদণ্ড যেন তার বেঁকে গেছে। তাকে ধরাধরি করে কৃষাণেরা বাসায় নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইল। কত যেন অপরাধ করেছে, কত যেন অবাধ্য হয়ে চলেছে, এমনি তার মুখের ও চোখের ভাব।

ওদের দিকে চেয়ে বিশেষত ইমামকে দেখে বিপ্রপদ ছুটে যান। তিনি গরুর কথা, টাকা-পয়সার কথা সব ভুলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'ইমাম, তোমার কি হয়েছে?'

সে ধুকতে থাকে, কথা বলবে কে!

বিপ্রপদ ওর হাত দু'খানা ধরে তাঁরই শয্যার এক পাশে শুইয়ে দেন। এ কি! দুষ্ট বসন্ত রোগে ইমাম আক্রান্ত। সে সজ্ঞানে যেখানে বসতে পর্যন্ত সাহস করে না, সেইখানেই নির্বিচারে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ে থাকে!

'তোমরা যাও, খাওয়া-দাওয়া করে এসো—আমি ওর একটা ব্যবস্থা না করে কোন দিকে মন দিতে পারব না। যা হওয়ার তা হয়েছে, এখন মানুষটা বাঁচলে হয়।...মালা, মালা! একটি বার এদিকে আসতে পার?'

'এ কি!'

'এত দিন যার জন্য প্রতীক্ষা করেছ, সেই তো এই—আমাদের প্রথম সংবাদ। দ্বিতীয় সংবাদ, বলদ-মোষ কিছুই দেখছি নে। হয়ত

টাকাগুলোও পর্যন্ত জলে গেছে। তা যাক, এখন এই চিরবিশ্বাসী লোকটা না খোয়া যায়। তুমি যা পার, করো—আমার বুদ্ধি সরে না।'

'বাবুজী, ভয় পাবেন না—আমি এ রোগ আরও দেখেছি, আমি একটা ওষুধও জানি। মা'র কৃপায় ভাল হবে ইমাম পনর দিনের মধ্যে—ভাল হবে, এ আমি জোর করেই বলতে পারি।'

'ভরসা আমি করি নে, ভয়ও আমার নেই। তবে কি জানো, আমি পাষাণেও বুক বেঁধে আসিনি মালা। ও-সব কথা থাক, এখন যা করাব তাই করো।'

'আপনি কৃষাণদের কাছ থেকে ঘুরে আসুন, আমি এদিকের ভার নিচ্ছি।'

ভাল দেখেই সুবিধা মত তারা পঁচিশটা বলদ কিনেছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে ঘুণে ধরেছে তা কৃষাণেরা জানবে কি করে? খানিকটা এসেই একে-একে দশটা বলদের গায় দেখা দিল গুটি রোগ—অর্থাৎ বসন্ত। একটা দিন যেতে না যেতেই আর ক'টাও আক্রান্ত হলো সেই রোগে। এখন ওরা কোথায় যায়? কোথায় থাকে? খায় কোথায়? কোনও গৃহস্থই রোগের ভয়ে ওদের আশ্রয় দিতে চাইল না। বরঞ্চ চৌকিদার দফাদার ডাকিয়ে ওদের ভয় দেখিয়ে গাঁয়ের বাইরে বার করে দিতে লাগল। রুগ্ন গরুগুলো কি আর হাঁটতে চায়! হাজার মার-ধরেও কোনও কাজ হয় না। দু'টো-একটা করে মরতে সুরু করল। তখন ওরা একটা গাছের তলায় মাঠের মধ্যে আশ্রয় নিল। ইমাম ব্যতীত আর কেউ পথ চেনে না—খবরও দিতে পারে না বিলে। ইমাম যদি আসে ওদিক সামলায় কে? এর মধ্যে আবার হাতের পয়সা গেল ফুরিয়ে। প্রথম এক বেলা, তার পর দু'বেলা গোটা কয়েক উপোষ দিয়ে তার পর ফিরল ওরা বিলের দিকে। এর মধ্যে একে একে বলদের

পালও সাবাড়। মাত্র বাকী রইল দু'টো। তা ওরা খোদার নামে উৎসর্গ করে দিয়ে এসেছে।

এ সংবাদের জন্য বিপ্রপদ যেন প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। তিনি আর ভাল-মন্দ কিছু না বলে বাসার দিকে ফেরেন। আবার কি যেন মনে পড়ায় তিনি ঘুরে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 'নিতাইর সংগে দেখা হয়েছে?'

'না।'

তা তো হবে না। সময় মত সেও ফিরবে না। এবার আউশের চালুটি তার মাটি হলো। অসময়ে ধাক্কা সামলাবার মত ভাদ্র খন্দের আর আশা রইল না। মোটা-মোটা মইশাদল কি বোর ধানের আশা!

'রমজান, এমন সুন্দর আউশের বীজগুলো কি কোন প্রয়োজনেই লাগবে না? তুলে জলে ভাসিয়ে দিতে হবে? তবে এত পরিশ্রম করে কি লাভ হলো? তোমরা তো চিরদিন চাষ-আবাদ নিয়ে আছ, কত আপদ-বিপদ দেখেছ—অমন বীজগুলো কি কোনও কাজেই লাগান যাবে না? দেশেরগুলোও তো মাটি হলো!'

দেশেরগুলো আর কোনও প্রয়োজনে যদি না লাগে, অন্তত বিক্রি করা যাবে—হয়ত চড়া দামই পাওয়া যাবে। কিন্তু বিলে এসেই আউশের যে বীজ করা হয়েছে তার কোনও মূল্যই নেই, কারণ গো-মড়কের দরুণ সকলের জমিই প্রায় খিল পড়ে আছে, কে আর কিনবে বীজ?...তবে এক কাজ করা যেতে পারে। যে দু'-একখানা চাষ হয়ে থাক, জমিগুলির ঘাস মরেছে, মাটিও কতকটা নরম হয়েছে। আগামী অমাবস্যার 'জোতে' জল উঠলে সবাই মিলে জমি পা দিয়ে মাড়িয়ে বীজগুলো রুয়ে দিলে মন্দ হবে না। যদি চারা ভাগ্যক্রমে ভাল ভাবে ধরে যায়—ওতেও অপর্যাপ্ত ফসল ফলতে পারে। আর না যদি ধরে তখন চাষ করে আমন ধান রুয়ে দিলেই চলবে।

'রমজান, তুমি পাকা কৃষাণ—তোমার হঠাৎ-বুদ্ধির তারিফ্ করতে হয়। তোমার কথায় আমার বুকে যে কত জোর পাচ্ছি, মনটা যে কতখানি ভরে উঠ্‌ল তা আর কি বলব! তুমি তো জানো, আউশ ধান না পেলে আমরা কত নিরুপায়!'

রমজান বলে যে, এর জন্য কোনও প্রশংসা পেতে হলে সর্দারের পোরই প্রাপ্য, কারণ এ সব সমস্যার এক মাত্র সমাধান তারই কাছে শেখা। সে নাকি অনেক বার হাতে-কলমে পরীক্ষা করেও দেখেছে—সুফল নাকি পেয়েছে যথেষ্ট।

'তাই নাকি? তবে এতক্ষণ আমাকে কেন বল নি? জমিতে জল ওঠার আর কত দেরী—আর ক'দিন বাকী অমাবস্যার?'

'বেশী দেরী নেই।'

বিপ্রপদ দ্রুত পদে বাসায় ফেরেন। 'শুনছ শুনছ মালা! নতুন জল এলে নাকি আমাদের ঐ যে পূবের খণ্ডে বীজ হয়েছে তা কাজে লাগবে—জমিতে রুয়ে দেওয়া যাবে। রমজান বলেছে একটি বীজও নষ্ট হবে না।

'আমিও তাই ভাবছি, বর্ষা নামলে ভালোই হয়—যেমন চাষের পক্ষে, তেমনি ইমামের পক্ষেও। বেচারী তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারে। ক'দিন ধরে যে গরম পড়েছে তাতে হাওয়া চলছে না একেবারেই।'

'তা হলে দেখছি জলের প্রয়োজন সকলেরই। জলই এখন পরম বন্ধু। প্রভেদ, আমি চাই জোয়ারের, তুমি চাও বর্ষার, এই তো?'

সন্ধ্যার একটু পূর্বেই বিলের সকলে বিপ্রপদর আহ্বানে সমবেত হয়।

'দেখ ভাইরা, আমরা দু'টিতে মাত্র হিন্দু, বাদ-বাকী তোমরা সকলে মুসলমান। আমরা জাতি-ধর্মে পৃথক্ হলেও আমাদের স্বার্থ এক। সে স্বার্থ হচ্ছে—উৎকট ব্যাধিতে ঐ যে লোকটি শুয়ে অসহ্য জ্বালায় ছটফট

করছে, ওকে বাঁচিয়ে তোলার স্বার্থ। ও আমাদের সকলেরই হিতৈষী। ওর জন্য চাই আকাশের জল, আর আমাদের বেঁচে থাকতে হলে চাই জোয়ারের জল। এসো ভাইরা, আজ আমরা সকলে সমবেত হয়ে খোদার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আসমান থেকে দু'হাতে ঢেলে দেন জল—দরিয়ার বুক ছাপিয়ে পাঠিয়ে দেন পানি। জলই এখন আমাদের জীবন, জলই পরম বন্ধু।'

বিপ্রপদর কথায় সকলে মুগ্ধ হয়ে ঐকান্তিক অন্তঃকরণেই প্রার্থনা করে।

প্রার্থনা করে জলের জন্য, প্রার্থনা করে ইমামের রোগ-মুক্তির জল !···

ঈশ্বরের কাছে হয়ত সে প্রার্থনা পৌঁছায় না—বৃষ্টি নামে না। ইমাম দুঃসহ জ্বলুনিতে ছটফট করতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি বসে থাকে না। অমাবস্যায় দু'কূল ভরা প্লাবন আসে। জোয়ারের জল ছাপিয়ে ওঠে জমিতে। নুয়ে-নুয়ে টেনে-টেনে ওরা বীজ তোলে। গুচ্ছ-গুচ্ছ করে আবার বাঁধে আঁটি। তার পর যেখানে পুঁততে হবে, টেনে নিয়ে চলে সেই দিকে সারি বেঁধে। সবুজের সারি ভেসে চলে ঘোলা জলে। ভেসে চলে এঁকে-বেঁকে কখনও বা সোজা হয়ে।

আনন্দে বিপ্রপদর বুক দুলতে থাকে। সমস্ত বিফলতার আশংকা থেকে যেটুকু সফলতা তিনি উদ্ধার করতে পারেন, সেইটুকুই বা তাঁর নিকট কম কিসে?

কিন্তু দুঃখ হয় ইমামেব মুখের দিকে চেয়ে। কি অসহ্য প্রদাহে যে জ্বলছে তা ব্যক্ত করা সুকঠিন।

'মালা, ইমাম বাঁচবে তো?'

'বাঁচা-না-বাঁচা ঈশ্বরের হাত, তবে এখনও আমি নিরাশ হইনি। আপনারাও কিছু দিন দেখুন।'

'কিন্তু রোগ বাড়ছে বই তো কমছে না।'

'এখনও কমবার সময় হয়নি, অস্থির হয়ে লাভ কি !'

'জানি লাভ নেই, কিন্তু ওর একটা ভাল-মন্দ হলে যে কত বড লোকসান তা তো তুমি জান মালা ?'

'জানি বাবুজী, তাই তো স্থির হতে বলছি।'

'মানুষ যে হয়, যার শরীর রক্ত-মাংসে গড়া, সে আর কত স্থির থাকতে পারে তা কি বলে দিতে পার মালা ? মান গেল, সম্মান গেল, টাকা-পয়সা যা ছিল তাও গেল—এখন যদি ওরাও যায়, তাহলে কিসের জোরে খাড়া হয়ে থাকব আমি ?'

'যে আশায় এক প্রকার বিনা-চাষের জমিতে ধান রুয়ে দিলেন, সেই আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে ভবিষ্যতের জন্য ভাগ্যে কি তোলা রয়েছে ? আমি মেয়েমানুষ হয়ে আপনাকে আর কি বোঝাব ! অত অধীর হবেন না, ইমাম ভাল হবে, নিতাই ফিরে আসবে—আবার আপনি ফিরে পাবেন সব।'

'মালা ! আশা—আশাই সব।' বিপ্রপদ একটু মৃদু স্বরে বলেন, 'আশাই জীবন, আশাই গতি। তুমি বলছ আমি আবার সব ফিরে পাব—হয়ত এ কথা সত্য, কিন্তু কেন জানি বিশ্বাস হয় না।'

'এখন পর্যন্ত আপনার এমন কি গেছে যে এত ব্যাকুল হচ্ছেন ? ক'টা গরু আর ক'টা টাকা, এই তো ? ও আবার হতে কতক্ষণ।'

'হয়ত সবই হবে, হয়ত সবই ফিরে পাব, কিন্তু একটা যে ক্ষতি হলো, তা এ জীবনে আর পূর্ণ হবে না।'

মালা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, 'সে ক্ষতিটা কি বাবুজী ?'

এখন বিপ্রপদ কি জবাব দেবেন ? কথায়-কথায় তিনি নদীর এমন ভাঙা কূলে এসে দাঁড়িয়েছেন, যেখান থেকে আর ফেরা যায় না—একটু এগিয়ে গেলে, মাত্র এক পা, মৃত্যু অনিবার্য। তিনি কমল-কামিনীর কাছে যে বিশ্বাসটুকু হারিয়ে দেউলিয়া হয়েছেন, তা কি

খুলে বলতে পারেন মালার কাছে? সেদিন কমলকামিনী নিতাইর কাছে যা প্রকাশ করেছেন, যে বাণ নিক্ষেপ করেছেন পরোক্ষে, তা ব্যর্থ হয়নি—বরঞ্চ দ্বিগুণ বিষের আগুন নিয়ে বেজেছে এসে বিপ্রপদর বুকে। সেই আঘাতের জ্বালা সময় সময় অসতর্কে প্রকাশ হয়ে পড়তে চায়।

'সে ক্ষতিটা কি বাবুজী? কি, চুপ করে গেলেন যে? আমি কি শুনতে পাবি নে?'

ইমামের কথা প্রসংগে যে বিপদ এলো, সে বিপদ থেকে ইমামই রক্ষা করে। কলিজা তার শুকিয়ে গেছে; গলা বুক চিরে যাচ্ছে—সে একটু জল চায়।

শাবকের জন্য হরিণীর যে মমতা, সেই মমতা নিয়ে মালা ছুটে যায়। বিপ্রপদ কৃষাণদের বাসার দিকে বেরিয়ে পড়েন। আপাততঃ তিনি রক্ষা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

কৃষাণেরা বলাবলি করে, নিতাইর নাকি সংবাদ পাওয়া গেছে—সে সন্ধ্যার পর বিলে এসে পৌছবে। এবার সে বলদ খরিদ করেনি, এনেছে মোষ কিনে। একটা মোষে দু'তিনটা গরুর কাজ দেবে। কিন্তু সেগুলোকে পালা বড দায়। মোষের মোটেই মায়া নেই মনিবের জন্য। কোনও দিন সন্ধ্যা বেলা নিজে নিজে ফিরবে না গোয়ালে। এক দিন একটু রোদ চড়া হলে, জলের জন্য যে-কোন মুলুকে পাল বেঁধে যাবে, তা খুঁজে বের করা দুষ্কর। এক দিনে ছয় দিনের পথ যেতে পারে হেঁটে। আর ওদের কি খুঁজে বের করা সহজ! কোন্ খাল-বিলের চরে যে কাদা মেখে ডুব দিয়ে থাকবে, হাজার ডেকেও সাড়া পাওয়া যাবে না। কিন্তু বলদগুলো কি সুন্দর! সন্ধ্যার সময়ই পাল সমেত বাড়ী এসে হাজির। কি শান্ত চাহনি! একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াবে—জাবর কাটবে দু'চোখ বুজে। নির্দিষ্ট সীমার

বাইরে যাবে না সহজে। জলের জন্য হা-হুতাশ নেই—নেই পাগলা ক্ষেপুণী। ওরা মনিবের মায়া বোঝে, তাইতে ওদের পালাতে ভাল লাগে···কিন্তু এবার জমিতে যেমন জংগলা ঘাস হয়েছে বুক সমান উঁচু, ওর জন্য মোষই ভাল। একেবারে পাহাড়ের মত প্রাণী। ইচ্ছা মত ডলে-মুচড়ে ভেঙে-চুরে চাষ করা যাবে জমি। হৈ-হৈ করে দেওয়া যাবে মই। দু'দিনেই জংগল কাবার। বর্ষা তো নামল বলে, এখন আর ওরা জলের জন্য কোথাও যাবে না। ঘাস—সে তো যথেষ্টই রয়েছে বিলে। এখন ওদের মোষই ভাল। পাহাড়ের মত প্রাণী—হাতীর মত ওদের দেহে শক্তি।

বিপ্রপদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শোনেন। তাঁর আর নিতাইর জন্য অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে এগিয়ে গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে। অবশ্য নিতাইকে শুধু নয়, তাঁর পাহাড়ের মত মোষগুলোকে। কিন্তু কৃষাণদের কাছে লজ্জায় এ কথা তিনি বলতে পারেন না। হাজার হলেও তাঁর মত লোকের পক্ষে এ কাঙালপনা অশোভন।

সন্ধ্যার আগেই নিতাই এসে বিলে পৌঁছায়। বাইশটা মোষ এবার সে এনেছে কিনে।

'এতগুলো মোষ আনলে কি করে—কত দাম হলো?'

'এগার শো।'

'নিয়ে গেলে মাত্র ছ'শো, খরচ করে এলে এগার শো! বাকী টাকাগুলো তোমার সম্বন্ধীরা দিল নাকি হাটে বসে?'

'সে পরে শুনবেন। এখন ইমাম কেমন আছে? তার নাকি গুটি উঠেছে?'

'হ্যাঁ—তবে একটু ভাল আছে, তুমি চিন্তা করো না। সবই তো নিজের চোখে দেখতে পাবে।···মালা, নিতাই এসেছে মোষ নিয়ে! তুমি একটা ডালায় কিছু ধান আর তেল-টেল নিয়ে বের হও। ওদের

বরণ করে নাও। এখন থেকে এতগুলো প্রাণী আবার তোমার সংসার-ভুক্ত হলো।'

মালা তেল আনতে পারে, ধান আনতে পারে, কিন্তু সিঁদুর পাবে কোথায় বরণডালা সাজাতে? এ বিলে সে-ই একমাত্র হিন্দু নারী, কিন্তু সে তো অনূঢ়া। ঘর থেকে তার বের হতে একটু দেরী হয়—সে থতমত খেয়ে যায়।

'যা পেয়েছ, এখন তাই নিয়েই এসো। মোষগুলোর শিংয়ে একটু তেল দিয়ে ধানের ডালাটা সুমুখে দাও।'

মোষগুলোর চোখের পাগলা চাহনি দেখে ওদের কাছে যেতে মালার সাহস হয় না। জেল-খালাস তিনি ভাইর মধ্যে একজন মন্তব্য করে, 'অত ডর লইয়া বিলে আইছ ঘর করতে মাঠাইন।' বলে সে এক-একটা মোষের শিং চেপে ধরে। 'আযো, এখন ত্যাও ত্যাল-সিঁন্দুর।...তেল আনছ, সিঁন্দুর আনো নাই? সুন্দর দেখায় না সিঁন্দুর বিনা।'

মোষগুলো ধানের ডালাটা নিয়ে একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। 'আহা হা, ডালাটা ভাঙল,—ভাঙল। বাবু, একটা লাঠি। দেখছেন ওদের কাণ্ড—সাধে বলে মোষ!'

বিপ্রপদ দৌড়ে ঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকেন। ইমাম উঠে বসেছে—সে বাইরে যাবে, এমনি প্রস্তুতি। তারপর হঠাৎ শুয়ে পড়ে অচৈতন্যের মত হয়ে থাকে।

'মালা, মালা!'

ডাকের ব্যাকুলতায় মালার সংগে নিতাইও ছুটে আসে। জেল-খালাস তিন ভাই মনে মনে একটা প্রমাদ গণে।

অনেক দিন দুরন্ত গ্রীষ্মের পর আকাশে একটা কালো মেঘ জমেছে। ঐ মেঘের মত সকলের মন অন্ধকার হয়ে থাকে...

ততক্ষণে মোষগুলো ডালাটা-ভেঙে ধান খেয়ে ঘরের দিকে চেয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। দুয়ারের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো এসে পড়ছে, তাতেই তাদের চোখগুলো জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে যেন। এ খানে ওদের তৃপ্তি হয়নি, আরও চাই। কত দূর থেকে ওরা হেঁটে এসেছে বিলে। কত ক্ষুধা ওদের পেটে। বিপ্রপদ আর এক ডালা ধান বার করে দেন।

'বাবু, আপনি করছেন কি? আমনের বীজ ধান দিচ্ছেন ওদের খেতে? কম পড়লে এদেশে বীজ-ধান মিলবে না।'

'না, না, আর দেব না নিতাই, আর দেব না—ওরা বড় ক্ষুধার্ত কি না।'

'মোষ তো না রাক্ষস। ওদের ক্ষিদে আপনি কেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা এলেও মিটাতে পারবে না।'

ধান খাওয়া শেষ হলে মোটা-মোটা দড়ি দিয়ে মোষগুলোকে উঠানেই বেঁধে রেখে নিতাই ফের ঘরে আসে।

মালা তখন একটা অযুধ তেল বুলিয়ে দিচ্ছিল ইমামের সারা দেহে।

'বাবু, পাঁচশো টাকা ধার করে মোষ কিনে এনেছি। যেমন আপদ-বিপদ, তাতে হালুটি মিলে-মিশেই চালাতে হবে। খরচ-পত্তর আপনার, 'আষাঢ়ে' ধান উঠ্‌লে যা হ'ক একটা ভাগ-যোগ করে ফসল সবাইকে দিলেই চলবে।'

মালা বলে, 'তোমাদের সেই বিশ্বাসী মাঝিটা এসেছিল, আমি কুপিয়ে দিয়েছি।'

'কি বলছ মা-ঠাকরুণ—ঠিক বুঝলাম না।'

'আরে, ও-সব মালার ভ্রান্তি। মাঝিটা এসেছে নাকি বেলের চর থেকে এত দূরে দু'ডালা ধান চুরি করতে! বিশ্বাস হয় তোমার?'

'ওদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। বেলের চর তো কাছে, দশ মাইল

দূর থেকে এসেও সেই রাত্রে চুরি করে ফিরে যেতে পারে, এমন পাকা লোকও আছে।...বাবু, কি হয়েছিল ?'

বিপ্রপদ ঘটনাটা সংক্ষেপে নিতাইকে শোনান। শুনিয়ে ফের বলেন, 'এখন ও-সব আলোচনা থাক। আসল কথা শুনি—কে তোমাকে পাঁচ-পাঁচশো টাকা ধার দিল ?'

'আপনার নাম করে এখন আমি হাজার টাকাও ধার আনতে পারি—পাঁচশো টাকা আর ক'টা টাকা! এ দেশে আপনার নাম জাহির হয়ে গেছে। গরু কিনতে এ বিলের দু'জন মহাজন গিয়েছিল আমার সংগে। তাদের কাছে হাত পাতা মাত্র আর দ্বিরুক্তি করল না।'

'তারা বলদ কিনল না ?'

'তাদের পছন্দ হয়নি। তারা আগামী 'জোনাকে' যাবে। এর মধ্যে টাকাটা জোগাড করে দিতে হবে—আপনার বাড়ী যাওয়া দরকার।'

'আমার যাওয়া দরকার! কেন তুমি ?'

'আপনি সব জেনে-শুনেও এ কথা বলছেন, বলুন—কোনও কাজ হবে না। সময় মত ওদের টাকা শোধ না করতে পারলে উঁচু মাথা হেঁট হবে—হয় ত একটা কেলেঙ্কারীও হতে পারে। হোক, আমি কি করব ? মনিব অবুঝ হলে গোলামে আর কি করতে পারে।' নিতাই ক্ষুণ্ণ মনে অমনি আরও অনেক কথা বলে যায়।

চুপ করে অনেকক্ষণ ধরে বিপ্রপদ কি যেন ভাবেন। তার পর বলেন, 'দাও জোগাড় করে। যখন আমাকে ছাড়া কাঁটা খুলবে না, তখন না গিয়ে উপায় কি! তুমি গেলেও হতো—যাক্, আমিই যাব।'

এখানে কেরায়ার নৌকা পাওয়া যায় না, পাটাতন দিয়ে একটা টালাই নৌকা সাজান হয়। নৌকা বেয়ে যাবে আবদুল ও রহিম। একটু পরেই রওনা দিতে হবে।

এমন সময় ঈশ্বরের বুঝি মনে পড়ে দয়া করতে হবে দক্ষিণের বিলে

সেই যে সন্ধ্যা বেলা মেঘ করেছিল—সে কালো মেঘ নয়। পরিপূর্ণ জলো মেঘ। আকাশে গোটা কয়েক চিলিক মেরে অঝোরে নামল জল। সংগে এলো দামাল বাতাস। লণ্ডভণ্ড করে দিতে লাগল সব। বিপ্রপদকে বাধ্য হয়ে যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়।

মালা ভাবে: ভালই হলো। এবার ইমাম নিশ্চয় সেরে উঠবে। যদি ইমাম এত অসুস্থ না থাকত তবে হয়ত এ যাত্রা মালাও শক্তিগড়ে যেতে পারত। শক্তিগড় সম্বন্ধে তার খুবই আশংকা, কিন্তু কৌতূহলও ছিল যথেষ্ট। সে কি করে যাবে? কার হাতে দিয়ে যাবে ইমামের শুশ্রূষার ভার?

জলে ভিজতে ভিজতে দু'জন চৌকিদার এসে ওঠে বিপ্রপদর ঘরে। তারা সংবাদ জানায় যে, বড দারোগাবাবু নৌকা ভিড়িয়েছেন এই ঘাটে। তিনি বিপ্রপদকে ডাকছেন। সংগীন দরকার।

তিনি তো এমন কোনও চুরি-ডাকাতি করেননি যে, পুলিশের সংগীন দরকার হতে পারে তাঁর কাছে। জল না থামা পর্যন্ত নৌকায় যাওয়া অসম্ভব। অতএব সংগীন প্রয়োজনটা কৌতূহলের বিষয় হয়ে থাকে। সুবিধা বুঝে দু'টি চৌকিদারই তামাক টানতে বসে।

দেরী দেখে দারোগাবাবুই একটা ছাতি মাথায় দিয়ে ওপরে ওঠেন।

তাঁকে বাধ্য হয়ে মালার ঘরে বসতে দিতে হয়—কারণ ও-ঘরে রোগী।

'কিছু দিন পূর্বে যে আপনার এখানে চুরি হয়েছিল, তার তদন্তেই আমার আসা। চোর একজন ধরা পড়েছে, আমার সংগে নৌকায়ই আছে। হাতে তার আঘাতের চিহ্নও রয়েছে—যা এখনও শুকায়নি। সনাক্ত করলে এক্ষুণি চালান দিয়ে দিতে পারি।'

দারোগাবাবু এদিক-ওদিক চাইতে থাকেন। মনে হয় কি যেন খুঁজছেন। একটা গোটা এলাকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। তাঁর দৃষ্টিটা শ্যেনের মত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নইলে চোর-ডাকাতে ভয় করবে কেন?

যাকে থানায় পাঠিয়েছিলেন সে বলে এসেছে যে আপনার স্ত্রী নাকি চোরটাকে কুপিয়েছেন। তিনি দেখলে চেনেন কি না এবং চিনলে সনাক্ত করলে কেসটা সহজেই আস্কারা হয়ে যায়, আমি আসামী চালান দিয়ে দিতে পারি···তাঁর সংগে আমার একটু দেখা হওয়া প্রয়োজন··· আপনার অসুবিধা না হলে···'

'আমার এমন কি অসুবিধা হবে···আপনি এত কষ্ট করে জলে-ঝড়ে এসেছেন···'

'এ তো আমাদের Duty—আমরা তো পাবলিক সারভেণ্ট।··· আপনি খুব সৌখীন লোক। হালুটি করতে এসেছেন বিলে স্ত্রীকে নিয়ে। আপনার বয়স হয়েছে কিন্তু কামিনী এবং কাঞ্চনের লিপ্সা তো এতটুকুও শিথিল হয়নি—সত্যি সত্যি টাকা-পয়সা জমাতে হলে আপনারাই জমাতে পারবেন। এখন একটু···'

থানার একচ্ছত্র সম্রাট—তিনি বিপ্রপদর হিতার্থে দেখা করতে চান মালার সংগে এবং তা। তিনি আইনত পারেনও, বে-আইনী ভাবে কত কি যে পারেন তার তো নজিরের অভাবই নেই। এমতাবস্থায় প্রতিবন্ধক হলে ভবিষ্যৎ খারাপ। তিনি রান্না-ঘর থেকে মালাকে ডেকে আনেন। সে এসে একটু অন্তরালেই কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'আপনি কি চোরটাকে দেখলে চিনতে পারবেন? নাম তো নিশ্চয় জানেন না!'

'হ্যাঁ, দেখলে বোধ হয় চিনব। নামও আমি জানি বোধ হয়···'

'অন্ধকারে কি করে চিনলেন ওকে?'

'ও দরজা ঠেলে প্রথম এসে যখন ঢুকল তখন শিয়রে আমার প্রদীপটা জ্বলছিল। ও পা টিপে-টিপে এগিয়ে এসে প্রথমেই নিবিয়ে ফেলল আলোটা—আমিও দিলাম এক কোপ্ বসিয়ে, তখন আমার জ্ঞান ছিল না।'

'জ্ঞান নিশ্চয়ই ছিল—তবে অতিরিক্ত ভয় ও উত্তেজনায় আপনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' বিপ্রপদ মন্তব্য করেন, 'আপনি যা বলছেন তাই ঠিক।'

'সোরগোল শুনে যখন সকলে ঘরে এলো তখন ওকে যে চিনেছেন তা কি সকলকে বলেছেন ? কি বলল সবাই ?'

'হ্যাঁ, বাবুজীর কাছে বলেছিলাম. তিনি বিশ্বাস করেননি আমার কথা।'

হঠাৎ একটা হিন্দুস্থানী ভাষা শুনে দারোগাবাবু বিস্মিত হন। 'কে বাবুজী ?'

মালা একটু এগিয়ে এসে ইসারায় দেখিয়ে দেয়, দিয়ে সরে যায়। কিন্তু শ্যেন-চক্ষু দারোগাব দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। উনি আপনার কে ?'

'আমার, আমার আশ্রয়দাতা—মনিব।'

'মালিকও বটে।' বলে—দারোগাবাবু একটা উৎকট ব্যাংগ হাস্য করে ওঠেন।

বিপ্রপদ ও মালা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে এতটুকু হয়ে যান।

দারোগাবাবু হুকুম করেন, 'এই যা, চোরটাকে নিয়ে আয়। এখানে বসেই সনাক্ত হবে। দুজনেই যা, সাবধানে নিয়ে আসিস্।'

একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ঘরটার মধ্যে জমা হয়ে ওঠে। দারোগাবাবু নিজের মনেই পায়চারী করতে থাকেন। 'এটা কি ? টিয়া। ওটা কি ? ময়না। দেখছি বিপ্রপদবাবুর সখের আর অন্ত নেই। বিলে এসে একটি আশ্রিতাকে আশ্রয় করে প্রকাণ্ড একটা সংসার ফেঁদে বসেছেন। এটা আপনার তেজারতির সংসার—মানে ব্যবসার আর দেশে আছে আসলটি। বেশ, বেশ—ভাল, ভাল। আমরা দু-একজন ভদ্রলোক

এই চাষা-ভূষোর দেশে এলে নিরাশ হয়ে যাব না—কি বলেন—বোস মশাই? জলের বল মাছ আর মাছের বল জল। আমরা কাউকে কেউ ত্যাগ করতে পারি নে।'

'তা পারব কি করে? যখন এদিকে আসবেন গরীবের কুটীরে যা শাক-অন্ন জোটে, তাই…'

'আপনি মুখে অত গরীব হলে চলবে কেন? আপনার চাল-চলন তো গরীবের মত না যে অতিথ-অভ্যাগত আপনার শাক-অন্নেই তুষ্ট হবে। কর্তৃপক্ষ মুড়ো খেলে আমরা কি নিদেন পক্ষে লেজাখানারও দাবী করতে পারি নে?'

'সে তো পারেনই। লেজা কেন মুড়োটা খাওয়াবই মালিক আপনি।'

'আমি আবার অতটা আত্মসেয়ান মানুষ না—ভাগে-যোগে খেতে পারলেই খুশী।' বলে তিনি আবার একটা উৎকট হাসি হাসেন।

মালা এবং বিপ্রপদ এই অবাঞ্ছিত অন্তরংগতায় মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হয়ে ওঠেন—খানিকটা যে শংকিতও না হন তা নয়।

চোরটাকে দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়। সত্য সত্যই এ সেই মাঝিটা।

বিপ্রপদ একটু লজ্জা বোধ করেন, কারণ মালার কথা মোটেই আমলে আনেননি তখন।

মাঝিটা ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে থাকে আর জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে থাকে সকলের পা। চৌকিদার, কৃষাণেরা, এমন কি নৌকার মাঝিগুলোর পর্যন্ত পা সরিয়ে নিতে হয়।

ওর এই ন্যাকামিতে সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হয়। দারোগাবাবুর তো কথাই নেই। তিনি বলেন, 'ও পুরাতন পাপী, ভিলেজ ক্রাইম নোট-বুকে ওর নাম মোটা অক্ষরে লেখা আছে। ওকে আমি শ্বশুরবাড়ী ঘুরিয়ে না এনে ছাড়ছি নে।'

মালাকে সদরে গিয়ে সাক্ষী দিতে হবে, বিপক্ষের মোক্তারে জেরায়-জেরায় নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে—এ সব অপ্রিয় ঘটনা এড়াবার জন্যই বিপ্রপদ ওকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন। অগত্যা দারোগাবাবু রাজী হন বটে, তবু জিজ্ঞাসা করেন, 'ওর কি মত?'

'ওকে ক্ষমা করাই উচিত। ওর হাড়ে-হাড়ে শিক্ষা হয়ে গেছে। অভাবে পড়েই লোকে চুরি করে, নইলে—'

'অভাব না ঘোড়ার ডিম। শালাদের স্বভাব?…যা বেটা।' বলে দারোগাবাবু ওকে ফুটবলের মত লাথি মেরে গড়িয়ে ফেলে দেন বাইরে। অন্ধকার ও বৃষ্টি অগ্রাহ্য করেই মাঝিটা কুকুরের মত পালিয়ে যায়।…

সকলে হাসে…

মালা শুধু তা পারে না।…

মামলা-মকর্দ্দমার সকল ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে দারোগাবাবু বসে থাকেন—হয়ত রুই মাছের লোভেই তাঁকে প্রলুব্ধ করে রাখে। তিনি একে একে সাংগপাংগ সব বিদায় করে দেন।

বিপ্রপদ গত্যন্তর না দেখে বলেন, অনুগ্রহ করে যে নিজেই যেচে অতিথি হয়েছেন, এটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। আপনাদের নেমন্তন্ন করেই বা ক'জনে খাওয়াতে পারে! জানি সবই মশাই, এখন একটু বিপাকে পড়েছি…একটি মাত্র মানুষ যাবে ক'দিকে? রোগীর সেবা করবে, না একটু দেখে শুনে রাঁধবে? আমি গর্ব করি নে, ওর হাতের রান্না যিনি একবার খেয়েছেন তিনি আর কিছুতেই ভুলতে পারবেন না!'

'কার অসুখ?'

'আমার একটি অনুচরের।'

'কি অসুখ?'

'সে আর বলেন কেন? একেবারে আসল মায়ের অনুগ্রহ—চর্মদল!' বিপ্রপদ সভয়ে কপালে হাত ঠেকান।

'অ্যাঁ, চর্মদল?' দারোগাবাবু প্রকাণ্ড একটা মুখ ব্যাদান করে বাইরের দিকে বেরিয়ে পড়েন। যে ছাতিটা সামনে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছিল সেটাকেও তুলে নিতে ভুলে যান।

'আহা হা, না খেয়ে-দেয়ে কোথায় যাচ্ছেন অসময়ে—শুনুন, শুনুন দারোগাবাবু।'

'আর একদিন, আর একদিন শুনব বিপ্রপদবাবু···আজ নমস্কার।'

শেষ কথাটা যে বেশ দূর থেকে এলো তা সহজেই বোঝা যায়।

কষ্ট হলেও বিপ্রপদ সেদিন বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ী রওনা দেন।

তেরো

জলে ভিজে রোদে পুড়ে, কোনও প্রকারে বিপ্রপদ বাড়ী গিয়ে ওঠেন। নৌকাপথে বলতে গেলে দু'টো টানা উপোষই গেছে। আগের বারের থেকে এবার আরও শরীর শীর্ণ হয়েছে। বিলে নাপিতের সংগে বহু দিন দেখা নেই। চুল দাড়ি-গোঁফে মুখ এবং মাথাটা জংগলাকীর্ণ, দেখলে চেনা দায়। মনে হয় যেন মা-বাপ মারা গেছে। আগের বার যখন এসেছিলেন তখন মনে ছিল উদ্দীপনা ও হৃদয় ছিল আশায় ভরা—এবার তা নেই। চোখের দিকে চাইলে বোঝা যায়, নিরাশা যেন মর্মস্থলে বাসা বেঁধেছে। এত বড় সকর্মা পুরুষ যেন নিজের অগোচরেই কতকটা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন।

এতদিন বাদে কমলকামিনীরও ঢের পরিবর্তন হয়েছে। মান অভিমান আক্রোশে সংক্ষুব্ধ চিত্ত অনেকটা সমাহিত হয়েছে। দীমুর

আঘাত, বিলের নিস্ফলতা তাঁর মনটাকেও অনেকটা দমিয়ে দিয়েছে। বিলের কালো ছায়াটা কেমন করে যেন প্রতিফলিত হয়েছে শক্তিগড়ের আকাশে। সেই ছায়ার অন্তরালে মালাও যেন কতকটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

দেশে একটা জনরব উঠেছে: গেছে গেছে বোসেরা গেছে। এমন অধর্মের কাজ সইবেন কেন বিধাতা? শুধু অধর্ম, ব্যভিচারী হয়েছেন বিপ্রপদ! ফল তার হাতে-হাতেই ফলেছে। শক্তিগড়ের সমাজনৈতিক গগনে প্রদীপ্ত ভাস্করের মত এতদিন যিনি উজ্জ্বল ছিলেন তিনি অনেকটা যেন ম্লান হয়ে গেছেন। রামা-শ্যামাও বুঝেছে, বিলের এতগুলি ধানী জমি বিপ্রপদর সহ্য হয়নি। অতএব তাঁর এখন পতন অনিবার্য। এবং এই পতনটা কত বড় দুঃখ ও গ্লানি নিয়ে কোন্ পথে আসবে তাই সকলে দেখতে চায়। আর তাদের দেরী সহ্য হয় না। খুব তাড়াতাড়িই তারা একটা বিষাক্ত হিংসার আনন্দ নিয়ে তা দেখতে চায়!…

কেউ কেউ ভাবে মূর্খ—বিপ্রপদ কেন, বাড়ী সমেত সকলেই মূর্খ। নইলে নাটমন্দিরের টিন খুলে নিতে পারে একটা ভিক্ষুক বামুনে? এবং তার কোনও প্রতিবিধান না করে ওরা বসে থাকে চুপ করে? এখন ওদের পিছে আর সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে লাভ কি? আর কোনও উপকারের প্রত্যাশা নেই ওদের দিয়ে। ওরা গেছে—একেবারে রসাতলে গেছে।

বিপ্রপদ বাড়ী এসেছেন শুনেও তাই আর একটি লোকও আসে না দেখা-সাক্ষাৎ করতে। গুরু-পুরুতও যেন কেমন কেমন করতে থাকেন।

'তোমার কি একটা নাপিতও জোটেনি? আমি চিরদিন দেখলাম, তোমার পিছনে অষ্টপ্রহর একজন লোক লেগে না থাকলে নিজের ভালমন্দও তুমি বোঝ না।'

'বিলে তো নাপিত পাওয়া যায় না। আর যে দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে দিন কাটছে তা তো সবই বললাম—ওদিকে কে খেয়াল করে বলো?'

'খেয়াল রাখতে হয়। একদিকে না চারদিকে। বিলে নাপিত না পাওয়া যাক একটা বন্দরে উঠেও কি দাড়ি-গোঁপ কামিয়ে আসতে পারনি? দেহটা বড় হলেই বুদ্ধিটা পাকা হয় না। তুমি গুরুজন, আমার মুখে শোভা পায় না—আমি তোমাকে বলি এক নম্বর বোকা। তা না হলে তুমি কি বোঝ না এখন আমাদের কি ভাবে চলতে হয়? এসেছ একটা টালাই নৌকায় একটা হোগলার ছই দিয়ে জলে ভিজে রোদে পুড়ে। একটা কেরায়ার নাও জোটেনি রাস্তায়?'

'এখন আমাদেব কি ভাবে চলতে হয় বড়বৌ?'

'আমার ভাল লাগে না তোমার মিঠে কথা—গায় বিষের ছিটে পড়ে। ঠাকুরপোকে নাপিত ডাকতে পাঠিয়েছি, সে এলো বলে। এখন একটু পরিষ্কার হয়ে স্নান করে বিশ্রাম করো গে—তারপর কথাবার্তা হবে 'খন। কাপড়ের শ্রী দেখলেও গা জলে যায়। ঘরে একটা ঝি না রাঁধুনী রেখেছ, সেটা বসে-বসে করে কি?'

'ওই তো বললাম ইমামকে নিয়ে ব্যস্ত—ক'দিক একা সামলাবে বলো? আর বয়সও তো নিতান্ত অল্প!'

'একেবারে কচি খুকী, নাক দিয়ে দুধ গলে! বুড়ো বয়সে ঢং দেখে মরে যাই! ওই অলক্ষ্মী এসেছে অবধি আমার সংসারে শনি ঢুকেছে। একবার আমার সংগে চার চোখে দেখা হলে বুঝিয়ে দিতাম হারামজাদীকে। তোমাকে তো পান-পড়া খাইয়েছে। তুমি তো এখন মানুষ-আকৃতি ভেড়া।'

কমলকামিনীর এ রূঢ় মন্তব্য বিপ্রপদর মোটেই ভাল লাগে না। অথচ তাঁকে নিষেধও করতে সাহস হয় না। তাই নির্বিবাদে অপ্রীতিকর উক্তি হজম করে যেতে হয়। শক্তি-সামর্থ্যে তিনি কমলকামিনীর চেয়ে অনেক গরিষ্ঠ হলেও, আশ্চর্যের বিষয়, অপরাধীর মত হীনবীর্য হয়ে বসে থাকেন।

'এই তেল-গামছা—ঐ নাপিত এসেছে, একটু তাড়াতাড়ি করে স্নান করে এসে চারটি মুখে দাও।'

এতক্ষণ বাদে হঠাৎ নাট-মন্দিরের দিকে নজর পড়তেই বিপ্রপদর বুকটা টাটিয়ে ওঠে। 'ও কি! আমার নাট-মন্দিরের টিন হলো কি? শিবে, টিন নিল কে রে? একটু অভাবের বাতাস গায় লাগতে না লাগতেই টিন বেচে খাওয়া স্বরু করেছিস্? বলি বড়বৌ…'

'চুপ করো, চুপ করো।' কমলকামিনী ত্বরায় ঘর থেকে বের হয়ে বলেন, 'চুপ করো আর লোক হাসিও না—আমার মাথা খাও।'

'আমি চুপ করব আর তোমরা দেওরে ভাইর বৌতে মিলে দিব্যি এক একখানা করে বেচবে টিন?'

'আরে, তোমার টিন কে বেচে? আগে শোনই না সব কথা তার পর চেঁচামেচি করো।'

'শুনব কি আবার, শুনব কি? দেখে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। এক একখানা ঘর তুলতে…'

'তুমি ক'খানা টিনের জন্য যা করছ আমরা যদি তা পারতাম তা হলে শক্তিগড়ের সব লোক এতক্ষণে এই উঠানে জমা হতো। ভেবেছ, তোমারই শুধু দুঃখবোধ আছে, আর কারুর তা নেই? তুমি পুরুষ মানুষ কি না, হায় রে স্বার্থপর জাত!'

আগন্তুক নাপিতটা দীনু ঠাকুরের কাহিনীটা বিপ্রপদর কাছে সবিস্তারে গল্প করে। জোঁকের মুখে চুন দিলে যে অবস্থা হয় বিপ্রপদরও তাই হয়। তিনি কথা ঘুরিয়ে বলেন। 'আমাকে আগেই জানালে হতো। আমি কি কিছু জানি—না আমাকে কেউ কিছু জানিয়েছে? হঠাৎ আমি এসে বুঝি কি বলতো হারু। যাক, দাও তো আমার দাড়িটা কামিয়ে। চুলটা আজ থাক। কাল একবার এসো কেমন?'

রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বামি-স্ত্রীতে কথা হয়—

বিপ্রপদ একটা একটা করে মালার সব কথা ভাল করে কমল-কামিনীকে বুঝিয়ে বলেন।

'সামান্য ক'খানা টিন, সেও জং-পড়া মরচে-ধরা টিন, তার জন্য যদি তোমার অতখানি বুক টাটায়—তা হলে আমার মনে যে কি আঘাত লাগতে পারে তা কি একটি বারও ভেবে দেখেছ?

'দেখেছি--কিন্তু কিছুতেই এড়াতে পারলাম না।'

'এখন আর বলে লাভ কি! আমাকে খবর দিয়ে নিলেই হতো।'

'তোমাকে যে নেওয়া দরকার, এতটা যে গড়াবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আর তুমি তো কিছুতেই এ সংসার ছেড়ে যেতে পারতে না। গেলে কি আমি ঠেলে ফেলে দিতাম, না অযত্ন হতো তোমার?'

'এখন ওকে ভালয়-ভালয় বিদায় করো।'

'কোথায়?' বিপ্রপদ শুয়েছিলেন বিছানায়, উঠে বসে বলেন, 'কমল, ভাল কথা, তুমিই একটা স্থান নির্দেশ করে দাও কোথায় আমি ওকে ঠেলে ফেলব। আমি তা আজও ঠিক করে উঠতে পারিনি। তুমি তৃতীয় ব্যক্তির মত, ন্যায্য শালিসের মত ওর একটা স্থান দেখিয়ে দাও। তা হলে আমিও সকল দায় থেকে মুক্ত হয়ে তোমাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করি।'

কমলকামিনী বিপ্রপদর কথায় কি জবাব দেবেন তাই চিন্তা করতে থাকেন। রাগের মাথায় যা-তা বলা চলে, কিন্তু ন্যায্য কথা বলতে বসে তো আর অবিবেচনা করা চলে না। কুকুর-বিড়াল নয়, একটা মানুষ—চাবুক মেরে তো আর পথে বের করে দেওয়া যায় না।

'এখন কি করতে বলো?'

'ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। ওর সব শুনে আমারও মনে দুঃখ হয়, ও দেশে এসে দেবসেবা নিয়ে থাক। আমাদের দেশে তো বড় লোকের ঘরে এ রকম কত রয়েছে।'

'কমল, তুমি কি ওকে সহ্য করতে পারবে?'

একান্ত না করতে পারি তখন একটা ব্যবস্থা হবেই। আমার তো আশ্রয়ের অভাব নেই। আমার ছেলে বড় হচ্ছে, জামাই-মেয়ে আছে, বাপের বাড়ী রয়েছে—আমার আবার অভাব কি?...এক চিন্তা তোমাকে নিয়ে—তোমার যদি কষ্ট না হয় তত্ত্ব-তদ্বির চলে, আমার জন্য আমি ভাবি নে।'

'এ তোমার রাগের কথা। মালার জন্য তুমি আমাকে ছাড়বে আমি ছাড়ব তোমাকে, কেমন করে ভাবলে এ কথা? এ এক অসম্ভব কল্পনা নয় কি কমল? আমি নিতান্ত বিষয়ী লোক। আমার লোকজন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এই বিষয়-সম্পত্তি, এ সবই ভালবাসার জিনিষ! এদের কেন্দ্রে রয়েছ তুমি। তুমি চলে যাওয়া মানে আমার ভালবাসার জিনিষগুলো কক্ষচ্যুত হওয়া। আমি কি প্রাণ থাকতে তা সইতে পারি? তাই তুমি ছাড়া আমি একান্ত অসম্পূর্ণ।'

'তুমি যদি একটা প্রতিশ্রুতি আমাকে দাও—শক্ত হয়ে তা দিতে পার—তা হলে আমি সবই সহ্য করে নিতে পারব। যেমন কেটেছে এতকাল, বাকীটাও তেমনি কেটে যাবে, নইলে কি যে হয় বলা যায় না!'

'কি প্রতিশ্রুতি?'

'ওকে আর কোনও দিন আস্কারা দেবে না।'

'প্রতিশ্রুতি না নিয়ে, প্রতিজ্ঞা না করিয়ে তোমার ইচ্ছানুসারে কতদূর চলতে পারি তাই পরীক্ষা করে দেখা উচিত। পালন না করতে পারলে মিছামিছি কথা দিয়ে লাভ কি?'

'তবে তুমি নিজেকেও নিজে বিশ্বাস করো না?'

'এখন সে বিশ্বাসও আমি হারিয়েছি—সে গর্ব করার অধিকার আমার আর নেই।' বিপ্রপদর মাথা হেঁট হয়ে পড়ে।

কমলকামিনী নীরব থাকেন।

একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় ঘরখানা যেন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

'তোমার কথামত ওকে দেশে পাঠিয়ে দেব এবং খুব তাড়াতাড়িই তা দেব, কিন্তু দেশে এলেও ওর ভাগ্যে শান্তি নেই—একটা ওলট-পালট হবে!'

'তার জন্য আমি ডরাই নে যদি তুমি ঠিক থাকো। অন্যায় যদি না করি তবে ভয় কিসের? নিরাশ্রয় বামুনের মেয়ে, থাকবে পুজো-আচ্ছা নিয়ে—তার জন্য কেউ কিছু বলতে এলে…আচ্ছা আসুক না তার ব্যবস্থা আমিই করব।'

আবার নীরবে কাটে কতক্ষণ।

'যে জন্য এসেছ, তার কি ব্যবস্থা করবে স্থির করলে?'

কিছুই তো স্থির করতে পারিনি। এদিকে কি আছে না আছে তাও তো আমি জানি নে।'

'টাকা-পয়সা বলতে সামান্য কিছু আমার হাতে আছে, তা দিলে এখানেব সব ভাতে মরবে। নাট-মন্দিরটারই বা কি করবে? বর্ষা এলো, টিন কিনে মেরামত করা দরকার।'

'কি যে করব কিছুই বুঝি নে। আমার সব গেল কমল—সব গেল! এ দেশে আমি ধার চাইলে আমাকে এখন একটি পয়সাও কেউ দেবে না। বরঞ্চ ব্যঙ্গোক্তি করে দু'-চার-দশটা মুরুব্বিয়ানা উপদেশ দেবে মাত্র।'

'তাই তো বলি, দুঃসময় পড়লে হাল্কা না হয়ে ওজন রেখে চলতে হয়।' কমলকামিনী একটু ইতস্তত করে বলেন, 'তুমি রাগ না করলে একটা পথ বলে দিতে পারি।'

'রাগ করব কেন? বল না পথটা কি?'

'নাট-মন্দিরটা বিক্রি করে দাও।'

'বলো কি? তোমার মুখ দিয়েও এমন কথাও বের হলো! দেহে

একবিন্দু রক্ত থাকতে তা পারব না। দেউলিয়া হয়েছি বলে এমন করে খাতায় নাম লেখাতে যাওয়ার চেয়ে মরা ভাল।'

'তোমার চিরকেলে দোষ একটা কিছু শুনলেই হৈ-হৈ করে উঠবে—তলিয়ে দেখবে না। ওটা দিয়ে করবে কি? বর্ষাকালে যখন মেরামত করা যাবে না, জলে জলে পচে যখন ওখানেই লয় পেয়ে যাবে—তখন বেচায় দোষ কি? বরঞ্চ লোকের কাছে বলো যে দালান দিচ্ছ, তাই টিন-কাঠ বেচে ওর সংগে টাকা পুরিয়ে ইঁট পোড়াবে। দেখবে বেশ চড়া দামেই বিক্রি হয়ে যাবে ঐ ঘরটা। তারপর যে বৃহৎ কাজে হাত দিয়েছ সেই হালুটি যদি টাকার অভাবে না জাগে, তবে এ সংসার আরও দশখানা ঘর দিয়ে প্রতিপালন করে রাখতে পারবে না। থাকত চাকরীটা, তা হলেও এ কথা বলতাম না। আমার মতে তাই করে একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করো। সেই উপলক্ষে গ্রামবাসীদেরও একদিন খাইয়ে দাও। ওতে আব ক-টা টাকাই বা খরচ হবে—সকলে বুঝবে বোসেরা এখনও মরেনি, তাদের হাড়ে কথা বলে।'

'যা বলেছ, কথাটা মন্দ নয় বড়বৌ—তাই করব।'

'তারপর আমার গয়নাগুলো দূরে এক বন্দরে বেচে টাকা নিয়ে যাও। কপালে থাকলে আবার ঢের হবে। সকল পুঁজি খুইয়েও যদি আমরা ধান পাই, ওতেই আমাদের মান, ওতেই তুমি আবার ফিরে পাবে সকল সম্মান।'

'তুমি মেয়েমানুষ কিন্তু দেখছি তোমার কলিজাটা বেশ শক্ত!'

তা ঠিক—তা ঠিক। নইলে তার স্বাধিকার থেকে পারে কি একটা দাসী-বাঁদীতে তাকে বঞ্চিত করতে! তিনি হৃদয় পাষাণ করেছেন। আর কেউকে তিনি বাধা দেবেন না—কারুর আত্মতৃপ্তিতে হবেন না প্রতিবন্ধক। যে ইচ্ছা করে চলে যাবে, যাক চলে, তার জন্য তিনি চোখের জল ফেলবেন না—তার অশুভ চিন্তাও করবেন না। তিনি

নির্মম হয়ে নিজেকে সংযত করে রাখবেন। স্বামী তাঁর নাকি বিষয়ী লোক, তিনিও কি কম বিষয়ী ?

স্বামীর স্বাস্থ্য ও দেহ-মন রক্ষার জন্য মালার প্রয়োজন—তা তিনি যখনই উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তখনই মালাকে এ সংসারে দিয়েছেন আশ্রয়। তার জন্য ঝগড়া বিবাদ কলহ কিছুই তো হলো না। তাঁর স্বামী বিষয়ী, তিনি কি তাঁর চেয়ে কম বিষয়ী!

এর পর দু'দিন যেতে না যেতেই নাট-মন্দিরে হাতুড়ির ঘা পড়ে।···

প্রথমটা বিপ্রপদ কানে আঙুল দিয়ে বসে রইলেন। প্রত্যেকটা ঘা যেন এসে তার হৃদ্‌পিণ্ডে পড়ছে। শেষটায় এ ভাবেও যখন আর বসে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব তখন তিনি একখানা লাঠি হাতে নিয়ে উঠে বাগানের দিকে চলে গেলেন। যত দূর পর্যন্ত শব্দ গেল তত দূরের ভিতর তিনি আর তিষ্ঠাতে পারেন না। তিনি আসার সময় দেখে এসেছেন, কমলকামিনীও সেবাকে নিয়ে গুরু-বাড়ীর দিকে চলে গেছেন।

তবে তাঁর মনেও আঘাত সমানভাবেই লেগেছে। হাজার হলেও মেয়েলোকের মন তো! বিপ্রপদ একটা মরা জিনিষ ছাড়ার আঘাত সইতে পারছেন না, ব্যাকুল হয়ে এই বাগানে ছুটে এলেন—আর কমলকামিনী কি করে সইছেন জীবন্ত স্বামীর আঘাত। রক্ত মাংস দেহ মনের আঘাত। যার অণুপরমাণুটি পর্যন্ত কমলকামিনীর কাছে অতি প্রিয়, অতি লোভনীয়। দিবসে নিশীথে কত পরিচযার সামগ্রী বিনা দ্বন্দ্বে তিনি ত্যাগ করলেন। না, না, বিপ্রপদ তাঁকে বাধ্য করাচ্ছেন নিঃসম্বল বৈরাগ্যের পথ ধরতে। এ অনুচিত কাজ তিনি কিছুতেই করতে পারেন না। যত কঠোরই হক, তিনি এখনই আজই কমলকামিনীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবেন। মালা যা চেয়েছে, তাই পেয়েছে—তার চেয়ে অতিরিক্তও কিছু হয়ত পেয়েছে। এখন সে লোভ তাকে ছাড়তে হবে। আশ্রিতা আশ্রিতার মতই থাকবে।

রাত্রে আবার কথা হয়—

'কমল তুমি যা বলেছ সেই কথাই রাখব আমি। অবাঞ্ছিত যা ঘটে গিয়েছে তার জন্য ক্ষমা চাইছি।'

একটু ম্লান হেসে কমলকামিনী জবাব দেন, 'পারলে তো ভালই—তাতে সুখী হবে। নইলে আরও যে কত আশংকা আছে বলা যায় না। এ আমি আমার স্বার্থের দিকে চেয়ে বলছি নে—তোমার পুত্র-পরিজনের ভবিষ্যতের দিকে চেয়েই বলছি।'

চৌদ্দ

সব কাজকর্ম সেরে গহনা-পত্তর বেচে বিলে আসতে বিপ্রপদর বেশ একটু দেরী হয়ে যায়। সর্বসমেত যে টাকা হয়েছে তাতে ধার-দেনা শোধ হয়েও হাতে কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকবে। তাই মনে একটা আনন্দ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তা ছাড়া কমলকামিনীর সংগে একটা রফা হয়ে মালারও একটা পথ স্থির হলো। ওর জন্য একটা চিন্তা ও ভয় তাঁর মনেও কম ছিল না। সব শুনলে মালাও আশ্বস্ত হবে। একটু কোন্ না খুশীও হতে পারে!

কিন্তু তিনি বিলে এসে যা দেখেন তাতে তাঁর অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে—এবার আর রক্ষা নেই!

একটা একটা করে তাঁর পাহাড়ের মত সব ক'টা মোষ কাত হয়েছে। হাল বন্ধ। তাতে আবার বিপ্রপদর আসতে দেরী দেখে সবাইর মনে একটা আশংকা হয়েছে যে টাকা বোধ হয় জোগাড় হয়নি। এমন অনেকেই হালুটি আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত যেতে পারে না। সাধারণ লোকের পক্ষে দৈবের সংগে আড়ি দিয়ে এ ব্যয় একটা অসম্ভব ব্যাপার। যে সংকুলান না করতে পারে তাকে মাঝ-পথেই ছেদ টেনে রিক্ত হস্তে

ফিরে যেতে হয় দেশে। এবার এখানেই শেষ বুঝে দু'একজন করে সকলে মিলে জোগাড় হয়েছে—দেশে ফিরে যাবে।

ইমাম ভাল হয়েছে বটে, কিন্তু তার দুর্বলতা এখনও কমেনি। সে টিলার ওপর একটা লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে সকলকে নিষেধ করছে। 'বাবু আইল বলইয়া—ভাইরা কেও যাইও না বিল ছাড়ইয়া। বোঁচকা বুঁচকি যা বান্দছ তা খুলিয়াই রাখো। এতদিনের দখল স্বত্বটা মাটি করাইয়া দিয়া যাইও না এট্টুর জন্য। এখনও দুইদিনের খোরাকী আছে সকলডির। তিনি আইলে একটা কিছু ব্যবস্থা হইবেই। ও আবদুল, ও রহিম, তোমরাই হইলা বেশী ব্যস্ত? কমু কি আমি!'

বিপ্রপদ দৌড়ে টিলার ওপর গিয়ে ওঠেন। গলা ছেড়ে ডেকে বলেন, 'ভাইরা তোমরা সব কোথায় যাবে? এই তো আমি এসেছি। টাকা, কত টাকা চাই তোমাদের? এই তো টাকার তোড়া।' তিনি একটা টাকার তোড়া খুলে মাটিতে ঝন্ ঝন্ করে ঢেলে দেন। তোমাদের কত চাই? তোমরা কি ভেবেছ বাবু তোমাদের দু' দশ হাজারের জন্য পিছিয়ে যাবেন খরিদ করা জমি থেকে? আমি শপথ করে বলছি, তোমাদের জন্য যত ব্যয় লাগুক আমি ত করবই। আজ তোমরা ফিরে যেও না। রহিম, এই জমিতে তোমার দু' দু'টো ছেলে মরেছে, তুমি কি বাপ হয়ে তাদের কথা ভুলে গেলে? এলে শত্রু জব্দ করতে, এখন নিজেরাই জব্দ হয়ে ফিরে যাচ্ছো? আমি বাপ হলে জান দিতাম তবু ফিরতাম না। আর আবদুল, তুমি আমাকে কি বলেছিলে? মনে আছে তোমার সেই প্রতিশ্রুতির কথা—সেই যেদিন তোমার গরুটাকে বাঁচাই আমি। আজ এমন কি দোষ দেখলে যে দেশে ফিরে যেতে যাচ্ছ? তা হলে মিথ্যা ভরসা দিয়ে আমার এতগুলো টাকা-পয়সা নষ্ট করলে কেন? আমি বলছি এখনও ফেরো, নইলে ধর্মে সইবে না। এখনও তো একটাও উপোষ করোনি—তবে?'

সকলে থতমত খেয়ে বিপ্রপদর দিকে চেয়ে থাকে। তিনি আবার বলতে থাকেন, 'ঐ দেখো, আউশ ধানগুলো কেমন মাথা-ঝাড়া দিয়ে সবুজ হয়ে উঠছে। সামনের ভাত রেখে দেশে যাচ্ছ—দেশে গিয়েই বা খাবে কি? কারুর তো তালুকদারী নেই।'

প্রকৃতি এবং দুর্দৈবের সংগে লড়াই করতে করতে হঠাৎ বিপ্রপদর তীব্রতম অনুভূতিতে ঘা লাগে। তিনি মনে মনে চিন্তা করে দেখেন, মানুষ সংগ্রাম ক্ষেত্রে এসে যখন ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন একা কেউ বাঁচতে পারে না। চাই সামগ্রীক বাঁচার চেষ্টা। চাই সমাজ-সচেতন নবীন দৃষ্টিভংগি। কেন্দ্রিভূত স্বার্থকে কেন্দ্রচ্যুত করে দিতে হবে সকলের কাছে ছড়িয়ে। পুরাণ প্রবাহকে বইয়ে দিতে হবে নতুন খাদে।

'শোন তোমরা, জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, ফসল ছাড়া তেমনি মানুস বাঁচে না। যে মড়ক দেখে আজ ভয় পাচ্ছ, সে মড়ক তোমাদেরও ঘরে ঢুকবে, যদি শুধু হাতে বাড়ী ফেরো। মন্বন্তরের কথা শোন নি? ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—বাঙলা-জোড়া আকাল? আজ আমি শপথ করছি, এ জমিতে নতুন স্বত্ব হবে—যৌথ-স্বত্ব, খামারও হবে যৌথ। প্রজা মনিবের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। তবে ফসলের ভাগটা হবে যার যার প্রয়োজন মত।'

মন মরা মানুষগুলো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

বিপ্রপদ বলেন, অতি উত্তেজনার মুখে সরল অন্তঃকরণেই বলেন, 'এখন আমার কি আছে? চাকরি নেই, নগদ টাকা নেই, সোনা গয়না তা-ও গেছে। ভাঙনের ধাক্কায় প্রায় তোমাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। এখন দেখছি তোমরা ছাড়া আমার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু দক্ষিণের বিলে ফসল ফলাতে হবে, গড়তে হবে এক নবীন সভ্যতা। রেখে যেতে হবে সমবেত শ্রমের কীর্তি। চাই তোমাদের

আন্তরিক সহযোগিতা।' বিপ্রপদর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে যেতে চায় দুর্দমনীয় ভাবাবেগে। তিনি কণ্ঠ পরিষ্কার করে ফের বলেন, 'এই যে চরম মুহূর্ত এসেছে, একে অভিশাপ না ভেবে আশীর্বাদ বলে আজ ধরে নিতে হবে, আমরা একত্র হয়ে শস্য বুনব, একত্র হয়েই ফসল তুলব। তার পর ধীরে ধীরে গড়ে তুলব হাট, গঞ্জ, রাস্তা, ঘাট। কিন্তু তোমরা না থাকলে কে মেলাবে হাট? কে শুনবে কবির প্যাল্লা এবং জারী? তোমরা কৃষাণ নও, প্রজা নও, দুর্দিনের ভাই। ফুল নইলে যেমন পূজা হয় না, চাঁদ নইলে আঁধার যায় না—তেমনি তোমাদের ছাড়া দক্ষিণের বিলে মা লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়বে না। অতএব অনুরোধ তোমরা ফেরো ভাই।'

বিপ্রপদর এ কথায়ও ওরা পৌটলা-পুঁটলি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ইতস্তত করতে লাগল সকলে মিলে। তিনি ছুটে ঘরের ভিতর গিয়ে একটা তীক্ষ্ণ ল্যাজা নিয়ে বেরিয়ে এসে এবার শাসিয়ে বলতে থাকেন, 'আমার বিল থেকে এক পাও কেউ নড়েছ কি তাকে ফালা ফালা করে ফেলব আমি। দেখি, কে যাবে যাও তো এইবার। দাও তো পা সীমানার বাইরে।'

জেল-খালাস তিন ভাই আবদুল ও রহিমের দিকে চেয়ে, ব্যংগ-কটাক্ষ করে হাসতে থাকে। 'কি এখন যাও না মণিরা। আমরা আগে কই নাই যে বাবু আইয়া লউক। গরীবের কথা বাসি হইলে মিঠা লাগে।'

যাওয়ার জন্য যাদের মন উড়ু-উড়ু করছিল অগত্যা তারা যাত্রা স্থগিত রাখে।

বিপ্রপদর দিকে আর তাকান যায় না! তিনি ক্ষিপ্তের মতো ঘুরতে থাকেন।

রাত্রে বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন—

'নিতাই কোথায়?'

'সদরে গেছে। কাল সকাল নাগাদ খুব সম্ভব ফিরবে। যদি—'

'কেন গেছে সদরে?'

'এন্তেজদ্দি নাকি একটা মামলা করেছে। আসামী দিয়েছে নাকি আমাকেও।'

'কি মামলা?'

'আমি জানি নে—ইমাম জানে।' মালা বলে, 'ঐ ত ইমাম…'

'কি মামলা ইমাম?'

'ধান ভাঙা মামলা।'

'মিছেমিছি হয়রান করার জন্য এ সব ফৌজদারী মামলা। এতে তো কোনও জুত হবে না।'

'আমি এট্টু সোজা হইয়া লই তারপর দেখুম মিথ্যা মামলা কারে কয়! পামু না বিলের এই আশ-পাশে?'

'যারা সোজা ছিলাম তারাও তো বেঁকে গেলাম ইমাম। এখন খোদাই বলো আর ঈশ্বরই বলো কারুর ওপর আমার আর বিশ্বাস নেই। মুখে যাই বলি এতগুলো টাকার চোট সামলান কি যে সে কথা! টাকায় টাকা গেল, কাজে কাজও হলো না। যমের বাহন বাইশ-বাইশটা মোষ তাও নিল যমে!'

'দুঃখ করইয়া হইবে কি? যত হালিয়া চাষা সকলডির এক দশা। এবার বিলে কারও মুখে হাসি নাই। একবার যার গরু পড়ে আর ওঠে না। খালের পানিতে খালি মড়ক ভাসে—গোন্ধে পানি মুখে দেওয়া যায় না। বাবু, এমন মহামারী দেখছিলাম আর ছোটকালে।'

'প্রায় প্রত্যেক বছরই এ মহামারী লেগে আছে, তবে উনিশ আর বিশ।'

'হয় বাবু, যা কইছেন! গরু-বাছুরই যদি হালিয়া চাষার না মরত তবে তাগো দুঃখ ছিল কি?'

মালা জিজ্ঞাসা করে, 'ইমাম, তোমার কত বয়স হ'লো ?'

'এই বাইশ-তেইশ হইবে।'

'দূর, চল্লিশের কম নয়।'

'জানি না মাঠাইন, তাও হইতে পারে।'

'ইমাম, আউশ ধান দেখে বোঝ কি, ওতে কি জুত লাগবে ?'

'লাগবে বাবু—আমি কইলাম নিচ্চয লাগবে।' যেবার গরু মরে সেবার ধান হয তেদুনা।'

'অর্থাৎ ছ'গুণ!' বিপ্রপদ বিশ্বাসই করতে পারেন না ইমামের কথা। তাঁর হাসি পায। 'আচ্ছা, তা যদি হয়, তোমাদের দু'বন্ধুকে এক ভাগ দেব এমনি।'

ইমামের চোখ দু'টো লোভে একটু জ্বলজ্বল করে ওঠে। পরক্ষণেই সে নৈরাশ্য-ভরা কণ্ঠে বলে, 'তা কেওরে কেও দেয় না, উঁহুঁ দেয় না বাবু।'

'আমি দেব ইমাম, নিশ্চয় দেবো।'

তার পর সে বলে যে তাদের কথা পৃথক। তারা তো ভালবাসার জন্য এক বছর এসেছে জমিতে। প্রতি বছর যে কৃষাণেরা রাত থাকতে উঠে ফের রাত হওয়া পযন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করে, হিসাব করে মজুরী দেওয়ার বেলা সব মনিবই যাতে দু'কাঠি ধান কম দিতে পারে তারই শুধু ফিকির-ফন্দি মনে মনে আঁটে। ওই যে ওরা বাড়ী যেতে চায়—সাধ করে চায় না! ওরা অনেক ঠকে এখন একটু হুঁশিয়ার হয়েছে। চাষের মরসুম পাঁচ মাস—তার তো দু'মাস গেল অমনি চলে। খাটুনি ওরা কম খাটেনি কিন্তু ফল হলো না কিছুই। হালুটি যদি না জাগে ওদের একটা বছরই মাটি'! ধান না হলে ওদের মজুরী দেবে কে ? তাই ওদের মন উড়ু-উড়ু! যারা রোজ-খাটা মানুষ তারা দু'-দু'টো মাসের মজুরী ফেলে কি সহজে পালাতে চায়!

'আমি তো ওদের মজুরী রাখব না।'

'খন্দ না জন্মাতে পারলে দেবেন কি দিয়া ?'

'দেব বাড়ী-ঘর বেচে।'

'এমন নজির দেখি নাই।'

'তবু কাজ তো রাখতে হবে।'

'সে কথা কি আমারে বুঝান লাগবে ? আমিও তো নিষেধ করছি ওগো যাইতে !'

আবদুল ও রহিম চুপে চুপে চোরের মত রাত্রে বিল ছেড়ে পালায়। বিলের দু'টো বাসা খালি পড়ে থাকে।

সব জানতে পেরে বিপ্রপদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু পরে ভাবেন ঃ ওরা মূর্খ !

পরদিন সকালেই নিতাই আসে। জানায় যে পেশ্কারকে ঘুষ দিয়ে মামলার তারিখ সে পিছিয়ে দিয়েছে দেড় মাস। এমনি করে ঘুষ দিয়ে মামলা ঘুরিয়ে রাখবে অন্তত চাষের জরুরী মরসুমটা। চাষের কাজ সারা হলে তখন দেশে গিয়ে ধীরে-সুস্থে বর্ণনা দেবে।...তার পর নিতাই খোঁজ নেয় টাকা-পয়সা কত দূর কি জোগাড় হলো ? সে আর দেরী না করে চারটি পান্তা খেয়ে টাকা পাঁচশো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। প্রথম পরের দেনা শোধ না করে নিজেদের ব্যবস্থা করা যায় না।

বিপ্রপদ চিন্তা করে কিছু কূল-কিনারা করতে পারবেন না বুঝে একটা কি কাজ করবেন তাই খুঁজতে থাকেন। টাকা তো মাত্র হাজার খানেক। তার ভিতর পাঁচশো তো এখনই খরচ হয়ে গেল। বাকী চারশো টাকা দিয়ে এ বিরাট ব্যয় তিনি কি করে সংকুলান করবেন ? নিতাই তো নিজের নাক-কান কাটা যাওয়ার ভয়ে অস্থির ; তাই ছুটল টাকা নিয়ে। এদিকের টাল কে সামলাবে ? বলদ চাই, এতগুলো লোকের চাল বেসাতি চাই, আরও যে কত কি চাই তার কি অন্ত আছে। উচিত ছিল ও চারশো টাকাও তার হাতে তুলে

দেওয়া। তখন যেন কেমন মায়া হলো শেষ সম্বলটা হাত-ছাড়া করতে। এখন তো এ টাকায় না হবে এদিক না হবে ওদিক। আর দু'-চারদিন তিনি এসব দেখে না হয় চম্পট দেবেন একদিকে। তার পর নিতাই বুঝুক—যে তাঁকে সমুদ্র সেঁচতে নামিয়েছে একটা শুধু ঝিনুক হাতে দিয়ে। প্রলোভনে পড়ে একটা আহাম্মকের কথায় তাঁর জীবনের সব সঞ্চয় খোয়ালেন এই দক্ষিণের বিলে।

রাত্রে বিপ্রপদর মনে হয়, এই অভিশপ্ত ক্রুদ্ধ দক্ষিণের বিলটা একটা ক্রূর হাসি হাসছে জ্যোৎস্নায়। আকাশের চাঁদ জলে কাঁপছে। একটা নিষ্ঠুর দ্যুতি যেন ছড়াচ্ছে চারদিকে। বাইরের দিকে তাকালে যেন চোখ ঝলসে যেতে চায়। তিনি কেমন একটা ভয়ে যেন চোখ বুজে থাকেন। ঘুম আসে না। আবাব কানে ভেসে আসে সেই মর্মন্তুদ গোঁঙানি। একটা গো-মহিষের মিলিত গোঁঙানি। সারা দক্ষিণের বিল জুড়ে সে শব্দ কঁকিয়ে বেড়াচ্ছে যেন। বিপ্রপদ কানে আংগুল দেন। এবার শব্দ শোনা যায় তাঁর মর্মপটহে। তিনি উঠে বসেন। একটা বাতি জ্বালাতে বলেন মালাকে।

পাশের ঘর থেকে আলো নিযে মালা আসে। সে জিজ্ঞাসা করে, 'কি, ঘুম হচ্ছে না বাবুজী?'

'না। নিতাই যে এখনও এলো না মালা?'

'কি জানি, তা বলতে পারি নে।'

'ইমাম, তুমি জানো?'

'আমি কি করইয়া জানুম? ও কি কোনও দিন আমাকে কিছু কয়? বিনা পয়সায় গোলাম পাইছে খাটাইয়া লয়। জমি কবলার সময় আমারডে জিগাইলে তো আমি নিষেধ করতাম এখানে এই পোড়া বিলে আইতে। টাকা গেল, মান গেল, এখন কোন মুখ লইয়া যামু দ্যাশে, আমার মরাই ভাল ছিল। খোদা আবার কি

দেখাইতে উড়াইল বাঁচাইয়া।' ইমামও এসে এগিয়ে বাতিটার কাছে বসে।

শুধু মালা দাঁড়িয়ে থাকে। সকলেই চুপ-চাপ—যেন তিনটি নৈরাশ্যের মূর্ত্তি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

ভোর না হতেই সকলে অভ্যাস মত উঠেছে। কিন্তু বলদ নেই, কি দিয়ে চাষ করবে? মনে সে জোরও নেই যে বুক দিয়ে লাঙল ঠেলবে। এখন বসে বসে ঝিমান ছাড়া উপায় কি? এ ভাবে বসে ঝিমান আর হাজত খাটা সমান কথা।

কিন্তু বেশী সময় আর ঝিমাতে হয় না। নিতাই একপাল মোষ এবং বলদ নিয়ে এলো হাসতে হাসতে। বিপ্রপদ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন: 'এ তুমি পেলে কোথায়?'

'চুরি করে এনেছি।'

'না, না, ঠাট্টা করো না—সত্যই এসব আনলে কি করে? বলো কি করে আনলে এতগুলো বলদ মোষ?'

'ঐ টাকা যারা পেত তারা মোষ-গরুর ব্যবসা করে—সেই রোস্তম ও গফুর মোল্লা। তারা বাকী টাকায় এগুলো দিয়েছে। আমন ধান বেচে পরিশোধ করতে হবে এদের দাম। বাবু টাকা না দিয়ে যাবেন কোথায়—যাঁর এতগুলো ধানী জমি। এক হিসেবে তারা অসময়ে যেমন খাতির করেছে, অন্য হিসেবে তারা সুসময়ে সুদ সমেত তুলে নেবে—এমনি চড়া দাম হেঁকে দিয়েছে। দিক—তবু উপকার তো হয়েছে এখন।'

আবার সাড়া পড়ে যায় বিলে। আনন্দ ও কোলাহলে কানে কিছু শোনাই যায় না কিছুক্ষণ। কে কোন্ জোড়া নেবে, কোন্ জোড়া কার মনের মত হলো, এই নিয়ে একটা কাড়াকাড়ি প্রায় মারামারিতে গড়িয়ে

যাবে বলে মনে হয়। বিকালে নিতাই বাট করে দেবে এই বলে সকলকে থামায়।

শুধু জান-খালাস তিনি ভাই কিছু বলে না, একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে।

আবার পূর্ণ উদ্যমে চাষের কাজ চলতে থাকে। আমনের বীজ ফেলতে হবে, সাজাতে হবে বোয়া ধানের জমি। জ্যৈষ্ঠ গেল, আষাঢ় মাস এলো ব'লে। মাঝে মাঝে আকাশে মেঘ হয়—মাঝে মাঝে জল হয়, এই তো আষাঢ়ের সূচনা। এখন আর 'জো'র জন্য বসে থাকতে হয় না। জমি সব সময়ই রসাল থাকে—হড-হড করে মই চলে। বলদগুলো এমন কি মোষগুলোও আর হাঁপিয়ে ওঠে না চমকা কড়া রোদে। চারদিকের রোগটাও যেন ক্রমে কমে আসছে। আর শোনা যায় না মড়কের কথা। ভরসা হয় মনে, উদ্দীপনা আসে কাজে। কৃষাণেরা ফাঁকি দেয় না, মরিয়া হয়ে খাটে, জিদ করে খাটে।

বসে থাকেন না ভূস্বামী নিজেও। নতুন দড়া-দড়ি পাকান, ভাঙা গোয়াল জোড়া-তালি দিয়ে বর্ষাকালের উপযোগী করে মেরামত করেন। বুড়ো বয়সের ছেলের মত এই শেষকালের বলদ-মোষগুলোর ওপর বড় মায়া হয়। এখন এদের ওপরই ভবিষ্যতের ভরসা। ওরাই খেটে-খুটে ফসল কামাবে—প্রতিপালন করে রাখবে বিলের সকলকে।

অবশেষে একদিন আমনের বীজ বোনা হয়ে যায়।···

দেখতে দেখতে দক্ষিণের হাওয়া পূবে ঘোরে। কালো পেঁজা তুলোর মত জ'লো মেঘ ঘর-বাড়ীর ওপর দিয়ে ভেসে যায়। মালা ভাবে: কেউ একটু ওপরে উঠে হাত বাড়ালেই বুঝি ধরতে পারে ঐ মেঘ। ফুলে ফুলে লালে লাল ঐ যে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা—ওটার মাথা ছুঁয়ে চলেছে মেঘেরা সব দল বেঁধে। এখন আর বর্ষা থামে না, পশলায় পশলায় আসতে থাকে ঝরতে থাকে জল। বেঙগুলো গাল ফুলিয়ে

মনের আনন্দে ডেকে চলে। ছোট-ছোট গামছা পরে জলে ভিজে কৃষাণেরা কাজ করে। কখনও কখনও এমন অন্ধকার করে আসে যে, ওদের কালো রং মেঘের কালো ছায়ায় মিশে যায়। দূর থেকে চেনা দায় হয়। একটু একটু করে বিলে জল জমে। প্রথম ডোবে পায়ের পাতা, শেষে হাঁটু পর্যন্ত। সারাটা জোয়ার এমনি কাটে, আবার ভাঁটা এলে জল অনেকটা কমে যায়।

বিপ্রপদ এবং নিতাই খুবই হিসাব করে নগদ টাকা কয়টা ব্যয় করেন। ঐ টাকার ওপরই নির্ভর এবারের হালুটি। একদিন হাটে গিয়ে দু'জনে মিলে চাল বেসাতি ও অন্যান্য সব কিছু কিনে আনেন মাসের আন্দাজ। তবে চিটে গুড় ও তামাকটা পরিমাণে একটু বেশীই আনেন। একবেলা ভাত না হলে চলে কিন্তু ওটা চাই-ই চাই।

আউশ ধান আশাতীত ভাবে মোচড় দিয়ে ওঠে। বিপ্রপদ কখনও সংগোপনে একা একা জমিতে গিয়ে এক একটা সবুজ গুচ্ছ বুকে জড়িয়ে ধরেন। এখনই সামলান যায় না, আরও একটা মাস সুমুখে পড়ে আছে। তখন যে কি হবে তা তিনি ভাবতেই পারেন না।

ইমাম ভাল হয়ে কাজে নেমেছে। মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি সে সেরে উঠেছে। নইলে আরও কত দিন যে বুড়ো মানুষের মত ঝিমাত কে জানে!

এক দিন সকাল বেলাই জল প্রায় শুকিয়ে গেছে ভাঁটার টানে। একটা গণ্ডগোল শোনা গেল। ইমামের গলাটাই উঁচু। মালা বিপ্রপদকে ডেকে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। কয়েক জন কৃষাণও ছুটে গেল জোর পায়ে। আউশ ধানের রোয়ার ভিতর যেন একটা হা-ডু-ডু খেলা চলছে। ধরি ধরি করেও যেন ধরতে পারছে না কেউ। কেবলই পিছলে যাচ্ছে সকলের হাত থেকে। একটা বড় ভেটকি মাছ।

অবশেষে ইমামই ধরে ফেলে। কিন্তু তার পিঠের ওপর গিয়ে পড়ে পাঁচ সাত জন হুড়মুড় করে। আবার হাত থেকে ছুটে পালায় মাছটা। সামান্য জল চিরে তীরের মত ছুটে চলেছে। শেষ পর্যন্ত এতগুলো লোকের কবল থেকে আর এড়ায় কি করে? ইমাম কানসি ভিতর হাত গলিয়ে টেনে নিয়ে এলো বাইরে, রোয়া ধানের জমি থেকে।

ক'দিন ধরে সকলেরই খাওয়া-দাওয়ায় বড অসুবিধা হচ্ছে। তরিতরকারী নেই—শুধু পেঁযাজ-রসুন এবং লংকা-পোড়া। সকাল সন্ধ্যা দুপুর তিন বেলা আর কাঁহাতক ওই এক জিনিষ মুখে রোচে! এবার যে উৎপাত—তার ভিতর বর্ষা কালেব জন্য কোনও কৃষিই টিলা-গুলোর আশে-পাশে জন্মান হয় নি। দু'টো ঝিঙে, কি বর্ষা-কুমড়োর গাছও যদি সময় মত রোয়া হতো তবে দু'-এক দিন মুখ বদলান যেত। দেশে এখন কত কৃষি, এখানে কিছু নেই। তাই মাছটা পেয়ে সকলের খুব আনন্দ হয়েছে। সকলেই খাবে, বেশ আশ মিটিয়ে খাবে, টাটকা-বাসি সব রকম।

মাছটা যখন কাটা হয় তখন প্রায় একটা মানুষের গায়েরই যেন রক্ত ঝরে। বঁটি তো নেই, একটা রামদা দিয়ে কাটা হচ্ছে মাছ। সেটা রাঙা হয়ে গেল রক্তে। ঐ রক্ত ও মাছটার ভারী চাহনি দেখে মালার মনটা কেমন যেন বিগড়ে যায়। বিলের সকলে যখন স্ফূর্ত্তিতে মাছ খায় মালা তখন একখানাও ছোঁয় না। সে তার ভাগের ক'খানা ছাড়াও আরও দু'-চারখানা আসমানতারার জন্য তুলে রাখে—পাঠিয়ে দেবে কাউকে বলে-ক'য়ে। অনেক দিন আসমানতারাকে দেখেনি, মোবারকও এদিকে আসেনি কাজের চাপে—ওদের একবার দেখতে ইচ্ছা করে। বিশেষত আসমানকে। পুরুষের ঝামেলা ছাড়িয়ে দু'দণ্ড ওর সংগে বসে গল্প করতে ইচ্ছা করে।

বিপ্রপদ এবার বিলে এসেই নাকি বলেছেন মালাকে দেশে যেতে

হবে। যত শীগগির সে যায় ততই নাকি ভাল। এত দিন শক্তিগড়ে যাওয়ার জন্য বেশ একটা উৎসাহ ছিল। আশংকাও যে না ছিল তা নয় —তবু মালার উৎসাহ ছিল।• কিন্তু বিপ্রপদর মত ছিল না। এখন তাঁর মত হয়েছে, মালার হয়েছে ভয়। এ ভয়টা কিসের জন্য তা সে কেমন করে কার কাছে প্রকাশ করে বলবে! তাই আজ তার আসমান-তারাকে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার কাছেও কি সে এ সব কথা খুলে বলতে পারে? না, কিছুতেই পারে না। গলায় দড়ি দিয়ে মরবে তবু পারবে না।

মালা অন্তঃস্বত্বা।…

পনেরো

আবদুল ও রহিম এবং মাঝিটা যে জমি চাষ করত সে জমি পড়ে রয়েছে। তার স্বত্ব এখন সকলের। চাষ করার দায়িত্বও সবাইর। কিন্তু দশ জন কৃষাণ এতগুলো বাড়তি জমি চাষ করবে কি করে? এমনিতেই তারা হিম-শিম খেয়ে যাচ্ছে। নিতাই ও ইমামকে হাল নিয়ে নামতে হয়। কিন্তু তাতেও ইচ্ছা মত কাজ অগ্রসর হয় না। না হওয়ারই কথা—কারণ কতগুলো হাল কামাই গেল তো! ধীরে ধীরে বিপ্রপদও একখানা হাল জোড়েন। নিজের অক্ষমতায় প্রথম প্রথম খুবই লজ্জা হয়। শেষে সব ঠিক হয়ে যায়। হাতে কড়া পড়ে। লোকে ভাবে: বাবুর এ সখ। কত রাজা-বাদশারাও তো সখ করে এ কাজ করেছে;

বিপ্রপদর মন নতুন কাজের নেশায় ডুবে থাকে। তিনি সংসারী খুঁটি-নাটি কাজের কথা ভুলে যান! ভুলে যান মালা ও কমলকামিনীর কথা। মালাকে যে দেশে পাঠাতে হবে, তা হয়ত সময় সময় তাঁর মনে

হয়, কিন্তু লোকজন কেরায়ার নাও যোগাড় করতে হবে—হয়ত তাঁকেও শেষ পর্যন্ত যেতে হতে পারে সঙ্গে—তাই তিনি ও-সব কথা মনে হলেও এড়িয়ে থাকেন। এত দিন যখন গেছে, আর ভু-দিনে এমন কি দোষ হবে? তিনি ডুব দিয়ে থাকেন তাঁর চাষের কাজে। এই ক'টা দিন আগেও তাঁর মনটা নৈরাশ্য ও ভয়ে আঁধার হয়েছিল—আজ তা আশা ও সাহসে উদ্ভাসিত। তা তিনি উপভোগ না করে কোথায় যাবেন? মালাকে দেশে পাঠাতে হবে—তা ক'দিন বাদে পাঠালে হবে কি? থাক না মালা, যাবে তাঁর সংগে দেশে—যাবে ক'দিন বাদে প্রথম আশ্বিনে।

মালা বিপ্রপদর লাঙল ঠেলা দেখে মনে মনে মহা বিরক্ত হয়—দুঃখ হয় বাবুর গত জীবনের কথা ভেবে—কিন্তু সুখও বোধ হয় এত বড় একটা নতুন গণ জীবনের সংগে পরিচিত হয়ে। এ শুধু পরিচয় নয়, প্রেম ও বিস্ময়ে সে যেন জড়িয়ে পড়েছে। ইমামকে সে ভালবেসেছে, নিতাই তাকে মুগ্ধ করেছে—বিস্মিত করেছে জানখালাস তিন ভাই—আর এই যে দক্ষিণের বিলের ঋতু পরিবর্তন সে তো কখনও কোথাও দেখেনি এত সাগ্রহে। মালা যাবে, হয়ত কেন, নিশ্চয় যাবে শক্তিগড়ে, কিন্তু কি করে ছেড়ে যাবে এদের?

দু'দিন দেরী হলেও জমিগুলো বেশ পরিপাটি করে সাজান হয়। একটিও বন-বাঁদাড়-ঘাস-জঙ্গল নেই কোনওখানে। মাটিতে নেই একটুখানিও খিঁচ। হাঁটলে মনে হয় যেন মাখনের ভিতর দিয়ে কেউ হাঁটছে। টাটকা রসালো মাখন। সারা বিলটাকে বিপ্রপদর বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। ওঁর সাধের দক্ষিণের বিল। পুত্র-পৌত্রের ভোগের সামগ্রী। বিপ্রপদ মাথার ঘাম পায় ফেলে জুড়ে-গেঁথে রেখে গেলেন—তারা বসে বসে খাবে আর স্মরণ করবে। ভয়ে-বিস্ময়ে হয়ত গল্পও করবে পিতা-পিতামহের আফ্রিকার এই বিপদ-সংকুল অভিযানের কথা। এমনি ধারা আরও ক'পুরুষ না জানি বিপ্রপদ বেঁচে থাকবেন

বংশধরদের মুখে মুখে। এই যে হাতে পড়েছে শক্ত কড়া, পায় লেগেছে খয়রা ছোপ—এ সব আর কিছু নয়, ওঁর কঠিন কঠোর সংগ্রামের স্মৃতি।…

এখন আর দেরী না করে বীজ রুয়ে দিতে হবে, তাই নিতাই ছোটে কামলা-মজুর খুঁজে আনতে। নিকটেই কোন একটা বন্দর থেকে তাদের যেন ঠিক-ঠাক করে আনবে। জন পঞ্চাশ লোক হলে দু'দিনেই প্রায় সব জমি ঢাকা হয়ে যাবে—বাকীটা ধীরে ধীরে কৃষাণেরা সারবে। এ কথায় কৃষাণেরা প্রতিবাদ করে। তারা আরও বেশী মজুর আনতে জিদ করতে থাকে। এখনও আউশ ধান পাকতে দিন পনর বাকী, চাষের কাজও শেষ হয়ে গেছে—মজুর দিয়ে সব করালে—এ কদিন কি ওরা থাকবে পটের বিবি হয়ে? বিপ্রপদ নতুন মানুষ। তাঁকে না হয় অনায়াসে ফাঁকি দেওয়া যায়. কিন্তু নিতাইকে বোঝাবে কি করে? সে ঘাগি কৃষাণ, তার কাছে চালাকিটা সহজেই বানচাল হয়ে যায়। কৃষাণরা মনে মনে বিড়-বিড় করতে থাকে।

মজুর যারা আসে তাদের বাড়ী নিমতলার কাছে যেন কোন গাঁয়! তারা মনের আনন্দে গান গেয়ে বীজ তোলে। আবার সেই বীজ রুয়ে যায় গানের ছন্দে ছন্দে। তারা বিপ্রপদ ও মালাকে চেনে বলে কাজে এতটুকুও ঢিল না দিয়ে বরঞ্চ জোরই দেয়। তাই অনুমানের অতিরিক্ত অনেক বেশী জমিও ঢাকা পড়ে। বিপ্রপদ খুশী হয়ে বখশিস দিতে চাইলে তারা শুধু শুনতে চায় মালার মুখের দু'টো কৃষ্ণবিরহ সংগীত। অনেক দিন বিপ্রপদও মালার গান শোনেননি—আজ সে গানের ঝংকারে তাঁর দেহ-মন কেন জানি অনুরণিত হয়ে ওঠে। যেন নতুন করে কানে এলো—আজই প্রথম শুনলেন মালার মধুক্ষরা কণ্ঠ।…মালা চলে যাবে, নিতাই ইমামও চলে যাবে, কৃষাণদের মনও উড়ু-উড়ু হয়েছে অনেক আগেই—শুধু

তিনি যেতে পারবেন না। এই শূন্য নিঝুম বিলটা তাঁকে একা ব'সে আগলে থাকতে হবে। দু' একজন সংগী যারা থাকবে তাদের বাসাও দূরে দূরে !···

মালাকে দিয়ে বিলের সংসার। মালা এখনই শক্তিগড না গেলে হয় না? কে রাখবে তাঁর এই বিরাট হাল-হালুটি গুছিয়ে? কে বা দেবে তাঁকে কাজের প্রেরণা? শক্তির উৎস যদি চলে যায় কে সমন্বয় করে রাখবে এতগুলো মানুষ-জন-গরু-মোষের অভিযান ?

'নিতাই, এখন আর আউশ ধান পাকতে দেরী কত ?'

'আর দশ-পনর দিন লাগতে পারে।'

'দশ এবং পনরতে তো তফাৎ কম না ?'

'তফাৎ যাই হক, এ ক'টা দিন তো সবুর না করলে চলবে না।'

বিপ্রপদকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। গায়ের জোরে কেউ ফসল পাকাতে পারে না। কিন্তু তাঁর যে হাতের সব টাকা ফুরিয়ে গেছে। আন্দাজের বাইরেও চাল খরচ হয়েছে। এতগুলো লোকের প্রায় দু'সপ্তাহের চাল কেনা—সহজ কথা নয়! কোন্ না বেশী দিনেরও কিনতে হতে পারে। ফসল পাকলেই খাওয়া যায় না। মলতে হবে, ঝাড়তে হবে, নিয়ে যেতে হবে হাটে—তার পর চাল। তেলও ফুরিয়েছে। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বিনা তেলেও পাঁচ-দশ দিন চালান যাবে। নুণ যা আছে তাতে যদি টান পড়ে তাও না হয় একটু কমিয়ে খাওয়া চলে। আর কৃষাণদের পান্তা ভাতে এত নুণও লাগে। নুণটা একটু সস্তা বলে ওরা মোটেই হিসাব করে খায় না। সাধে ওদের সংসার ফাঁপে না? যত বেহিসাবীর দল এসে জুটেছে তাঁর কাঁধে।

ক্রমে ক্রমে শ্রাবণের ধারা কমে এলো। সারা মাঠ এখন জলে থৈ-থৈ। দূর থেকে ছোট ছোট টিলাগুলো দ্বীপ বলে মনে হয়।

বিপ্রপদ যেন কোন সাগরের মধ্যে এসে বাসা বেঁধে আছেন। এ সাগরে কত রত্ন! একদিন এর জল শুকিয়ে যাবে। রত্নগুলো ফসলের রূপ পরিগ্রহ করবে। সোনালী ফসল। যার জন্য তিনি এই বিলে এসেছেন। আহরণ করে নিয়ে যাবেন দেশে। দিয়ে-থুয়ে বেচে-বিলিয়ে খাবেন। অভিযাত্রীদের লুপ্ত গৌরব আবার ফিরে আসবে, কমল-কামিনীর দূর হবে ত্রাস। আজ তাঁকে মূর্খ বলে যারা একধারে ঠেলে রেখেছে, তারাই আবার নেবে পায়ের ধুলো। চমৎকার পরিবর্তন! বিপ্রপদ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন।

এখন সময় সময় কড়া রোদ ওঠে—ভাদ্রের রদ্দুর।

আবার সময় সময় নামে ইলসেগুড়ি।···

রেণু-রেণু জল ঝরতে থাকে চারদিকে। মাঝে মাঝে রামধনু দেখা দেয় মুক্ত দিগন্তে। আলো-জলের এ আলপনা দেখে মালা বিভোর হয়ে চেয়ে থাকে। প্রকৃতি তার কত রঙের শাড়ী বদলাচ্ছে দক্ষিণের বিলে!

এত টানাটানির মধ্যেও বিপ্রপদ সুতো কিনে ক'খানা ইলিস মাছের নতুন জাল বুনেছেন। জলের ভিতর প্রায়ই কৃষাণেরা বসে থাকে। এত দিন নতুন আবাদি জমিগুলো রুয়েছে। এখন ফসল না পাকা পর্যন্ত বিশেষ কোনও কাজ নেই। বিপ্রপদ কৃষাণদের বলেন মাছ ধরে আনতে। নিকটেই একটা নদীতে আজকাল নাকি প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ইয়া বড় বড় ইলিস। চওড়া চওড়া গড়ন! কত তেল তার গায়! জাল নিয়ে কৃষাণেরা সন্তুষ্ট হয়ে ডোঙা নৌকায় ছোটে। পাল্লা দিয়ে বেয়ে যায়। খালের জল একেবারে ওথল-পাথল করে ছাড়ে। বিপ্রপদ ভাবেন: যথেষ্ট মাছ ধরতে পারলে চালের খরচ নিশ্চয় একটু কমবে। মাছ পেলে আর ভাত বেশী খাবে না।···কিন্তু ফল হয় উল্টো। ওরা এক-একজন

এক-একটা খুদে রাক্ষস। পরিমাণে যত মাছ বাড়ে ততই বেশী লাগে চাল।

বিপ্রপদ অসন্তুষ্ট হন···কিন্তু পর-মুহূর্তেই ভাবেন: ওরা পেট ভরেও যদি না খায় কেন মরতে এসেছে এই দক্ষিণের বিলে? খাক— খাবেই তো!

একদিন রাত্রে বিপ্রপদও গোপনে যান ওদের সংগে। ছোটবেলা তিনি অনেক গেছেন মাছ ধরতে। এ বিষয় তাঁর সখ ছিল উগ্র। এখন বয়স হয়েছে, মান-মর্য্যাদাও একটা আছে, দূরের লোকে দেখলে ভাববে কি—তাই রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে যান।

আকাশে একটু একটু মেঘ আছে, মধ্যে মধ্যে জলও পড়ছে। তিনি ডোঙা নায়ের গলুইতে বসে জাল ছাড়েন। পঞ্চাশ, ষাট, আশী হাত জলের নীচে গিয়ে জাল মাটিতে ঠেকল। এখন হাত দু'যেক ওপরে জাল তুলে—দু'হাতে দু'টো দড়ি ধরে বসে রইলেন। চার দিকে কালিন্দীর মেঘ, নীচে অথৈ কালো জল—ভাঁটার টানে তর-তর করে নৌকা ছুটে চলেছে। কোনও দিকে কিছু দেখা যায় না। একূল ওকূল দুকূলই যেন আঁধারে চুপ করে বসে আছে দু'টো বুড়ো ব্রহ্মদৈত্যের মত। নদীর জলে কেউ পড়লে তখনই তারা দু'পাড় দিয়ে বুঝি হাত বাড়িয়ে দেবে। অতটুকু ছোট নৌকা—যদি কিছুর সংগে ধাক্কা খায়! মাঝে মাঝে জলের যে পাক, নৌকাখানা কেঁপে ওঠে। কিন্তু ভরসা ঐ জালের দড়ি। হাতে থাকতে নৌকা সহজে মরে না। হঠাৎ একটা মাছে ঢুঁ মারে। বিপ্রপদ চমকে উঠে দড়ি টেনে জালের মুখ বন্ধ করেন। যেন দড়ির তারে টেলিগ্রাম এসেছে। যে রকম চাপা-ঢুঁ তাতে মাছটা বড় বলেই বোধ হয়। জাল তুলে বিপ্রপদ বাস্তবিকই খুসী হন। একটা নয়—এক জোড়াই মাছ উঠেছে। আবার তাড়াতাড়ি জাল ফেলেন।

শেষ রাত্রে দশটা ইলিস নিয়ে বাসায় ফেরেন বিপ্রপদ।

এমনি ভাবেই কয়েকটা রাত কাটে। মালা সংবাদ জানায়—চাল বাড়ন্ত। স্ত্রীলোকে এ সব বিষয় একটু বেশী হুঁসিয়ার তাই তার কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারেন না বিপ্রপদ। নেই বললেও নিশ্চয় কিছু মজুত আছে। তা আগে ফুরাক তারপর দেখা যাবে। আর ধান পাকৃতেও ত বেশী বিলম্ব নেই।

কৃষাণদের ঘরেরও চাল ফুরিয়েছে।···

অভাবের কথাটা তারাও কেমন করে যেন জেনেছে তাই মালার কাছে চালের জন্য জোর তাগাদা দেয়। পারলে দু'-এক সের বেশী চেয়ে নিয়ে মজুত করে রাখে নিজেদের ভাণ্ডে। মালা ক্রমে শক্ত হয়। শক্ত হয়েও ওদের বায়না এড়াতে পারে না। ওরা কাজের মানুষ। নিজের গুপ্ত ভাণ্ডারও খালি করে ওদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়।

শেষ শস্যকণাও এমনি করে ফুরিয়ে যেতে থাকে।

বিপ্রপদ ও নিতাইর খোরাকীটা ঠিক রেখে মালা কম খেতে স্বরু করে।

এবারের গরু মোষগুলোর ওপর বিপ্রপদর বড় বেশী মায়া জন্মেছে। কৃষাণেরা যথেষ্ট যত্ন করলেও তিনি দিনের ভিতর তিন চার বার খোঁজ না নিয়ে থাকতে পারেন না। এখন আর ওরা মাঠে চরতে পারে না—জলের ভিতর যাবে কোথায়? যদি ছাড়া পায় তবে রোয়া ধান খেয়ে ফেলবে। তাই গোয়ালেই বাঁধা থাকে। বিপ্রপদর শেষ কপর্দকটাও ফুরাল কেন? ওদের জন্য প্রচুর খড় কিনেছেন চড়া দামে। ওরা সৈনিক। শুধু সৈনিক নয়, মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিক। ওরাই তো সবাইর ধ্বংসোন্মুখ গৌরব ফিরিয়ে আনল দক্ষিণের বিলে জলে-কাদায় আবক্ষ ডুবিয়ে যুদ্ধ করে। নিজেরা কষ্ট করেও ওদের রসদ জুগিয়ে যেতে হবে—প্রস্তুত রাখতে হবে আগামী অভিযানের জন্য।

কোন কাজ না থাকলেও তিনি গোয়ালের সুমুখে গিয়ে এই শ্রেণী-বদ্ধ জীবগুলোর দিকে চেয়ে থাকেন—ওদের গায় অকারণে হাত বুলিয়েও আনন্দ অনুভব করেন। ওরাও সুখস্পর্শে বিভোর হয়ে কখনও গলা বাড়িয়ে দেয়, কখনও বা চুপ করে থাকে চোখ বুঁজে।

'নিতাই আর তো চাল না কিনে উপায় নেই—কৃষাণদেরও আবার নাকি খোরাকী ফুরিয়েছে। ত্রাসের চোটে ওরা যেন বেশী বেশী খাচ্ছে।'

'আমি কালও জমিতে নেমে পরখ করে দেখেছি, ফসল পুষ্ট হতে এখনও কিছু দেরী আছে। সদরেও একবার যাওয়া দরকার—সবই টাকার কাজ।'

'আমার হাতে যে একটিও পয়সা নেই তা তো তুমি জানো—এখন অন্নের জন্য সব নষ্ট হবে?'

'একটা কাজ করলে এবারের ধাক্কা এক রকম সামলান যায়।'

'কি কাজ?'

ঐ ভরন্ত মোষজোড়া বেচে দিলে সব দিক রক্ষা হয়।'

'ও কথা না বলে তুমি আমার মাথায় একটা বাড়ি দাও।' হঠাৎ বিপ্রপদ রুষ্ট হয়ে ওঠেন, 'তুমি বেচবে মোষ, তোমার মা-ঠাকরুণ বেচলেন নাট-মন্দির! দু'জনে যেন পরামর্শ করে আমাকে ডোবাতে বসেছ। জীবনে তো কিছু জুড়ে-গেঁথে দেখনি।'

'তা হলে কি করব বাবু? আমি তো হদ্দ চেষ্টা করেও…'

'চাল জোটাতে পারনি! ভরন্ত মোষ বেচতে চাইছ কেন? দু'টোর জায়গায় চারটা খোঁয়ালে বুঝি সুখী হও বেশী?'

'না, না, তা নয় বাবু, তা নয়। বিয়োবার সময় ওদেরও তো আশংকা আছে—তাই ওদের বেচে—'

'এর পর বেচবে কি? আমাকে? তোমার যা খুশী তাই করো,

আমি তোমার সংসর্গ ত্যাগ করি।' বলে বিপ্রপদ মনের দুঃখ জানাতে না কি করতে যেন মোবারকের বাসার দিকে রওনা হন।

নিতাই দাঁড়িয়ে থাকে—তারপর তামাক সাজতে বসে।

মালা সুমুখে এসে নিতাই বলে, 'শুনলে তো মা-ঠাকরুণ—শুনলে তো সব। বাবুর পিছনে যে হাঁটে তার চোদ্দ-পুরুষ গাধা। আমি দোষী, আমার মা-ঠাকরুণ দোষী—দু'দিন যাক তোমাকেও রেহাই দেবেন না, উনি এমনি লোক। যা করলাম সব গেল জলে।' সে বসে বসে তামাক টানতে থাকে।

'এক কাজ করো সরদার—আমার এই হারছড়া নিয়ে আপাতত সব গোল মিটিয়ে ফেলো। হয় বন্ধক, নয় বিক্রি—যাতে কুলায় তাই করে সব দিক বজায় রাখো। ওঁকে এখন কিছু বলে লাভ নেই—উনি ঘোলায় পড়ে কি ঘুর-পাকটাই না খাচ্ছেন! ওঁর অবস্থায় পড়লে আমাদের মত লোকের খোঁজ পাওয়া যেত না।'

'সে কথা আমিও যে না বুঝি তা নয়—তাইতো কক্ষণও কিছু বলি নে বাবুকে। কিন্তু মা-ঠাকরুণ তুমি নিঃসম্বল রাঁধুনী মানুষ—এ তুমি বলছ কি? শেষ সম্বলটুকু খুইয়ে কি আমাদের জন্য পথে দাঁড়াবে?'

'সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না—এখন হালুটির ভাবনাই প্রধান।'

'বাবু শুনলে বলবেন কি? এমনিতেই তো আমার ওপর খাপ্পা।'

'আমিও জানাব না, তুমিও বলো না—পুরুষ মানুষের কানে সব সময় কি সব কথা তুলতে হয়? আবার ফসল উঠলে তুমি আমাকে বন্ধক রাখলে ছাড়িয়ে দিও, বিক্রি করলে গড়িয়ে দিও, কেমন সরদার?

এ প্রস্তাবটা মন্দ নয়। নিতাই হারছড়া নিয়ে রওনা দেওয়ার উদ্যোগ করে।

'একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো—বুঝলে, এ বেলা একেবারেই কিন্তু—'

'তা কাল রাত্রেই টের পেয়েছি। ক'দিন ধরে তুমিও যে কম খাচ্ছো তা কি আমার চোখ এড়ায়? বাবুরও পেট ভরেনি, তাই রাত্রে চোখ বুজতে পারেননি। শত হলেও তো সুখী মানুষ!'

'কিছুক্ষণ বাদে বিপ্রপদ এসে বলেন, 'মালা, সব শুনে মোবারকটা একটু নাকও টানল না। আমি আর কোনও দিন ওর বাসায় যাইনি, একটু বসতে পর্যন্ত বলল না—এমন বেইমান।'

শেষের কথা ক'টি একেবারে নিছক মিথ্যা। মোবারক ও আসমানতারা চাল না দিতে পারে, কিন্তু বাবুকে যে উপেক্ষা করে মৌখিক আপ্যায়নটুকু পর্যন্ত করেনি তা মালাও বিশ্বাস করতে চায় না। 'কি জানি, ওদের ব্যবহারে তো কোনও দিন তেমন কিছু মন্দ দেখিনি। হয়ত ওদেরও কোন্ না আমাদের মতই অবস্থা!'

'তুমি এ দেশের লোকের খবর রাখো না। নিজের বুঝ ষোল আনা ঠিক না রেখে ওরা কোনও কাজ করে না।'

বিপ্রপদ এক গ্লাস জল খেয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে একটা ভিজা গামছা পেটে বাঁধেন। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়েন।

'ও কি বাবুজী?'

'দু'দিন ধরে পেটটা বড্ড চিন্-চিন্ করছে।'

মালা আর প্রশ্ন না করে বাইরে বেরিয়ে আসে। সে ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে নিতাইর ফেরার পথের দিকে চেয়ে থাকে। কখন সে ফিরবে, কখন মালা দিতে পারবে দু'টি ভাত রেঁধে বাবুজীকে!

বিপ্রপদ আবার জল চান।

মালা জল দেবে কি তার চোখের জলেই পাত্রটা পূর্ণ হয়ে উঠতে চায়।

কৃষাণেরা রান্নার চাল চাইতে আসে। বেলা নেহাৎ কম হয়নি।

তাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে মালা। কিন্তু তারা আর

কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? আজ নাকি তারা দেরী করেই এসেছে। এ রকম হলে তারা কাজ করবে কি করে? ভাতটাও যদি তারা সময় মত না পায়! মাছ মাংস তরি-তরকারী নিয়ম মত তারা কিছু পায় না, চায়ও না—শুধু ভাত। একটা বিদ্রোহের সুর সমবেত কণ্ঠে বেজে ওঠে।

মালা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তারও তো শরীর ক্লান্ত।

জল-কাদা ভাঙতে ভাঙতে তখন আসমানতারাকে আসতে দেখা যায়। মাথায় তার একটা বোঝাই ডালা, কোলে সেই ছেলেটা। ভাদ্রের রোদে ছেলেটা একেবারে গলে যাওয়ার জোগাড়।

মালা এগিয়ে যায়। 'তুই যে আসবি তা আমি আগেই বুঝেছি, কিন্তু এত দেরি করে এলি কেন?'

'ধরো, ধরো মা-ঠাকরুণ, ধরো আগে—তার পর বলি সব।'

'কি ধরব? ডালাটা না ছেলেটা—কোন্‌টা?'

'যেটা খুশী ধরো।'

মালা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঘরে যায়—বুকে জড়িয়ে ধরে ইচ্ছা মত চুমো খায়। ছেলেটা হাসে। চেনে না মালাকে তবু হেসে কুটি-কুটি হয়।

আসমানতারা ডালাটা নামিয়েই ধপ করে দোর-গোড়ায় বসে পড়ে। 'ঘরে ছিল না মা, চেয়ে-চিন্তে ধার করে আনতে দেরী হয়ে গেল। কই, ছেলেটাকে দিয়ে তুমি এখন নিজের কাজে যাও। হ্যাঁ মা, বাবু বুঝি খুব রাগ করেছেন? তিনি হয়ত জানেন না—এবার আমাদের ওপর দিয়েও কম বিপদ যায়নি। আমরাও ক' বছরে যে এ ধাক্কা সামলাতে পারি তা খোদা জানেন।'

মালা তাড়াতাড়ি কৃষাণদের বিদায় করে। 'তোমরা সবটাতেই অস্থির হয়ে পড়ো। এখন পেলে তো—যাও। এত বড় একটা হালুটি

যিনি চালাচ্ছেন তিনি আর তোমাদের না খাইয়ে খাটাতেন না। একটুকুতেই এত অধীর হও তোমরা।'

কৃষাণেরা লজ্জিত হয়। তবু এক জন জবাব দেয় যে, এ ক্ষেত্রে যাই হক অন্যত্র অনেক তারা ঘা খেয়েছে—তাই মনে তাদের এত আশংকা।

আসমান তারা চাপা-গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'বাবু কোথায় ?'

'শুয়ে রয়েছেন।'

'কেন ?'

'পেটে একটা ব্যথা বোধ করছেন।'

'মা-ঠাকরুণ, তুমি দু'টো দিন আগে আমাকে খবর দিলে পারতে। ও তো খালি পেটের ব্যথা, আমার আর জানতে বাকী নেই। হাজার হলেও বাবুর ওপর তোমার নজর নেই—থাকলে এ দশা ঘটত না। প্রতিবেশী গরীব হলেও আপদে-বিপদে তাকে একটু খবর করতে হয়।'

মালা ভাত চড়াতে চড়াতে হাসে—নিজের দোষটা ঢাকতে চায়। কিন্তু হৃদয়ে একটা প্রচ্ছন্ন হিংসা জন্মে।

আসমানতারা তা বুঝতে পারে না—আরও দু'-একটা তিরস্কার করে চলে যায়।

পথ চলতে চলতে সে ভাবে: শুধু বাবুর ওপর দিয়ে ধকলি ক যায়নি, মা-ঠাকরুণের মুখখানাও শুকনা। সে আনমনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

ষোল

অবশেষে আউশ ধান কাটার দিন স্থির হয়। কাস্তেগুলি শাণিয়ে এনেছে নিতাই। কাল ভোর বেলাযই সুরু হবে ধান কাটা। ধান খুব ভালই হয়েছে। দেখলে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়। মনে জাগে নতুন একটা উন্মাদনা। বিপ্রপদ বার-বার গিয়ে জমিগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে অনুমান

করতে চেষ্টা করেন বিঘা-প্রতি কত কাঠি ফসল ফলেছে। এ বিষয়ে তাঁর তেমন অভিজ্ঞতা নেই, তাই তিনি নিতাইকে প্রশ্ন করেন। সে উত্তর দেয়, পূর্বাহ্নে ও সব করলে লক্ষ্মীদেবী নাকি অসন্তুষ্ট হবেন। শুনে বিপ্রপদ নিরস্ত হন বটে, কিন্তু তার কাছে আজকার দিন ও রাতটা একটা সুদীর্ঘ বছর বলে মনে হয়। দিন যদিও বা কাটে, রাতটা মোটেই কাটতে চায় না।

মালা একটু একটু সবই বুঝতে পারে, তাই বাবুর রকম-সকম দেখে মনে মনে হাসে। বুড়ো মানুষ শেষটায় যেন ছেলে মানুষ হয়েছেন।

অবশ্য বিপ্রপদ জানতেন না—

সন্ধ্যা বেলাই গুজবটা শোনা গিয়েছিল,—এন্তেজদ্দি নাকি অজস্র লেঠেল নিয়ে এসেছে বিলে চড়াও হয়ে ধান কাটতে। ধানের সংগে যদি দু'-দশটা মাথা কাটা যায় তবু সে এ যাত্রা ফিরবে না। কথাটা কত দূর সত্য তাই পরীক্ষা করে দেখে আসতে চায় ইমাম ও জেল-খালাস তিন ভাই। গভীর রাত্রে শত্রুর ঘাঁটি ঠিক করে আসা ভাল—জেনে আসা ভাল তারা কখন কোন দিক দিয়ে আক্রমণ করবে। হয়ত এ সব একান্তই মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু যদি সত্য হয়—বাস্তবিকই এন্তেজদ্দি অমনি সাজ-সজ্জা করে এসে থাকে, তবে এ-পক্ষের যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে। এরা এখন জনবলে হীন, মনের বলও এদের ঢের কমেছে।

তাই বাবুর কাছে গভীর রাত্রে হুকুম নিয়ে চলে যায় ওরা চারজন।

হুকুম দিয়ে বিপ্রপদ আর ঘরের মধ্যে স্থির থাকতে পারেন না। বাইরে বেরিয়ে পায়চারি করতে থাকেন। মন চিন্তায় আকুল হয়ে ওঠে। এ-পক্ষের লোক যেমন গেল ও-পক্ষের লোকও তো আড়ি পেতে থাকতে পারে। যদি উভয় পক্ষের দেখা হয়ে যায় তখন কি কাণ্ডই না হবে!

তিনি চোখ বোঁজেন।···মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন: এ সব গুজব। ওরা নিশ্চয় সেই সংবাদ নিয়েই ফিরে আসবে।

অনেকক্ষণ পায়চারি করে বিপ্রপদ এসে শয্যা গ্রহণ করেন, কিন্তু চোখ জ্বলে, মাথা ঘোরে, ঘুম আসে না।

শেষ রাত্রে ইমাম ফিরে এসে খবর জানায়: সংবাদ সত্য এবং তারা একটা নাকি প্রত্যক্ষ প্রমাণও এনেছে।

'কি প্রমাণ?' বিপ্রপদ লাফিয়ে ওঠেন। তিনি দ্রুত একটা দিয়াশলাইর কাঠি জ্বালিয়ে দেখেন যে এস্তেজদ্দির সদ্য-কাটা মাথাটা ইমামের হাতে। জলন্ত কাঠিটা তিনি ফেলে দিয়ে যেমন উঠেছিলেন তেমনি আবার বিছানায় শুয়ে পড়েন। 'এখান থেকে নিয়ে যাও ওটাকে। নিয়ে যাও আমার সুমুখ থেকে।'

জেল-খালাস তিন ভাই একটু একটু হাসতে থাকে।

পরের দিন একটা পুলিশের উৎপাত আরম্ভ হয়। প্রায় সাত দিন পর্যন্ত তারা দক্ষিণের বিলটা ওলট-পালট করে ছাড়ে। আসামী ধরার অজুহাতে তারা হাঁস মুরগী ছাগল যা যেখানে পায় তাই ধরে নিয়ে আসে এবং জবাই দিয়ে খেয়ে সদ্য সদ্য একটা অত্যাচারের বিভীষিকা ছড়িয়ে দেয়। বিলের বাসিন্দারা একেবারে সংকিত হয়ে ওঠে। জজের বিচারে যদিও বা কেউ খালাস পায়, কিন্তু পুলিশের বিচারে খালাস নেই। আশ্চর্য ইংরাজের মহিমা! মাথা নীচু করে তাদের চেলা-চামুণ্ডাদের অত্যাচার সকলে সহ্য করে।

প্রমাণাভাবে আসল আসামীরা ধরা পড়ে না। তারা মুখ টিপে-টিপে হাসে এবং মজুরদের সংগে মিলে মিশে ধান কাটে। মনের আশংকা মুখে তাদের প্রতিফলিত হয় না। তারা সব ঝানু লোক কি না!

পুলিশ-বাহিনীর কর্তা হয়ে এসেছেন এক জন নতুন মুসলমান দারোগা। তিনি বিপ্রপদর কাছে দু'চারটা কথা জিজ্ঞাসা করে বুঝতে

পারেন এ-সব বিলকুল বাজে কেস্। কারণ পয়সার গন্ধ নেই তেমন। হ্যাঁ, হতো একটা ডাকাতি কি রাহাজানি, তিনি আস্কারা না করে সরেজমিন্ ত্যাগ করতেন না। এঁ সব বাজে মামলার ফাইনাল রিপোর্টই হওয়া ভাল।

বিপ্রপদ বলেন, 'এ ছাড়া আর উপায় কি? এতগুলো লোক নৌকায় থাকতে একটা লোকের মাথা কেটে আনল—অথচ প্রমাণ দিতে পারছে না একটাও। যত বেকুফ!' বিপ্রপদর হাঁস মুরগী ছাগল নেই, তিনি কিছু নগদ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দারোগা সাহেবকে বিদায় করেন।

কিন্তু ফাইনাল রিপোর্ট সদরে না যাওয়া পযন্ত বিপ্রপদ সুস্থ হতে পারেন না। রোজই গোপনে গোপনে থানায় লোক পাঠান।

এক দিকে আউশ ধান কেটে পালা দেওয়া হচ্ছে, অন্য দিকে সেই জমিতে হাল চলছে এবং হাল দিয়ে সংগে সংগে রুয়ে দেওয়া হচ্ছে আমনের বীজ—একেবারে রক্ত বমি করে খাটছে কৃষাণেরা, জন-মজুর, বিলের প্রজারা। এদের ফাই-ফরমাস জোগান দিতে মালা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এক এক সময় তার শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এই মাত্র যে তামাক চাইতে এলো, একটু পরেই সে আবার আসে দা চাইতে—পরমুহূর্তে খন্তা—একবারে সব চেয়ে নেবে না, এমন বিশৃঙ্খল কাজ। কম খেয়ে, উদ্বেগ-দুশ্চিন্তায় মালা ভিতরে ভিতরে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল—এবার তার শরীরটা ভেঙে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। কেমন যেন সে একটা ব্যথা অনুভব করে পেটে।

বিপ্রপদও সময় পান না একটুও। তাঁর মত আরো দু'এক জন থাকলেও সময় পেত না—কাজের এলোমেলো পাকে জড়িয়ে যেত। মালার দিকে কে চাইবে? অবসন্ন শরীরের ওপরও কেবল হুকুম চলতে থাকে—হুকুমের ওপর হুকুম।

ম'লে এবং ঝেড়ে যে ধান পাওয়া যায় তা কল্পনাতীত। ফসলের সাফল্য শুধু চাষে নয়, নিয়মিত আবহাওয়ায়ও বটে। এবার তা পরিপূর্ণ ভাবেই পাওয়া গেছে। যেমন রোদ তেমনি জল—কোনটারই অভাব হয়নি। তাই পোকা মাকড়ও তেমন জন্মায়নি, ক্ষতি করতে পারেনি শস্যের। বিলের সবাই তা বোঝে না, নিজেদের ভাগ্যকে তারিফ করতে থাকে। বিধাতা এত দিনে এত ক্লেশের উপযুক্ত পারিশ্রমিকই দিয়েছেন।

এখন একে একে কৃষাণেরা বিদায় হয়—জেল-খালাস তিন ভাই যায় পরিবার আনতে। ইমামও দেশে যাবে। শুধু বিপ্রপদ মালা ও নিতাই থাকবে বিলে। ওরা ফিরলে এরা আবার যাবে দেশে। এদের যাওয়ায় অনেক ঝঞ্ঝাট। ধান-পান নিতে হবে। জন-মজুর, বড় কাঠামি নৌকা চাই।

ধানের স্তূপটা দেখে মালার প্রথম প্রথম কত আনন্দ হয়েছে। কিন্তু এখন ভয় হয় ওটা ভেঙে শুকিয়ে একা একা ঘরে তুলতে। বাইরে থেকে কেউ না বুঝলেও ভিতর থেকে যে তার শক্তির উৎস ভেঙে পড়ছে ঐ ব্যথাটার তাড়নায়। থাকত কেউ মেয়েমানুষ, যদি বুঝত সে দরদ দিয়ে —তাহলে মালা একটু বুকে বল পেত। মালা যে একা! তাই বড় ফাঁকা লাগে তার বুকটা।

বিপ্রপদর কাছে লজ্জায় মালা কিছু বলতে পারে না। বিপ্রপদও কিছু বোঝেন না, একটু অবসরও পান না কোনও দিকে দৃষ্টি দিতে। বিলে লোকের অভাব। সারা দিনটা কাটে মোষ-বলদের পিছে। নিতাইকে সাহায্য না করলে ও একা পারবে কেন এতগুলো পশু রক্ষণাবেক্ষণ করতে? তার পর যখন একটু সময় পান তখন ঘর-সংসারের কথা ভাল লাগে না—ওরা তো ভালই আছে—ভাল লাগে উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে চেয়ে বসে থাকতে। জলের পটভূমিতে

দাঁড়িয়ে অজস্র সবুজ ধান্যের গুচ্ছ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছে। 'ওরা বড় হবে—আরও সবুজ হবে ওদেব দেহের সুষমা। আজকার সবুজ আশা এক দিন নাকি পূর্ণ হবে সোনালী ফসলে, সে এক শীতের রৌদ্র-দীপ্ত দ্বিপ্রহরে; মা যেমন করে ক্রীড়ারত সন্তানের দিকে চেয়ে থাকে অনিমিষে, তেমনি করে ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে বিপ্রপদ মনে মনে কত কি যে ভাঙেন গড়েন একা একা!

এক দিন একখানা এক বৈঠার ডিঙি এসে বিপ্রপদর ঘাটে ভেড়ে।

নৌকা থেকে সামান্য অবগুণ্ঠন টেনে যিনি কূলে এসে পা দেন তাঁকে দেখে বিপ্রপদ থতমত খেয়ে যান, নিতাই আশ্চর্য হয়ে পায়ের ধূলো নিতে ছোটে, মালা আউশ ধানের ডালাটা নিয়ে হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ে ঘরে একটা লাঙলের ভাঙা 'ইষের' ওপর।

কমলকামিনী কোনও দিকে দৃকপাত না করে সোজা গিয়ে বিপ্রপদর ঘরে ওঠেন। সেবাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতেই সে গিয়ে পিতার হাত ধরে। কমলকামিনী বিপ্রপদকে প্রণাম করেন।

কিন্তু বিপ্রপদ আশীর্বাদ করার কথাটা পর্যন্ত ভুলে যান—যেন তাঁর সকল সাহস নিঃশেষ হয়ে গেছে। তিনি চাইতে পারেন না চোখ তুলে।

চাঁদ উঠলে জোনাকী যেমন নিষ্প্রভ হয়ে যায়, এত বড় রূপসী মালাও তেমনি ম্লান হয়ে যায়। কমলকামিনীর সংগে দৃষ্টি-বিনিময় হতেই মালার কেন জানি মাথা নুয়ে পড়ে।

কেউ কিছু বলছে না দেখে কমলকামিনীই বলেন, 'সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও—নৌকা থেকে জিনিষ-পত্তরগুলো তোলার বন্দোবস্ত করো গে। সেবাটা অনেকক্ষণ কিছু খায়নি, ওর জন্য কি করবে দেখো। সংগে শ্যামাচরণ এসেছে, সে-ও কাল থেকে উপোষী।'

একটা হুকুমে সকলের অস্বস্তি কেটে যায়—প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে।

মালা সেবাকে নিয়ে যে ভাত একটু আগেই রান্না হয়েছিল তাই খেতে দেয়, এবং সংগে সংগে আবার হাঁড়িটা উনুনে চড়িয়ে দেয়। শ্যামাচরণ স্নান সেরেই নৌকা থেকে ওঠে। কোন প্রকারে চারটি মুখে দিয়ে নিরালায় কৃষকদের এক বাসায় বিশ্রাম করতে যায়।

বেলা দুপুর হয়েছে। বিপ্রপদও স্নান করে আসেন, কিন্তু খেতে যাওয়ার সময ইতস্তত করতে থাকেন।

কমলকামিনী পূর্বেই স্নান করে এসেছিলেন, বলেন, 'ও কি ?'

'তুমি—'

'আমাকে কবে আগে খেতে দেখেছ ? আচ্ছা চলো, আমিও যাচ্ছি। বলে তিনি অনুজ্জ্বল সিন্দুরের ফোঁটাটা উজ্জ্বলতর করে বিপ্রপদর সংগে সংগে রান্না-ঘরে যান। নিজের হাতে পরিপাটি করে ভাত বাড়েন। বিপ্রপদ আসনে বসলে তিনি ভাতের থালাটা সুমুখে এগিয়ে দেন।

'বিলে যে তুমি আসবে তা ধারণাই করতে পারিনি।'

'তুমি কোনও দিন কিছু যা ধারণা করতে পার না, তা কিন্তু ঘটে। তুমি কি বলে এসেছিলে তা কি মনে আছে ?'

'দেখো তো কাজের চাপে পড়ে ওদিকে তেমন মন দিতে পারিনি।'

'আমি না এলে এক বছরেও যে তা পারতে না, তা বুঝেই নিজে এসেছি।'

'না, না, তা নয়—তা নয়। আমাকে পারতেই হতো। মালা তো যাওয়ার জন্য পাগল। আমিই নৌকা...'

'এ সব কৈফিয়ৎ আমি ঢের শুনেছি, তোমার মুখ দিয়ে তো চিরদিনই শুনে এলাম—আমি এই নৌকায়ই ফিরে যাব, তোমার মালাকেও

বলে রাখলাম—জোগাড় হয়ে থাকে যেন।' বলে কমলকামিনী মালার দিকে একবার আড় চোখে তাকান।

মালা অশরীরী আত্মার মত, চুপ করে থাকে। নীরবে লক্ষ্য করে এই মহীয়সী রমণীর প্রতিভা।

'তুমি চুপ করে কি শুনছ? যাও, স্নান করে এসো, ওঁর তো খাওয়া হয়ে গেল—আমি আর কতক্ষণ বসে থাকব তোমার জন্য?'

'না, আপনি বসে থাকবেন কেন? আপনাকে দিয়ে, তার পর আমি—'

'যা বলছেন তাই শোনো মালা।'

মালা আর প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না—উঠে স্নান করতে চলে যায়।

কিছুক্ষণ বাদে কমলকামিনী বলেন, 'তুমি কি করছ তা যদি বুঝতে—আমার সন্দেহ হয়...'

'কি সন্দেহ?' বিপ্রপদর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তিনি হাত তুলে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি সন্দেহ হয় তোমার বড়বৌ?'

'মেয়েটা পোয়াতি।'

বিপ্রপদর সমস্ত দেহের রক্ত যেন হৃৎপিণ্ডে ঠেলে ওঠে। মাথাটা ঘুরে যেতে চায়। তিনি প্রতিবাদ করেন, 'মিথ্যা কথা।'

'আমিও বলি, তাই হোক। মেয়েটা দেখতে সুন্দরী, কাজ-কর্মে পটু, তোমার মত একটা লোক যে ওর সর্বনাশ করতে পারে—এ কথা ভাবতেও পারি নে। যা-ই বলো, ওর জন্য বড় দুঃখ হয়, কি করে জীবনটা কাটাবে?'

'আমি ওর সর্বনাশ করিনি।'

'তবে কে করল? এসব ঘটল কি করে?'

'একটা সামান্য ঘটনাকে, সাময়িক একটা পরিস্থিতিকে সর্বনাশ বলে

গুরুতর করে তোলার কোনও অর্থ হয় না। ওর যারা সত্যিকার সর্বনাশ করেছে তারা আজ বর্ণচোরা—যাক, সে সব আলোচনা তোমার সংগে করে লাভ নেই—তুমি বুঝবে না।'

'এখন কি করে ওর জীবনটা কাটবে?'

'ও শুধু তো জীবন ধারণের অধিকারী। জীবন কি করে কাটাবে তার অধিকার তো ওর হাতে কোনও দিনই নেই। সে ব্যবস্থা তোমরাই করে দেবে—তুমি, বড়বাবু, রমণী ঘোষাল। আমি তো আসামী।'

'বড়বাবু, রমণী ঘোষালের তো আমাদের সংসারের জন্য বড় মাথা-ব্যথা—তুমি এখন আর পাগলের মত আবোল-তাবোল বকো না। কিন্তু ওকে এখন আমি দেশে নিয়ে যাই কি করে? গড়াতে গড়াতে যে এতদূর গড়িয়েছে, তা কি আমিও বুঝতে পেরেছি! এখন আর চুপ করে দাঁড়িয়ে না থেকে চিন্তা করে দেখো, সত্যি হলে কি করবে! এখানে হাতুড়ে ওঝা-বদ্যি নেই?'

'মেয়েটাকে কি তুমি মারতে চাও?'

'মরে যদি মরুক। এখানে মরলে ও মুক্তি পাবে, তুমিও নিশ্চিন্ত হবে। দেশে নিয়ে গেলে কি যে কেলেংকারী হবে তা ভাবাই যায় না।'

'তোমাকে কি যে বলব বুঝতেই পারছি নে!'

'দোষ করে কে, আর মন্দ শোনে কে! এই তো জগতের রীতি!'

'আমি কি দোষ করলাম বড়বৌ? সেদিন তো তোমাকে সব খুলেই বলেছি। যা এড়ান যায়নি—'

'বেশ বেশ, আর তর্ক করো না। কেলেংকারী করলেও তুমি, আবার গলাবাজী তোমারই বেশী। একটা গল্প মনে পড়ছে—থাক এখন সে সব কথা। তুমি এখন যাও, ও এসে পড়ল বলে।'

মালা এসে খেতে বসে, কিন্তু কেন জানি খেতে পারে না। সে

কেবলই মোচড়াতে থাকে। ব্যথায় তাকে অবশ করে আনছে। সর্বাংগ বেয়ে ঘাম ঝরতে থাকে, যেন কাল-ঘাম। সে বুঝি বাঁচবে না।

সন্ধ্যা না হতেই ও একেবারে নেতিয়ে পড়ে। তবু মুখ ফুটে শব্দ করে না। কমলকামিনীর কাছে পর্যন্ত কিছু বলে না। তার বলার কি-ই বা আছে? পোড়া অদৃষ্টে তার এতও লেখা ছিল। এখন সে নিজের মৃত্যু কামনা করে।

একটু আগেই যে কমলকামিনী মালার মৃত্যু পযন্ত কামনা করতে দ্বিধা বোধ করেননি, তিনিই হঠাৎ তাকে বাঁচাবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। শ্যামাচরণ ও নিতাইকে সন্ধ্যা হতে না হতেই তিনি খাইয়ে এখানে স্থানাভাবের অজুহাত দেখিয়ে অন্যত্র শুতে যেতে বলেন। সেবাকে তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়াতে বিপ্রপদকে নির্দেশ দিয়ে তিনি প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু জোগাড করতে চলে যান।

মালা এখন আর না কঁকিয়ে থাকতে পারে না—সইতে পারে না অসহ্য ব্যথা।

'কি, তোমার মেয়েকে ঘুম পাড়ান হলো?' রান্নাঘর থেকে কমলকামিনী বলেন, 'হয়ে থাকলে এদিকে একবার এসো। বসে থেকো না, কাজ আছে।'

'সেবা ঘুমিয়েছে—এখন কি করব বড়বৌ?'

'বজ্জাৎ মাগীকে একটু চুপ করতে বলো। ও চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করল যে। এখন কেউ এসে পড়লে কি হবে তা কি বোঝ না? কি, কচি খোকার মত দাঁড়িয়ে রইলে যে?'

'তুমি যাও, যা বলার তা বলো গে—আমি পারব না।'

'এখন একেবারে ন্যাকা সাজলেন!' গরম জলের হাঁড়িটা কমলকামিনী নামিয়ে রেখে বলেন, 'এখন কিছুই যেন জানেন না, কিছুই যেন পারেন না। আমি গেলে কিন্তু খালি হাতে যাব না, চুপ করার

ওষুধ নিয়ে যাব—ঐ তো সামনে রয়েছে দেখছ না ?' বলে সম্মার্জনীটা দেখিয়ে দেন।

বেশ একটু উঁচু গলায় কমলকামিনী যা বলেন তা বোধ হয় মালা শুনতে পায়—সে ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকে। দূর থেকে কমলকামিনী মালার এ পরিবর্তন, হঠাৎ এ অমানুষিক ধৈর্যের ক্লেশ হাড়ে-হাড়ে অনুভব করেন—তবু তাঁকে কঠোর হয়েই থাকতে হয়। এ কঠোরতা আজ শুধু মালা ও বিপ্রপদর জন্যই নয়—তার জন্যও প্রয়োজন। তাঁর বনেদী সংসারের গৌরবের জন্যও।

'দাঁড়িয়ে থেকো না। আমি গরম জল নিয়ে আসছি, তুমি খানিকটা ফর্সা ধোয়া নেকড়া পাও কিনা দেখো।'

'আমি তা কোথায় পাবো ?'

'ওর বাক্স খুঁজে দেখো, আছে বৈ কি পুরান কাপড়-চোপড়ের নেকড়া।'

অনেক খুঁজে-পেতে বিপ্রপদ ঘাগরা এবং ওড়নাটাকে পুরান নেকড়া ভেবে নিয়ে আসেন।

কমলকামিনী ইতিমধ্যে গরম হাঁড়িটা নিয়ে উপস্থিত হন।

'কই, তাড়াতাড়ি দাও !' ছিঁড়তে গিয়ে জিনিষ দু'টোর অভিনবত্বের দিকে কমলকামিনীর নজর পড়ে। হঠাৎ তাঁর অন্তরটা আবার ক্রূর হয়ে ওঠে। 'এ সব পরে বুঝি কাছারী-বাড়ীতে নাচ-গান চলত ? নিতাই কি আর মিথ্যা বলার লোক !' তিনি সজোরে ওড়নাটা ছিঁড়ে ফেলেন।

মালা কেঁদে ওঠে। এ তার দৈহিক যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নয়—কে যেন তার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলল। 'মা-র দেওয়া শেষের জিনিষ ওই ঘাগরা আর ওড়নাটা। দিদি, তোমার-পায় পড়ি, আর ছিঁড়ো না। আমার আরও ঢের নতুন-পুরান কাপড় রয়েছে, তুমি একটু খুঁজে দেখো,

বাবুজী জানেন না। দিদি, ওগুলো আর ছিঁড়ো না।’ কথাগুলো এমন করুণ ও অনুনয়ের স্বরে মালা বলে যে কমলকামিনীর মর্মস্থলে পর্যন্ত গিয়ে ঘা মারে।

তিনি লজ্জায় ও ব্যথায় অধীর হয়ে বলে ওঠেন, ‘আমি আর ছিঁড়ব না—সেলাই করে জুড়ে দেব তোর ওড়না। আমি বুঝতে পারিনি বোন, তুই মাপ কর আমাকে।’

এতক্ষণ বাদে মালা দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও একটু সোয়াস্তি বোধ করে।

তার পর সারা রাত জেগে কমলকামিনী যা করেন, তা বোধ হয় মাও মেয়ের জন্য করতে পারে না। অন্তত এ ক্ষেত্রে তো নয়ই।

বিপ্রপদ সেবাকে নিয়ে অন্য ঘরে শুয়ে থাকেন। তাঁর চোখে এতটুকু তন্দ্রা পর্যন্ত আসে না। তিনি নানাবিধ জালায় জ্বলতে থাকেন। কি হলো, কেনই বা ঘটল এ-সব অবাঞ্ছিত ঘটনা? সবই যেন স্বপ্নের মত মনে হতে থাকে তাঁর। মালা যে দুঃসহ জ্বালায় জ্বলছে তার জন্য দায়ী কে? সমাজ বলছে, সংসার বলছে—তুমি, তুমি বিপ্রপদ। তিনি কি করে এড়াবেন? রাতটা যে করে হোক এক ভাবে কাটবে কিন্তু দিনের তীব্র আলোতে তিনি কি করে দেখাবেন মুখ? বিশেষত কমলকামিনীর কাছে। ঐ একটি মাত্র সাক্ষ্যে তাঁর অপরাধের গুরুত্ব আরও যেন কত অপরিসীম হয়ে যাবে। আর তাঁর তো নিষ্কৃতির পথ রইল না।

সত্যই কি তিনি অপরাধী? এ কি অপরাধ, না জোর করে তাঁর স্কন্ধে চাপিয়ে দিচ্ছে সবাই মিলে একটা অপবাদ? ঘটনা মাত্রেই যে অপরাধ নয় এ যুক্তি তাঁর কে শুনবে? কে বুঝবে তাঁর ও মালার মনের কথা? মনে তাঁর একটা তীব্র সংগ্রাম-লিপ্সা জাগে কিন্তু শত্রুপক্ষের দিকে চেয়ে তাঁর প্রাণে একটা করুণার উদ্রেক হয়। ওরা অবুঝ, ওদের ক্ষমা করাই ভাল!

কমলকামিনী যেমন এসেছিলেন, তেমনই দেশে ফিরে গেলেন মালাকে সংগে নিয়ে।

সকলকে বিদায় করে দিয়ে বিপ্রপদর খাঁচা দু'টোর দিকে নজর পড়ে।

ময়নাটা অমনি বলে, 'নমস্তে বাবুজী—সুপ্রভাত!'

টিয়াটা জবাব দেয়, 'সুখী হও মালা।'

বিপ্রপদ বুঝতে পারেন এই জন্যই মালা ওদের সংগে নিয়ে যেতে সাহস পায়নি। বলতেও সাহস করেনি কারুকে। বাবুজীকে একবার কাছে ডেকেছিল, কিন্তু কি জানি বলবে বলবে করে বলা হয়নি। সে তার বিলের সংসার ছেড়ে গেছে, কিন্তু তার সবই পড়ে রয়েছে এখানে—যত প্রিয় এবং প্রিয়তম।

ধীরে ধীরে বিপ্রপদ খাঁচা দু'টো খুলে আনেন।···

মুক্ত করে দেন ওদের নীল নভস্তলে। ওরা উড়ে যায়···

ময়নাটা বলে যায়, 'নমস্তে বাবুজী!'

টিয়াটা কি বলে বোঝা যায় না।

সভের

সুযোগ এলে আউশ ধানগুলো দেশে পাঠিয়ে দিয়ে বিপ্রপদ বিলেই পড়ে থাকেন। গ্রীষ্ম গেল, বর্ষাও গেল, শরৎ এলো শীতের অগ্রদূত হয়ে। আকাশের কালো মেঘ পেঁজা ধপ্‌ধপে তুলোর মত কোথায় যেন উড়ে যায়। অন্ধকারের ঢাকনিটা ভেঙে সূর্যের আলো আবার হাসতে থাকে—এ হাসি মুক্তির এবং আনন্দের হাসি। কিন্তু বিপ্রপদর মনটা মেঘমুক্ত হয় না। তিনি কেমন একটা ব্যথা বুকে নিয়ে নিঃসংগই পড়ে থাকেন বিলে। কিন্তু চুপ করে ক'দিন থাকা যায়! তিনি আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েন বলদ ও মোষগুলো নিয়ে। চতুর্গুণ পরিশ্রম করে যত্ন

করেন গর্ভবতী মোস দু'টোকে। বিয়োলে ওরা আরও মূল্যবান হবে—দুধও হবে ওদের অপর্যাপ্ত। আমন ধানের সংগে ওদের দেশে নিয়ে যাবেন বাচ্চা সমেত। হাত ডুবিয়ে ছেলে-মেয়েরা দুধ খাবে—বাছুর দু'টোকে আদর করবে বুকে জড়িয়ে।...এমন বছর যদি দু'-চারটা ভরন্ত গরু-মোষ কেনা যায়, ভালই হয়। গোহাল পূর্ণ হয় অনায়াসে। অথচ চাষের কাজও চলে নির্বিঘ্নে। তিনি প্রতি বছর এমনি দু'টো-চারটা গরু-মোষ বাড়িয়ে চলবেন। বাছুর কিনে বড করবেন পুষে। হয়ত এমন একদিন আসবে যে নিমতলার মধু সর্দারও হিংসা করবে বিপ্রপদর ঐশ্বর্যের কথা শুনে। তবে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের কাজ—প্রয়োজন প্রতীক্ষার।

স্বপ্ন তাঁর দক্ষিণের বিল, সাধনা তাঁর সোনার ফসল—সেবা তিনি করবেন গোজাতির।

ক্রমশ হৃদয় তাঁর শরতের আকাশের মতই মেঘমুক্ত হতে থাকে।...

অবকাশ সময়ে তিনি গোটা কয়েক ছিপ নিয়ে নৌকা চড়ে এমন এক স্থানে গিয়ে চুপ করে মাছের আশায় বসে থাকেন যেখানে এখনও আট দশ হাত জল—ধান জন্মে না মোটেই। শাপলা ফুলের চারদিকে ফলি মাছের চক্ টুপ-টুপ ডুব-ডুব করছে। হয়ত যখন তখন মাছ-রাঙা সাপ তার লিক্-লিকে জিভ বের করে ভেসে ওঠে। হয়ত একদিন এখানেও ফসল ফলবে। তিনি কিম্বা অমরেশ সে ফসল দেখে যেতে পারবে না, ভোগও করে যেতে পারবে না, কিন্তু তার পরের পুরুষে যারা আসবে তারা এ ধান কেটে গোলায় তুলবে, ভোগ করবে পরম সুখে। তাই তিনি এখন জলকরও দিয়ে যাবেন। অনাগতদের জন্য সংরক্ষিত রইল একটা বিপুল সম্ভাবনা।

এন্তেজদ্দি খুন হলো অকালে—সংগে সংগে তার ধান-ভাঙা মামলাটারও অপমৃত্যু ঘটল। ঘোষালেরা তবু নিরস্ত হলো না।

একটা দেওয়ানী মামলা দায়ের করে দিল এন্তেজদ্দির সেই বোকা ছেলেটাকে বাদী খাড়া করে। বিপ্রপদ ভাবলেন: একবার দেশে যেতে পারলে হয় ধান নিয়ে। তার পর দেখা যাবে কে ক'নম্বর মামলা পাত্‌তে পারে। এবার ঘোষালদের নামে সব ক'টা জমায় আর্জি দিয়ে দেবেন। একটা যে এক পাইর জমা রয়েছে তাও বাদ দেবেন না। তিনি দেখে নেবেন ওরা কত বড মামলাবাজ। ওদের পংগু করে দেবেন আষাঢ, আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র—তুল্য চার কিস্তিতে আর্জি দিয়ে। ওরা দেশের ও দশের শত্রু, ওদেব শাসন ও পীডন করাই রাজধর্ম।···

কৃষক বিপ্রপদ আবার রাজা হবেন! আবার ফিরে পাবেন হৃত সম্মান! ঐশ্বর্যের এ কি লালসা?

না, না, তিনি আর রাজার অহংকাব, রাজার গৌরব চান না। চান শান্তিতে এই কৃষকদের সংগে মিলে-মিশে তাঁর ভবিষ্যতের নিরাপত্তা বজায় রেখে দিন কাটিযে দিতে। তিনি আর গৌরবের ভূমিকা নিয়ে নামতে চান না আসরে। তা হলে ইমামকে ছাড়তে হবে, ছাড়তে হবে নিতাইকে। জেল-খালাস তিন ভাই ভুলেও আর তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলতে সাহস পাবে না বাবুর কাছে। বাবু আবার বাবু ও প্রভু হতে চান না। বাবু ওদের ভাই—এই তো বেশ, এই তো মধুর মিতালি। এ মধু-মিলন যে তিক্ত করতে আসবে তিনি এবং কৃষক প্রজা ভাইরা তার যম।

আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ। কয়েক ঝাঁক পাখী এসে উডে বসল বিলে। নাকুলী ও সিল্লী—কি চমৎকার তাদের রঙ!

বিপ্রপদ একদিন সন্ধ্যার সময় চমকে ওঠেন। পাখী ডাকে নয়—কোন্‌ দূর পল্লী থেকে যেন ঢাকের বাজনা তাঁর কানে এসে প্রবেশ করছে। বুকটা তাঁর সেই আওয়াজে টনটনিয়ে ওঠে। তাঁর বাড়ীতেও তো পূজা আছে। অথচ তিনি জানেন না—আজ ষষ্ঠী, সপ্তমী না

অষ্টমী। হয়ত বা পূজা শেষ হয়েই গেছে। তিনি মগ্ন রইলেন বিষয় নিয়ে। সাংগ হয়ে গেছে বিসর্জন। মা দশভূজা এসে চলে গেছেন কিন্তু তিনি তা জানলেন না। মা'র পূজায় তাঁর জীবনে এই তো প্রথম অনুপস্থিতি।·· আজ না হয় বিপ্রপদর একটু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু কত বছর এমন গেছে যে এ-বাড়ী ও-বাড়ী থেকে চেয়ে-চিন্তে একখানা মাত্র নতুন কাপড় জুটিয়ে এনেছেন এই কড়ারে যে পূজা শেষ হলে কাপড়খানা ফিরিয়ে দেবেন—পুরুত ঠাকুরকে পাওনা বাবদ দেবেন কিছু মূল্য ধরে—তাও একবারে নয়, ধীরে ধীরে। নৈবেদ্যের চাল জোটাতে মাথার ঘাম তাঁর পায়ে পড়েছে, তবু পূর্ণ হয়নি পাত্র। নামে ষোড়শোপচার, কাজে কি হয়েছে তা না বলাই ভাল। এত দুঃখেও তিনি পূজা ছাড়েননি—পিতৃপুরুষের পূজা। তখন মনে মনে এই আশা ছিল, তিন-তিনটা ভাই, একটাও যদি মানুষ হতে পারে তবে এ দুঃখ-কষ্ট আর থাকবে না। আজ যে একটি লোককেও এই মহোৎসবে একটি কণা অন্নও দেওয়া গেল না, ভাঙা মণ্ডপে পূজাখানা বজায় রাখা দায়—এ দিন তাঁদের আবার ফিরবে।

ফিরেছেও সে দুর্দিন। তবে তিনি কি করে রইলেন বিদেশে মাকে ভুলে?

'নিতাই বলতে পারো আজ কি তিথি?'

সারা দিনের পরিশ্রমের পর সে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল—জড়িত কণ্ঠে জবাব দেয়, 'না আজ্ঞে।'

'না আজ্ঞে! তবে জানো কি?'

বিপ্রপদর ব্যঙ্গোক্তিতে নিতাইর তন্দ্রা ছুটে যায়। সে উঠে বসে। 'এখন তো আর চাষের মরসুম না, কে আর তিথি-টিথির খোঁজ রাখে?'

'চাষার ছেলে বুদ্ধিটাও চাষার মত। তোমাদের সংগে মিশে শেষ

কালে আমিও জাতি-ধর্ম খোয়ালাম। হিন্দুর ছেলে, আশ্বিন মাস, জান না তিথিটা কি।'

'অত রাগ কচ্ছেন কেন, কি হয়েছে বলুন না?'

'ডাকো প্রজাদের। না, না, আমিও যাচ্ছি—তোমার নড়তে দশ বছর।'

বিপ্রপদ বেরিয়ে যান। নিতাই বোকার মত চেয়ে থাকে।

জেল খালাস তিন ভাইকে ডেকে বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা তো অল্প দিন হয় দেশ থেকে এসেছ, বলতে পারো আজ কি তিথি? মুসলমানরাও অনেক সময় তিথি-টিথির খোঁজ রাখে—আমার বড় প্রয়োজন।'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা সে খোঁজ রাখে না।

· আবার বিপ্রপদ নিজের বাসায় ফিরে আসেন। 'বলো তো নিতাই, এখন কি করি?'

বিপ্রপদর স্বরে এমন একটা কাকুতি ফুটে ওঠে যে নিতাইর মায়া হয়। 'এমন কি দরকার বাবু তিথির খোঁজে?'

'এটা যে পূজার মাস—পূজা বুঝি শেষ হয়ে গেল আমি তবু বিলে। এমন আর কোনও দিন আমার ভুল হয়নি নিতাই। যদি বুঝতে পারতাম, দু'দিনের পথ ডোঙা বেয়ে এক দিনে বাড়ী যেতাম।'

'এই চাষার ছেলে বলে দিতে পারে যদি প্রসাদের ভাগ পায়।'

'নিতাই বলো, বলো, আর অপেক্ষা করো না। তুমি জেনে-শুনে আমাকে হয়রাণ করনা?'

'না বাবু, আমি সঠিক জানি নে। তবে আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে আজ পঞ্চমী, জোর ষষ্ঠী।'

শারদীয় শুভ্র আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদটাকে একটু লক্ষ্য করে বিপ্রপদও এ সহজ প্রণালীটা ধরতে পারেন। তিনি আহার পর্যন্ত না

করে একটা লোক জোগাড় করে যেমন-তেমন ভাবে বাড়ীর দিকে ডোঙা নায়ে বাইচ দেন।

কেমন করে যেন গোটা কয়েক শশার বীচি মালা চেয়ে এনেছিল আসমানতারার কাছ থেকে। পুঁতে রেখেছিল গোয়ালের পাশে। জন্মেছে মাত্র দু'টো গাছ। ফলও জন্মেছে মাত্র দু'টি। কিন্তু অত-বড় শশা সচরাচর দেখা যায় না। ছিল পাতার আবডালে লতার জালে জড়িয়ে। নিতাই কেটে নায়ে এনে দিল। মা-ঠাকরুণের হাতের জিনিষ, তিনি নিজের হাতেই দেবেন মা'র ভোগে—এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে!

নৌকো চলেছে সোজা পথে, ধানের রোয়া চিরে। আগে পিছে বৈঠা পড়ছে দু'খানা—জীবন্ত বৈঠা, জ্বলন্ত গতি—যেতে হবে দু'দিনের পথ এক দিনে। বিপ্রপদ টানছেন প্রাণপণে। কৃষাণটাও টানছে জান দিয়ে।

সেই তে মুখীটার কাছে এসে একটা লম্বা ভেড়ির পাশ দিয়ে চলছে তখন নাও। এলো একটা দুর্গন্ধ। শোনা গেল বাঘের ডাক। যেন মটকির ভিতর থেকে মাটি ফেটে আসছে সে শব্দ। কী গম্ভীর আওয়াজ! পিলে চমকে ওঠে কৃষাণটার। সে আর ও-পথে যেতে চায় না আগ-বাড়িয়ে। এখন করা যায় কী? পথ তো সোজা এইটাই। বিপ্রপদ অনেক ভরসা দেন, কৃষাণটা সাহস পায় না। তখন নৌকা ঘুরাতে হয় ভিন্ন মুখে—সুন্দরবনটা দূরে রেখে।

সুপথ দূরও ভাল। কিন্তু মনটা যেন কেমন করতে থাকে বিপ্রপদর।

পথ চলতে চলতে চাঁদ ডুবে যায়। গহিন আঁধারে চলেছে নৌকা। কান খাড়া করে থাকে কৃষাণটা। একবার সে নাকি পড়েছিল এই এর কাছাকাছি কোথায় যেন জংলা বাঘের পাল্লায়। তখন মাঘ মাসের

শীতের রাত্তির। গরু নিয়ে আসছিল ধান মলতে। বিলে জল ছিল না, সে সময় এ সব জমি শুকনা ছিল। অমনি পিছু নিয়েছিল বুনো বাঘ। হামলা দিয়ে একটা জোয়ান বলদ টেনে নিয়ে গেল হুড়-হুড় করে ধান বনে। কত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি কিন্তু এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ করল না বাঘ মশাই। তার যেন তৈরী আহার, থাবলা মেরে নিয়ে গেল। তবু ভাল—গেছে গেছে একটা গরু সে তো প্রাণে বেঁচেছে। সেই থেকে বাঘের ডাক শুনলেই তার বুক কাঁপে! অত ভয় করে না সে পশুরাজ সিংহকেও।...আসুক না, দাঁড়াক না তার সামনে গোঁফে চাড়া দিয়ে! উপড়ে ফেলবে সব ক'টা।

প্রায় প্রহর দেড়েক বিলের পথে নাও বেয়ে আড়াআড়ি আর এক পথে নৌকা এসে পড়ে খালে—খাল তো খানিকটা, তার পরই গাঙ—পেত্নীতলায় গাঙ।

রাতটাও বিদঘুটে, গাঙটাও বিদঘুটে। এপাড়ে ঘন জংগল, বসতি নেই মানুষের। শুধু জমাট আঁধার—যেন ঠাশা-বুনানী কালো সুতার। শব্দ শোনা যায় নিশাচর পেঁচার, ডাহুকের আর নাম না-জানা পোকাগুলোর। আলো দেখা যায় জোনাকীর—ভিজা ভিজা নিষ্প্রাণ আলো। দু'-এক জায়গায় ভেঙে পড়ছে খাড়া পাড়—যেখানে তল খাড়ি হয়ে গেছে নদীর জলের তোড়ে। গাছ-গাছালিও পড়ছে হুড়-মুড় করে ভেঙে। এসব আন্দাজে এড়িয়ে চলা দুষ্কর। তবু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করেই ওরা চিরদিন এ সব পথে চলে, তাই ততটা ভয় হয় না। কৃষাণটা জানে কোথায় পেত্নী এবং ব্রহ্মদৈত্যের বাস। তারা কেমন করে বিপন্ন স্বরে মানুষ দেখলে ডাকে একটু পারাপার করে দাও বলে। যদি কেউ ওদের ডাকে গলে গিয়ে পাড়ে নাও ভিড়িয়েছে, আর রক্ষে নেই। তাল গাছের মত লোমশ পা দিয়ে, ডুবিয়ে দেবে নাও, তা যত বড়ই হ'ক না কেন দেখতে।

বাসার মোষগুলা বলদগুলো থাকে প্রায় অরক্ষিত। নিতাইকে সাবধান করে দিয়ে আসা উচিত ছিল বিপ্রপদর। যে বাঘের ভয়! শীত যত ঘনাবে, বাঘের আড়িও তত বেড়ে চলবে দক্ষিণের বিলে। নিতাই কি এসব জানে না? সে তো হুঁশিয়ার লোক। বুঝে কি একটা ব্যবস্থা করবে না?

করবেই।···

একটু তেরছা হয়ে পাড়ি দিয়ে চলে নাও—কারুর হাতের বৈঠা জিরায় না।

'কেডা যাও—একটু আগুন দিয়ে যাও।'

'আমরা তামাক খাই নে—আগুনের তাওয়া নেই আমাদের নায়ে।'

'মেচ বাত্তি নাই? এট্টু ধরাইয়া দেও এই নারকেলের ছোলাডা।'

'না—নেই।'···তার পর বিপ্রপদ ফিসফিসিয়ে বলেন, 'খুব জোর হামেদ, খুব জোরসে টানো। শালারা ডাকাত।'

হামেদও সন্দেহ করেছিল, সে প্রাণপণে বৈঠা টানে।

'আরে মশাই, একটু আস্তে বাও, আগুন দিয়া যাও। মসকরা করো আমাগো সাথে—এই আষ্ট জনের সাথে?···টান, টান, ধর, শালাগো নাও। ওরা মিষ্ট কথার পাত্তর না।'

জলের ওপর দিয়ে উড়ে চলছে দু'খানা ডোঙা। যেন একটার পিছে ধাওয়া করছে আর একটা তীর।

এরা টানে আট বৈঠা, ওরা টানে দু'জনে! প্রতিযোগিতা চলছে বিষম। ধরি-ধরি করেও ধরতে পারে না বিপ্রপদর নাও। কৃষাণটাও বৈঠা মারতে ওস্তাদ। ছোট নৌকা, উড়ে চলে হাওয়াইর মত।

কিন্তু টক্কর খায় গিয়ে একটা ডুবন্ত শক্ত গাছের সংগে—আর যায় কোথায়—জল ছাপিয়ে ওঠে ডোঙার গলুই বেয়ে। ডাকাতরা ঘিরে ধরে বিপ্রপদর নাও ল্যাজা-সড়কি নিয়ে।

'আমার সংগে কিছু নেই—আছে মাত্র দশটা টাকা আর দু'আনার পয়সা। এই নাও তোমরা বাপু অত্যাচার করো না আমাদের ওপর।'

সর্দার-গোছের লোক একটা বিশ্বাস করে না। সে বিপ্রপদ ও কৃষাণটার শরীর কাপড়-চোপড় ভাল করে তল্লাশ করে দেখে। পূজার মরসুম—আজ প্রথম ধবল একটা শিকার, সেটা জুতসই হলো না বলে সে মনে মনে রাগ হয়। বিপ্রপদ ও হামেদকে গামছা পরিয়ে কাপড়-চোপড় খুলে নেয়। আর এক জন বলে, 'নৌকাটা দেখো ভাল করাইয়া হাতাইয়া মিঞা। হিন্দুর বুদ্ধি ইন্দুরের মত। এতক্ষণ কেমন বাঘের মত গানছিল বৈঠা এখন একেবারে ভিজা বিরাল।'

'সাচ্চাই তো কইছ চাচা—এই দেখ না কেমন দুইডা শশা পাইলাম, থুইছে চবাটির তলে, হালায় এমন বজ্জাত।' একটা ছোকরা ডাকাত শশা দু'টো তুলে নেয়।

আরও কিছু কাল অনুসন্ধান চলে। কিন্তু কিছু পাওয়া যায় না।

'তোমরা ভাই সব নিয়েছ—পরনের কাপড়খানা পর্যন্ত। কিন্তু তাতে আমার দুঃখ একটুও হয়নি—ও তোমাদের পেশা, নেবেই তো। কিন্তু দয়া করে ঐ শশা দু'টো যদি ফিরিয়ে না দাও, তোমাদের কিছু বলতে পারব না, কিন্তু আমি অভিশাপ দেব। তোমরা ডাকাত হলেও তোমাদের যেমন ধর্ম্ম আছে, তেমনি আমাদেরও পূজা আছে। ও দু'টো পূজার জিনিষ—ধর্ম্মকাজে লাগবে, তোমরা নিয়ে যেও না।'

সর্দার গোছের লোকটা বলে, 'মশাই ভালই কইছে—দে, দে, শশা দুইডা ফিরাইয়া দে।'

ছোকরাটা কেমন কেমন করতে থাকে। অত বড় দু'টো টাট্‌কা শশা!

'হারামজাদা, আখের খুয়াইয়া ডাকাতি করতে চাও? দে, দে, শীগগির ফিরাইয়া দে ফল দুইডা। দেরী করো যে, লাথি খাবি।'

অগত্যা সেই ছোকরা ডাকাতটা শশা দু'টো ফিরিয়ে দেয়।

সবই গিয়েছিল তবু ঐ শশা দু'টো যে বাঁচল এর জন্য বিপ্রপদ খুশী না হয়ে পারেন না।

একে একে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ তিন-তিনটা ঋতুই গড়িয়ে গেল বিলের ওপর দিয়ে। এখন এসেছে হেমন্ত। সংগে নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণা বাতাসের দ্বন্দ্ব। এ সময় সাধারণত হঠাৎ একটা বড়, বাদল হাওয়ার আশংকা থাকে। তাই সমস্ত বাসাগুলোর খুঁটি নতুন বাঁশ এনে বদলে দেওয়া হয়। মজবুত করে বাঁধা হয় ঢিলে চাল ও ভাঙা বেড়া।

বিপ্রপদ বলেন, 'আমরা না হয় ঘর মজবুত করলাম, কিন্তু ধানের ছোপা শক্ত রাখবে কে? গর্ভবতী ধানগুলো দিন দিন এমন সুন্দর ছড়া মেলছে, ফুলে বের হচ্ছে দুধ সমেত! এখন হাওয়া হলে সব গড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়বে, কি যে উপায় হবে তখন!'

'কোনোও ভয় নেই বাবু। মা-লক্ষ্মী যখন এত লাঞ্ছনার পরও এমন মুখ তুলে চেয়েছেন তখন তিনি রক্ষা করে রাখবেন সব।' অবশেষে নিতাই গলার স্বর খাটো ক'রে বলে, 'এমন ফলন আমি জন্মেও দেখিনি —নতুন আবাদি জমিগুলোর দিকে কি একবারও চেয়ে দেখেছেন? এক-একটা ধানের ছোপার সাথে যেন এক-একটা মোষ বাঁধা যায়!'

বিপ্রপদ মুখে কিছু না ব'লে একটু তাৎপর্যের হাসি হাসেন।

'এবার ক'খানা বড় নৌকা লাগবে কে জানে! বাবু এখন থেকেই কাঠামির বন্দেজ করতে হয়।'

'করো করো। তোমার যদি আনন্দ হয়ে থাকে করবেই তো—যে ক'খনা খুশি রাখো বায়না করে।'

'দেশ থেকে এলেন, কিন্তু বললেন না—এবার পূজায় আমোদ হলো কেমন। বাড়ী যেতে পারলাম না তবু শুনতে ইচ্ছা করে।'

'সে কথা আর বলো না নিতাই, রাস্তায় গেল ডাকাতি হয়ে, হাতে যা সামান্য পুঁজি ছিল তাও খুইয়ে গিয়ে উঠলাম দেশে। এবার বড় দুঃখের পূজা—বলতে গেলে কোনও রকমে বার্ষিক রক্ষা। তবু যা তোমাদের বড় মা খরচ করেছেন, তাও গেছে জলে। দু' একজন নিতান্ত ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া কেউ আসেনি প্রসাদ নিতে।'

'কেন?'

'কি জানি, হয় তো জোট পাকিয়েছে মাল্লার জন্য, নয় তো ভেবেছে বোসেরা ডুবেছে—আর ওদের বাড়ী গিয়ে হবে কি? তবে এখনও সাহস করে মুখে কেউ কিছু বলে না।'

'কেন?'

'বামুনের মেয়ে রয়েছে কায়েতের আশ্রয়ে—সেই জন্যই হবে হয়ত।'

'তাতে হয়েছে কি? কায়েতরা কি পচে গেছে? ও-সব কিছু না। এবার পূজায় যাঁরা না এসেছেন, আগামী বার তাঁরাই সুড়-সুড় করে আসবেন নানা অজুহাতে—একবার ধান উঠুক না বাড়ী।'

'সে তো আশার কথা নিতাই, তা নিয়ে বড়াই করা চলে না।'

'আর কি নতুন সংবাদ আছে বাবু? ঘোষালেরা আছে কেমন?'

'তারা এবার একটা এজমালী সম্পত্তি বেচে পূজায় খুব জাঁকজমক করেছে। ম'রে যাবে তবু ছোট হবে না। ওদের জন্যই তো আমাদের বাড়ীতে এবার লোক সমাগম হয়নি।'

'এর জন্য তো আমি একটুও দুঃখ বোধ করি নে। ভিতরে ভিতরে আত্ম-কলহ, সম্পত্তি-বিক্রি, মামলা-মকর্দমা—ক্ষয় রোগ সব ক'টাই ধরেছে। ও সংসার আর কত দিন। স্বচক্ষেই দেখে যেতে পারব যে ওরা ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়েছে।'

'নিক। নিজের দোষে যারা আগুনে পুড়বে, তাদের আর অভিশাপ দিও না তুমি।...আর একটা খবর, বিন্দি ঠাকরুণ নাকি মারা গেছে।'

'কোন্ বিন্দি ঠাকরুণ ?'

'পাঁচু ভট্‌চাযের স্ত্রী—সোনালীর মা।'

'ওঃ। হুঁ হুঁ, চিনেছি সেই ঝগড়াটে ঠাকরুণকে। বাপ রে, সেবার একটা একটুখানি বাঁশের টুকরা নিয়ে কি ঝগড়াটাই না করল আমার সংগে। দোষ, আমি না বলে ঐ হাত খানেক বাঁশ কাটলাম কেন তার বাগানের। আমি তো জানি নে, আমি ভেবেছি, আপনার লগ্ন বাগান ঝাড়টা আপনারই।'

'মেয়েটার বাপের বাড়ীর আর সূত্র রইল না যে একদিন এসে আর থাকবে। এমন সুন্দর মেয়েটার স্বামীটা নাকি একটা যাচ্ছে-তাই।'

'আমিও দেখেছি বাবু সোনালী ঠাকরুণকে—পরীর মত দেখতে। অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর, অতি বড় রূপসী না পায় বর—এ তো জানা কথা।'

দেখতে দেখতে জমির জল শুকিয়ে যেতে থাকে। স্যাঁৎসেতে ভাব কাটতে থাকে চার দিকের। আসে শীতের হাওয়া—শুকনা হাওয়া, কনকনে তব শুকনা। তাজা হয়ে ওঠে বিলের বাসিন্দাদের মন। হাঁটা-চলার পথ সুগম হয়ে আসে। মাছ মেলে প্রচুর। ফসল উঠবে শীগ্‌গির। একটা সাড়া পড়ে যায় চকে চকে—প্রাণের সাড়া, আশার সাড়া। এখন বিলও ভরে গেছে বকমারী পাখীতে। রাত্রি বেলা কৃষাণেরা জাল পেতে পাখী ধরে। বক-টক ধরে না। দু'টো শামুক-ভাঙাও ধরা পড়ল ওদের হাতে। যেন দু'টো উটের বাচ্চা। নিতান্ত বেকুফ। চখাচখি ডাকে, ওড়ে, কিন্তু ভেড়ে না ফাঁদের কাছে।

এক দিন ওরা ধানের ছোপা ধরে ব্যগ্র বাহু বাড়িয়ে কাটতে থাকে ফসল, সংগে সংগে মলতে থাকে—ভরতে থাকে বড় বড় নায়ে।

এবার ওরা দেশে যাবে।..

আউার

বাড়ীর ঘাটে ধান বোঝাই কাঠামি নৌকাগুলো এসে ভিড়েছে। এক এক নায়ে এক এক রকম ধান। নামও তাদের হরেক রকম— দুধলুচি, কার্তিকদল, বাঁশফুল, গন্ধকস্তুরী—সরু-মোটা-মাঝারি, কোনটা বা সুগন্ধি।

দেখতে দেখতে উঠানে এনে রাশ দিতে থাকে দিন-মজুর ও কৃষাণেরা। গ্রামের লোক একেবারে ভেঙে পড়ে। আগামী সনের জন্য আর অপেক্ষা করতে হয় না। স্তূপটা হয়েছে পাহাড়ের মত উঁচু। এপাশে কেউ খাড়া হলে ওপাশ দিয়ে বুঝি দেখা যাবে না। আমন ধান, একেবারে সোনার মত চকচকে ধান। কেউ হাত ডুবিয়ে দেখে, কেউ মঠো ভরে পরখ করে, কেউ বা দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে বিস্ময়ে। হিংসায় জ্বলতে থাকে প্রায় সকলে। তবু তারা বোসের বাড়ী ছাড়ে না। তারা ডালা-কুলো এগিয়ে দেয়, নৌকা থেকে ভিজা ধান তুলে আনে, গোলা বাঁধায় সাহায্য করে—এ যেন তাদেরই ফসল, তাই এত দরদ, তাই এত অযাচিত পরিশ্রম।

গুরু আসেন, পুরুত আসেন, অন্যান্য পণ্ডিত বামুনেরাও এসে আশীর্বাদ করে, প্রশংসা করে ফাঁপিয়ে তোলেন বিপ্রপদকে। মোট কথা, দেশের গণ্য ও নগণ্য কেউ আজ আর আসতে ভুল করে না।

আসে পাঁচীর মা ও অন্ধ রাজু—হিংসা নেই দ্বেষ নেই। তাদের মনে পরম আনন্দ। কিন্তু তাদের লক্ষ্য করে না কেউ। পান-তামাকটা মুরব্বীদের সুমুখেই কেবল ঘুরতে থাকে।

কমলকামিনী মালাকে নিয়ে কাজে লেগে গেছেন। সরু-মোটা-মাঝারি ধান আলাদা আলাদা রাখতে হবে। অন্তত আট-দশটা রোদ খাইয়ে বীজ-ধান তুলতে হবে গোলায়। পাঁচ-মিশালি ধানগুলো আজই

সিদ্ধ করা দরকার। তা না হলে ওগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। মালা এ সব কিছু জানে না। তার কাছে সবই নতুন। সে কমলকামিনীর সংগে সংগে চলে। যা বলেন তাই করে। ক্রমে সে নিপুণ হয়ে ওঠে। কোলে-কাঁখে নেই, কাজ তার গা-হাত-পায় লাগবে কেন? দেব-সেবা, অতিথি-সৎকার, সংসারের এলোমেলো রকমারী ঝঞ্ঝাট সকল দায়িত্বই সে ইতিমধ্যে মাথা পেতে নিয়েছে। হিন্দু-সংসারের বিধবা পিসী-মাসী-বোনঝিরা যা নিয়ে সকাল থেকে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে অবিবাহিতা মালাও তাই নিয়ে দিন কাটায়। ভরা যৌবন অটুট স্বাস্থ্য আর তার কোন কাজেই বা লাগবে? কাজের প্লাবনে মালা নিমজ্জিত হয়ে থাকে। বিপ্রপদ দেখেও তাকে দেখতে পান না। কমলকামিনী সোয়াস্তি বোধ করেন।

একটা লজ্জা ও গ্লানিতে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়েছিল মালা। যত দিন যায় ততই সে ভাব কাটতে থাকে। এ সংসারের সবাই, এমন কি, বিপ্রপদও ভাবতে থাকেন—ও বুঝি এ সংসারের এক জন যুবতী আত্মীয়া। এর বেশী যে কোনও পরিচয় বিপ্রপদও ওর কোন দিন পেয়েছেন এ কথাও মনের কোণায় স্থান পায় না—পেলেও তা শরতের লঘু মেঘের মত অদৃশ্য হয়ে থাকে। তার অস্তিত্ব বোঝা যায় না।

ধান এসেছে, বিপ্রপদর আবার মান বেড়েছে। গঞ্জ থেকে বাকীতে টিন-কাঠ আসে। পূর্বের চেয়ে আরও বড় একখানা নাটমন্দির ওঠে। আবার তা জমজম করতে থাকে লোক-সমাগমে। মজলিস চলে হরদম। ধার-কর্জ চাইতে আসে গাঁয়ের লোকে। সবাই বলে—'ধর্মের বাতি আগে জলে টিপটিপিয়ে তার পর জলে দপ্‌দপিয়ে—দেখতে হলে যাও বোসের বাড়ী। এর মধ্যে হয়েছিল কি, এখনই বা হয়েছে কি!

কোনও মজলিসেই বিপ্রপদ তেমন গা মাখেন না। তিনি কৃষাণদের

সংগে পরামর্শ করে দু'-একটা রবিখন্দ যাতে ধানের মরসুমের আগে ওঠে তার ব্যবস্থা করে তাদেব পাঠিযে দেন বিলে। তিল এবং পাট বুনতে হবে। শস্যশালিনী মৃত্তিকার সমস্ত ঐশ্বর্য কুড়িয়ে আনার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। মানের জন্য চাই পয়সা, পয়সার জন্য চাই ঐকান্তিক শ্রম। সে শ্রম সফল করার জন্য তো তাঁর রয়েছে নব-যৌবনা দক্ষিণের বিল।

এখন পর্যন্ত যেটুকু তাঁর জৌলস তা ধানের নয়—ঋণের—সংগে সংগে এ কথাটাও যে মনে না হয় তা নয়।

একটা ছুটি উপলক্ষ করে অমরেশ বাড়ী আসে। বহু দিন পরে পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ হয়। বিপ্রপদর মনে একটা সুগভীর আনন্দ হয়। অমরেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে সগর্বে তার স্বল্প পরিসর পাঠ্য-জীবনের কাহিনী বলে যায়। নতুন নতুন বইগুলি এনে দেখায় পিতাকে। বিপ্রপদ সম্যক্ না বুঝলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বইগুলি খুলে দেখেন। ইংরাজী বইয়ের ছবিগুলো দেখে ছেলের সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা জন্মে। পাছে অমরেশ পুঁথিগত কোন একটা কঠিন প্রশ্ন করে বসে, তাই তিনি তাকে নিয়ে নতুন ধানের গোলাটা দেখাতে যান। দক্ষিণের বিলের গল্প করেন। অমরেশ সত্য ঘটনার মধ্যেও একটা রূপকথার গন্ধ পায়। সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে। বিপ্রপদ খোলা-মনে আজ জবাব দিয়ে যান। এবং এইটাই বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেন : এ সব ওদের জন্যই করা।

কি একটা কাজ করতে করতে মালা সুমুখে এসে পড়ে। পিতা পুত্রের আলাপ হঠাৎ থেমে যায়। অমরেশ বিস্মিত চোখে তাকায়।

বিপ্রপদ ভীত হয়ে পড়েন।

'বাবা, উনি কে? ঐ যে চলে গেলেন ও-ঘরে।'

মুহূর্ত্ত মধ্যে জবাব দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কোনও জবাবই বিপ্রপদর মুখে আসে না।

ভাগ্যক্রমে সেই সময় কমলকামিনী এসে পড়েন। তিনি বলেন, 'কি দেখছ বাবা? উনি এক জন বামুনের মেয়ে বিপদে পড়ে আমাদের আশ্রয় নিয়েছেন। ও তোমাদের ছোট-মা। তোমরা ওকে ছোট-মা বলেই ডেকো।'

'ছোট-মা তো বড় সুন্দর দেখতে বাবা।'

তার পর অমরেশ বিনুর খোঁজে চলে যায়।

কমলকামিনী বলেন, 'কেমন, শুনলে তো?'

মাঘ মাস প্রায় শেষ হয়ে এলো। ভোরের সূর্যটা একটা সিঁদুর-পিণ্ডের মত তখনও পূর্বাকাশের কুহেলি ঠেলে রোদ ছড়াতে পারেনি। কিন্তু আলো যা ছড়িয়েছে তাতেই বাড়ী ঘর গাছ পালা বেশ পরিষ্কার দেখাচ্ছে। এ দেশের তুলনায় শীত পড়েছে খুবই, তবু মানুষের মনে প্রচুর আনন্দ। এখন সকলের ঘরেই খাবার আছে। নতুন ধান সবে এই তো উঠল। মাছ দুধ তরি-তরকারী পাওয়া যাচ্ছে অঢেল। লাউ দেখা যায় প্রত্যেকের মাচায় মাচায়। খেজুর রসের গুড় না আছে কোন বাড়ী! এত যে কাদা এদেশে ছিল তা পথ-ঘাটের দিকে চাইলে কেউ কি বুঝতে পারে? টন টন করছে সব। শুধু একটু শিশিরে ভেজা—তা দেখতে লাগে বেশ, চলতে লাগে ভাল!

একদল বৈরাগী এসেছে ভিক্ষা করতে। যে ক'টি বৈষ্ণব, সেই ক'টিই বৈষ্ণবী—হাতে তাদের একতারা। এরা এ দেশে এবার নতুন এসেছে। দলটাও বেশ ভারী, সাজ-সজ্জাও পরিপাটি। গাঁয়ের লোকের নজরে একটু নতুন ঠেকে। হয়ত এরা গান গায় ভাল নয়ত এরা এমন কিছু জানে, যা অনেকেই দেখেনি বা শোনেনি। বৈরাগীদের

ঘিরে পথ দেখিয়ে আনে বোসের বাড়ী উৎসুক চঞ্চল ছেলে-মেয়ে বুড়োর দল। বড় বাড়ী না হলে এতগুলো লোককে খুশি করবে কে? গান শোনা সোজা, গানের মাশুল দেওয়া তো সোজা নয়!

খড়ম পায় বিপ্রপদ বেরিয়ে আসেন, কমলকামিনী আসেন, মালাও আসে। বিনু ও অমরেশ তো আছেই। সবাই মিলে বসতে দেয় নাটমন্দিরে হোগলা-মাদুর পেতে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের। এরা দেহতত্ত্বের গান গাইবে না। গাইবে নতুন স্বদেশী গান মুকুন্দদাসের অনুকরণে—সেই বরিশালের নাম-করা মুকুন্দদাস। ইচ্ছা হলে তারা দেহতত্ত্বের গানও শোনাতে পারে। জানে তারা সব রকম। ওদের মধ্যে কে একজন জানি হাজতও খেটেছে স্বদেশী গান গেয়ে। সেই এ দলের নায়ক এবং চালকও বটে। এ সব শুনে আর কেউ দেহতত্ত্বের গান শুনতে চায় না।

বিপ্রপদ বলেন, 'বৈরাগী ঠাকুর, আমরাও অনেক স্বদেশী করেছি উনিশ-শো পাঁচ কি ছ' সনে—সেই বংগভংগের সময়। আমাদের তখন বয়স কি কিন্তু ডরাইনি কিচ্ছু! বিলেতী মাল হাটে আনতে দেইনি, বেচতে দেইনি কোনও দোকানীকে। নিজেরাও তো পরতাম না তাঁতের দেশী কাপড় ছাড়া।'...

'বাবু, আমিও তো হাজত খাটি ম্যাজিষ্ট্রেটের মালীকে ক্ষুদিরামের গান শুনিয়ে। মালী বেটা ছাড়ল না, টেনে নিয়ে গেল বাগানে তার বাসায় একটা কোণে। সেদিন কুঠিতে সাহেব ছিল না। গানও আরম্ভ করলাম, সে শালাও কোন দিক থেকে যেন এসে পড়ল ডালকুত্তার মত। মালী বেচারী পালিয়ে গেল। আমি গান বন্ধ করলাম। ঠিক ভয়ে না—শ্রোতার অভাবে।'

বিনু একেবারে এগিয়ে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। 'তারপর বৈরাগী ঠাকুর?'

কচি গলার প্রশ্ন শুনে, কচি উৎসুক চোখ জোড়ার দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে বলতে থাকে বৈষ্ণব। 'তারপর বাবা, পুলিশ দিয়ে আমাকে ধরিয়ে নিয়ে যায় ডালকুত্তা সাহেব। জিজ্ঞাসা করে, কি করছিলে ওখানে—ওই বাগানে। সে বুঝতে পারেনি যে, আমি স্বদেশী গান গাইছিলাম এতক্ষণ। আমি বললাম: গান গাইছিলাম। কি যেন ভাবল আমার দিকে চেয়ে। তারপর বলল, 'একটা ন্যাষ্টি ট্রেস্‌পাসার। একে নিয়ে যাও থানায়।' ইংরাজীগুলো আমার মনে আছে বেশ। সংগে সংগে পিঠে না প'ড়ে আমার মুখের ওপর পড়ল এক ঘা বেত। কেটে গেল ঠোঁটটা। এই সেই চিহ্ন।···হাজতে বসে আমি মনের আক্রোশে গান গাইতে স্বরু করলাম। কনেষ্টবলেরা নিষেধ করল। এলো জেলার। তার কথাও কানে তুললাম না। আমার হাতে দিল হাত কড়ি, পায়ে শিকলী পরাল। আমার স্থবিধা হলো—এখন জিঞ্জির বাজিয়ে গান ধরলাম। কয়েদীরা ভিড় করে শুনতে লাগল সে গান।···যন্ত্রণা বাড়ল জেলারের। সে বলত: একটা পাগলকে না ক্ষেপিয়ে খালাস দেওয়াই ভাল। ওর বিরুদ্ধে আর এমন কি একটা চার্জ! বাস্তবিক প্রমাণাভাবে আমি খালাস পেলাম ডেপুটি কোর্টে। সেই থেকেই আমি দেশে দেশে স্বদেশী গান গাইছি ঘুরে ঘুরে।'

বিপ্রপদ বলেন, 'আমরাও কম করিনি সে যুগে। আমাদের শক্তিগড়ের হাটখোলায় ছিল এক মাড়োয়ারী—বিষণ দাস। সে বিলিতী ছাড়া দেশী মাল কিছুতেই বেচবে না। আমি এবং রহিমুল্লা পঞ্চাইত পরামর্শ করে দিলাম এক দল লোক ক্ষেপিয়ে। অবশ্য মুখ-পত্তনে আমরা যদি পড়ি তবে পুলিশ এলে রক্ষা করে কে? তাই রইলাম ক্ষেপিয়ে দিয়ে আবডালে। রাত্রে আগুন দিল বিষণের ঘরের এক পাশে—সামান্য আগুন, শুধু ওকে ভয় দেখাবার জন্য। ও সুড়-সুড় করে অন্য পাশ দিয়ে লোটা-কম্বল নিয়ে বের হলো, ভাবল,

খুব বাঁচাই বাঁচল বুঝি, যখন প্রাণটা তার রক্ষা পেল। কাঁদো-কাঁদো হয়ে আমাদের শরণ নিল। বললাম: ভয় নেই, পুলিশ আসুক। সব লুট হয়ে গেল যে—যাবে কোথায়, পুলিশ আসুক সাক্ষী দেব আমরা তোমার পক্ষে। পুলিশ এলো পরের দিন খবর পেয়েই। কিন্তু আমরা সাক্ষী দিলাম উল্টা। কিছু বামাল বেচে নগদ দিয়ে দিলাম। লোটা-কম্বল নিয়ে দেশে ফিরে গেল বিষণ। এখন ভাবি, কি ছেলেমানুষী-টাই না করেছি এক কালে। কিন্তু ঠাকুর ভেবে দেখো স্বদেশী আমরা কম করিনি। তারপর সেই ভিটিতে বসল এক সাহা তাঁতের কাপড় নিয়ে। তখন কত স্বদেশী কথা বলেছে। এখন সেই সাহাই হয়েছে মাড়োয়ারী। গুদাম বোঝাই বিলিতী মাল. দেশী কোনও জিনিষের নাম-গন্ধ নেই। তবে দোষ করল কি বিষণ? এখন ভাবলে লজ্জা হয়। তবু সে যুগে আমরা কম করিনি।'

তখন আর গান আরম্ভ হয় না, আরম্ভ হয় শেষ বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর।

গান জমে খুব। ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানটা আরম্ভ হতেই বিনু রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। আসরের এক পাশ থেকে সে নিকটে এসে বসে। সেখানে একটা মঞ্চও তৈরী হয়েছে বৈরাগী ঠাকুরের ইচ্ছা ও উপদেশ মত। ঠিক ফাঁসির মঞ্চ যেন।...

সন্ধ্যা হয় হয়—এমন সময় গান গেয়ে এক-এক পা করে ফাঁসির-কাঠের দিকে এগিয়ে আসে বৈরাগী ঠাকুর। এক-এক কলি শেষ হয় আর এক-এক ধাপ ওপরে ওঠে সে। টিনের নাটমন্দিরে শহীদ কিশোরের কণ্ঠই যেন গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে। নিজ হাতে যেন ক্ষুদিরামই পরছে ফাঁসির দড়ি। তৈলাক্ত পিচ্ছিল দড়িটা দেখতে ভয় লাগে। বৈষ্ণব আর বৈষ্ণব নেই—মিশে গেছে যেন ক্ষুদিরামের আত্মা ও দেহের সংগে।

বিন্নু আর বসে থাকতে পারে না। খাড়া হয়ে ওঠে।' সে বুঝুক আর না বুঝুক—রুদ্ধশ্বাসে গান শোনে। চেয়ে দেখে এক বাঙালী কিশোরের অভিযান।

হঠাৎ গান থেমে যায়, হুকুম হয় ফাঁসির।

মঞ্চ অন্ধকার। বৈষ্ণব নেই। শেষ হলো অভিনয়।

রাত হয়েছে, সবাই বাড়ীর দিকে ফেরার কথাও ভুলে যায়।

এর পর অল্প কটা বছর গড়িয়ে যায় চাকার মত। বিপ্রপদ এখনও তেমন সুবিধা করতে পারেননি হালুটিতে। তবু তিনি জোঁকের মত আঁকড়ে আছেন। রবিখন্দটা পরিপূর্ণ ভাবে জন্মান চাই। পাট তিল-মুগ-বরবটি কিছুই বাদ যাবে না। কুমড়োর ডগা আলুর লতাও ফুঁপিয়ে উঠবে। হলুদ-মরিচ পেয়াজ-রসুনে ভরে যাবে তাঁর গোলা। তিনি বালকের মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকেন পাকা কৃষকদের কাছে। জীবন তাঁর ফসলে ভরে তুলবেন এই তাঁর কামনা।

তাই তাঁর শক্তিগড়ের চেয়েও দক্ষিণের বিলের জন্য যেন অপার আকর্ষণ। তিনি বিভোর হয়ে থাকেন মৃত্তিকার স্বপ্নে—বিলের স্বপ্নে।

মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গানে বৈষ্ণব শক্তিগড়ের ছেলে-মেয়েদের এমন মজিয়েছিল যে এখনও তারা তা ভোলেনি। বিন্নু তো কথায় কথায় সে গান আজো গায়। লুকিয়ে লুকিয়ে সমবয়সীদের নিয়ে আদিত্য সরকারের আম-বাগানে গিয়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসির অভিনয় করে। কিশোর বালক গান গেয়ে গেয়ে এগিয়ে যায় মঞ্চের দিকে—উত্তেজনায় তার সারা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে—সে হাসতে হাসতে নিজ হাতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে। শিউরে ওঠে বালকের দল। সময় হয় ফাঁসির।

সরে যায় পায়ের নীচের তক্তা…

অদৃশ্য হয় মৃত্যুঞ্জয়ী কিশোর…

হাততালি দেয় না কেউ, কলরব করতেও যেন তারা ভুলে যায়—যতক্ষণ না বেরিয়ে আসে বিনু।

একবার যে সাহেব সেজে ফাঁসির হুকুম দেয়, দ্বিতীয়বার সে আর কেন জানি সে ভূমিকা নিয়ে দাঁড়াতে চায় না আসরে। তাই ক্রমে ক্রমে অভিনয় করা মুস্কিল হয়ে পড়ে।

হঠাৎ একদিন এসব নজরে পড়ে বিপ্রপদর। তিনি ভীত হয়ে পড়েন। বাড়ী ফিরে এসে কমলকামিনীকে একান্তে ডেকে বলেন, 'বিনুটা মরবে একদিনে। যম নিয়ে খেলা!' তার পর খুলে বলেন সব।

বিনু ঘরে এলে কমলকামিনী বলেন, 'তুই বুঝি মরতে চাস ফাঁসি আটকে গলায়। ও-খেলা খেলা নয়।'

'বৈরাগী ঠাকুর মরেনি, তোমরা সবাই বলো ক্ষুদিরামও মরেনি—তবে আমি কেন মরব বড়মা?'

'ও মেজো, শোন্ শোন্ তোর বিনুর কথা।' তার পর কমলকামিনী বলেন, 'ষাট, মরবে তুমি কেন বাবা? তবে কি জানো, ও-সব খেলা ভাল নয়—হঠাৎ বিপদ হতে কতক্ষণ!'

একটি ছেলে প্রতিবাদ করে, 'বিপদ হলেই হলো! আমরা ওর ফাঁসির দড়িটা ফুলের মালা দিয়ে তৈরী করি। ক্ষুদিরাম তো ফাঁসি পরেনি গলায়—পরেছে ফুলের মালা, নইলে কি পারত হাসতে হাসতে ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে?'

ছেলেরা এদিক ওদিক চলে যায়।

বিপ্রপদ বলেন, 'কথাটা সত্যি না হলেও একপ্রকার সত্যি বড়বৌ।'

রাত্রে বিনু প্রশ্ন করে, 'স্বাধীনতা মানে কি বড়মা?'

'কি জানি বাবা, মেজো মাকে জিজ্ঞাসা করো! আমার কাজ আছে।'

'মেজো মা, স্বাধীনতা মানে কি?'

'তোর তাতে দরকার ?'

'এই যে আমার বইতে রয়েছে। বলে দাও অর্থ কি ?'

শিবপদর স্ত্রী মুস্কিলে পড়ে।• তার পক্ষে কেন, বাড়ীর কোন বৌ'র পক্ষেই এসব কঠিন কথায় জবাব দেওয়া অসম্ভব। আজকাল বিনু তার মামা-বাড়ী টাউনে থেকে পড়ছে। হবেই তো তাকে এমন সব শক্ত কথা পড়তে! সে বলে যে জ্যেঠা মশাইর কাছে যাও, তিনি বলে দেবেন।

বিনুর বিপ্রপদর কাছে যেতে হয় না। তিনি দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। 'স্বাধীন মানে যে পরাধীন নয়—বিজাতির অধীন নয় যে জাতি। যেমন চীন জাপান স্বাধীন জাতি। বিশেষ্যে স্বাধীনতা।'

দুঃখিত হৃদয়ে বিনু বলে, 'আমরা তো পরাধীন—আমরা ভারতবাসীরা। অথচ ওরা বাড়ীর আমাদের কাছে, স্বাধীন, এ হলো কেন জ্যেঠামশাই ?'

'ইতিহাস পড়ে দেখ—ওতেই সব লেখা আছে।'

বিনু রাত জেগে ইতিহাস পড়ে। প্রথম থেকে সে শেষ পযন্ত পড়বে। আজ আর সে ঘুমাবে না। একটু একটু করে কবে স্কুলে পড়া হবে সে জন্য কি বসে থাকা যায়? তাকে ভারতের পরাধীনতার কারণ জানতে হবে। মর্ম বুঝতে হবে ইতিহাসের।

রাত্রি একটা···

পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে বিনু। অনার্য এসেছে তার উলংগ বর্বরতা নিয়ে—অসভ্য উদ্দাম।

দ্রাবিড় এসেছে তার উপল প্রস্তরের অহংকার নিয়ে—সংগে তার দেবীমূর্তি···দ্বন্দ্ব হয় স্বার্থ নিয়ে···

আসে আর্য—হিমালয়ের পাদমূলে বাঁধে বাসা···এগিয়ে চলে পাঞ্জাবে —ছড়িয়ে পড়ে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত। মূর্তিপূজার, সভ্যতার বিপ্লব আনে ভারতের বুকে···

পড়তে পড়তে শিউরে ওঠে বিনু। অনেকদিন পড়েছে সে ইতিহাস, দেখেছে কত বীর বিজয়ীর আলেখ্য, কিন্তু এমন করে পড়েনি, এমন করে দেখেনি কোনো দিনও এই সামান্য বইখানার পাতা উল্টে।···

রাত্রি দু'টো···

'এখনও ঘুমাওনি বিনু?' মালা প্রশ্ন করে।

'না, আমি পরীক্ষার পড়া পড়ছি ছোটমা।'

'শরীর খারাপ হবে তোমার।'

'হবে না ছোটমা।'

বিনু আবার মগ্ন হয়ে যায়···

কত রাজ্যের ভাংগা-গড়া উত্থান-পতন চলেছে, কত বীরের রক্তে ভেসে যাচ্ছে এ ভারতভূমি তবু চলেছে ইতিবৃত্ত এগিয়ে···

মালা চুপটি করে বিনুর পিছনে এসে দাঁড়ায়···শুনতে পায় যেন তার বুকের শব্দ···

অশোক গেল তার ঐতিহ্য ছড়িয়ে···রণজিৎ সিংহ তার বীরত্ব···

আকবর গেল দীন এলাহি ধর্মের ব্যাখ্যা করে···কেউ তা তেমন মন দিয়ে শুনল না, কিন্তু বিনুর বুকে রেখে গেল একটা বৃহত্তম সংকেত যেন···তার পর আসে শিবাজী···

অবশেষে ধীরে ধীরে এলো ইংরেজ···বণিকের বেশে মাণিক্য লুণ্ঠনকারী···

বন্দী হলো সিরাজ বাংলার শেষ নবাব—মৃত্যু হলো অকালে—

কেঁদে ফেলে বিনু···

হাতের বই মাটিতে খসে পড়ে। মালা প্রশ্ন করে, 'কি হলো বিনু?'

'কিছু হয়নি ছোটমা—আমি ওদের মারব···প্রতিশোধ নেব অন্যায়ের।'

উত্তেজিত বিনুকে ধরে রাখে মালা।

রাত শেষ হয়ে আসে। শিয়াল ডাকে শেষ প্রহরের···

পরীক্ষা দেবে বিন্নু—

একটা অস্পষ্ট গোলমাল শুনে শয্যা ত্যাগ করে আসেন বিপ্রপদ। প্রায় প্রত্যহ এমনি সময় তাঁর ঘুম ভাঙে। তবে আজ ভাঙল একটু আগেই।

বিন্নু কাঁদছে···মালা তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে।

উজ্জ্বল দীপালোকে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক চিত্র দেখলেন বিপ্রপদ। 'কি হয়েছে বিন্নু? কাঁদছিস কেন?'

বিন্নু আবার ফুঁপিয়ে ওঠে।

'কি হয়েছে মালা?'

অনেকদিন বাদে এই প্রথম সম্বোধন। মালা শিউরে ওঠে। আনন্দে নয়—ভয়ে। কণ্ঠে একটা তিক্ততা ও অবিশ্বাস বাবুজীর।

'কি রে, হয়েছে কি?'

কাঁদতে কাঁদতে বিন্নু সব খুলে বলে। আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সুকুমার মুখখানা রাঙা হয়ে যায়।

বিপ্রপদ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। 'চুপ করো বাবা, কেঁদো না। এই তো দুঃখী ধরিত্রীর ইতিহাস। শুধু ভারতের নয়—সারা দুনিয়ার।'

'আমরা কেন তা সইব? জ্যেঠামশাই···'

একটা আতংক হয় বিপ্রপদর মনে। তাঁর সংসার, তাঁর উত্তরাধিকারী! কিন্তু পরক্ষণেই ভাবেন—করবেই তো তাঁর বংশধরেরা প্রতিবাদ। তিনিই কি রেহাই দিয়েছেন ঘোষালদের? দাঁড়াননি অন্যায়ের বিরুদ্ধে? কিন্তু এ যে অগ্নিগর্ভ! আবার সংকুচিত হয়ে যায় বিপ্রপদর হৃদয়। তিনি ভাল মন্দ কিছুই বলতে পারেন না। সাহস দিতে পারেন না বিন্নুকে।

'কি, চুপ করে রইলে যে জ্যেঠামশাই? আমরা কি চিরদিন এমনি মুখ বুঁজে থাকব? বলতে চাও ভুলে যাব ইতিহাসের গ্লানি?'

'না, না তা ভুলবে কেন বাবা? ভুলবে কেন?' তিনি হাত বুলান বিনুর গায়।

বিনু শান্ত হয়।

কিন্তু বিপ্রপদ চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে পায়চারি করতে থাকেন। তখনও ঊষার আলো তার বর্ণালী আকাশের সীমান্তে পক্ষ বিস্তার করেনি। শিশির পড়ছে দু'-এক ফোঁটা করে—অন্ধকার থমকে আছে গাছপালার ফাঁকে। কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। একটা অব্যক্ত ব্যথায় যেন রাতের শেষ প্রহর মৌন।

তেমনি একটা অস্পষ্ট বেদনায় বিপ্রপদও ব্যাকুল। তাঁর বংশধর এই বিনু। কি জানি, অমরেশ আবার কেমন হয়েছে! তিনি স্বয়ং পাকে-চক্রে আবার ঘৃতাহুতি দিলেন। এ কি ভাল হল! বিদ্রোহের লাঞ্ছনা তিনি হাড়ে-হাড়ে অনুভব করছেন। লাভ কবে হবে কিন্তু সামনে কি বিপুল ক্ষতি! এখনও তিনি কোনও চোটই সামলাতে পারেননি। যা দু'টো ধান পান তার চেয়ে দেনার অংক বেশী।

কিন্তু মুখ বুঁজে মার খেলেও তো মৃত্যু অনিবার্য। তিনি ভালই করেছেন বালকের উর্বর হৃদয়ে আগুনের বীজ বুনে। কাটুক অন্ধকার।

তখনি যেন পূর্বাচলে ঊষার রক্তিমাভা দেখা যায়।

বিপ্রপদ জোড়হাতে সম্মতি জানান।

সমাপ্ত